The Gems of Ramadan

ধূলিমলিন উপহার

রামাদান

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

بسم الله الرحمن الرحيم

ধূলিমলিন উপহার রামাদান

ধূলিমলিন উপহার রামাদান

মূল

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

পরিমার্জন এবং ভাষা সম্পাদনা

সাজিদ ইসলাম

শর'ঈ সম্পাদনা

মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

সীরাত পাবলিকেশন

ধূলিমলিন উপহার: রামাদান
গ্রন্থস্বত্ব ©সাজিদ ইসলাম
প্রথম সংস্করণ: মে, ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ: একুশে বইমেলা, ২০১৯

ISBN: 978-984-34-4537-7

প্রকাশক
সীরাত পাবলিকেশন
www.facebook.com/seeratpublication
Email: seeratpublication@yahoo.com

পরিবেশক এবং প্রাপ্তিস্থান
দারুল নাহদা
শপ#৩১৫, দ্বিতীয় তলা, ৩৮/৩-কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭৩৯১৫২১৯৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর #০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

পরিবেশক: অন্যরকম প্রকাশনী

অনলাইন পরিবেশক
wafilife.com
rokomari.com
sijdah.com

প্রচ্ছদ: আনিকা তুবা
পৃষ্ঠাসজ্জা: সাজিদ ইসলাম
বানান: সাজিদ ইসলাম

মুদ্রিত মূল্য: ৩০০ ৳

এই বইয়ের মূল কনটেন্ট শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের বিখ্যাত লেকচার সিরিজ 'Gems Of Ramadan'। রেইনড্রপ্স মিডিয়া সেটা বাংলায় অনুবাদ করে অডিও সিরিজ আকারে প্রকাশ করে। এই বই তৈরীতে রেইন ড্রপ্স মিডিয়া তাদের বাংলা ট্রান্সক্রিপ্ট দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেছে। সেজন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

কাশ্মিরের ছোট্ট পরী আসিফা বানু

আমাদের রবের কাছে বিশাল সব জান্নাত আছে। সেখানে কোনো খারাপ মানুষ নেই। আমাদের রব যেন সেই জান্নাতে, তাঁর নিকটেই, তোমার জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে দেন—লাল নীল হীরার বাড়ি।

সূচী

শুরুর কথা

প্রচণ্ড উত্তাপের পর অবশেষে যখন এক পশলা বৃষ্টি এসে নামে—সেটা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচার মতো। উত্তপ্ত আবহাওয়ার শাসনে রুক্ষ মাটিতে যখন বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো এসে পড়ে, এক অদ্ভুত সোঁদা মাটির গন্ধ নাকে এসে লাগে। এক হৃদয় শীতল করা বাতাস এসময় বয়ে যায়। প্রতিবার বৃষ্টি শেষে নিয়ম করে একবার বাইরে বের হই শুধু এই বাতাসটা গায়ে মাখার জন্য। মাঝে মাঝে রিকশা নিয়ে এমনিতেই এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই, যাতে এই বাতাসটা আরও বেশি করে গায়ে লাগে। এসময়টাতে মন মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যায়, সবকিছু ভালো লাগতে শুরু করে, খুব ভালো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে, সবাইকে ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে।

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের বিখ্যাত লেকচার সিরিজ 'Gems Of Ramadan' এর সম্পাদনা করার সময় অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) রামাদানকেও এরকম মৃদু শীতল বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন। যে বাতাস নিমিষেই আমাদের মন ভালো করে দেয়, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত দুঃখকষ্ট দূর করে দেয়। যে একবার এই বাতাস গায়ে মাখে—সে আর কখনো দুঃখী হবে না। সুবহানআল্লাহ্!

তবে এটা এমন এক বাতাস যার স্থায়িত্ব হয় খুব অল্প সময়ের জন্য এবং খুব অল্প কিছু সৌভাগ্যবান বান্দাই কেবল এই বাতাসে রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ পায়। প্রতিবছর আমাদের সামনে রামাদান এসে হাজির হয়। সারা মুসলিম বিশ্বে এক উৎসব উৎসব রব শুরু হয়। সেহরি, ইফতার, তারাবীহ, শবে ক্বদর, ঈদের খুশি—এই সবকিছুর ভিড়ে রামাদানটা কেমন জানি নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠানে ঘুরপাক খেতে থাকে। চোখের পলকেই সেই রামাদান আবার চলেও যায়। কিন্তু কয়জন রামাদান নামের সেই শীতল বাতাসে নিজেদের প্রশান্ত করতে পারে? কয়জন আছে যারা নিজেদের গুনাহগুলোকে মাফ করিয়ে নিতে পারে? নিজেদের পাপের বোঝা হালকা করে, এক বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে অনন্ত সুখের জান্নাতে নিজের নামটা লিখিয়ে নিতে পারে কয়জন!

এই বইটি সেই সৌভাগ্যবানদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এক অসাধারণ ম্যানুয়াল। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলকে তুলনা করার যায় ইলমের এক জাহাজের সাথে। রামাদানের মতো একটি বরকতপূর্ণ সফরে যদি এমন এক জাহাজে ভ্রমণের সুযোগ হয়, তবে সেটা মনে রাখার মতো উপভোগ্য এক সফরে রূপ নিবে নিঃসন্দেহে।

এটি মূলত শাইখের একটি বিখ্যাত লেকচার সিরিজ যা এক রামাদানব্যাপী তিনি আলোচনা করেছিলেন। প্রতিদিন এক একটি পর্ব হিসেবে আলোচনা করতেন। সেই লেকচার সিরিজটি অনুবাদ করে বাংলায় অডিও সিরিজ আকারে প্রকাশ করে *রেইন ড্রপ্স মিডিয়া*। আমাদের এই বইয়ের কাজে *রেইন ড্রপ্স মিডিয়া* সেই অনুবাদের ট্রান্সক্রিপ্ট দিয়ে সহযোগিতা করেছে, সেজন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

একজন মানুষের মুখের কথাকে বইয়ে রূপ দেওয়ার কাজটা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, আর সেই বক্তা যদি হন শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের মতো ইলমের জাহাজ, তাহলে তো কথাই নেই। তবে শাইখের বক্তব্যগুলো এত ঝরঝরে আর দালিলীক হয় যে—খুব বেশি বেগ পেতে হয় না।

পুরো বইটি সম্পন্ন করার পেছনে অনেকেই বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। বোন আনিকা তুবা বরাবরের মতোই দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন, তরুণ আলিম মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির শর'ঈ ব্যাপারগুলো দেখে দিয়েছেন, রেইন ড্রপ্স মিডিয়ার ভাইয়েরা বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ্ সবাইকে যেন উত্তম প্রতিদান দেন।

আমরা আশাবাদী, এই বইটি আপনার রামাদানে অন্য মাত্রা এনে দেবে ইনশাআল্লাহ্। একটি প্রশান্ত আর পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আপনি রামাদান শুরু করতে পারবেন। চাইবেন না রামাদানের একটি মুহূর্তও অপচয় হোক। সেই সাথে যদিও বইয়ের বিষয়বস্তু রামাদান, কিন্তু এতে আত্মশুদ্ধি, আত্মোন্নয়ন, ইসলামের গৌরব-ইতহাসের যে হৃদয়কাড়া আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে, এতে বইটির উপকারিতা শুধু রামাদানে নয়, বরং সবসময়ের জন্য।

এই রামাদানে আমরা চাই আল্লাহ্ যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন। রামাদানে আমাদের লক্ষ্য হবে আল্লাহর সিংহাসন যেন জান্নাতে আমাদের ছাদ হয়, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে তাঁর আরশ মহলে সম্মানিত করেন। প্রিয় নবীজি (ﷺ)-এর সাথে, সাহাবিদের সাথে, রাহমানের বান্দাদের সাথে—আল্লাহ যেন আমাদেরকেও জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী করে নেন। আমীন।

বিনীত
সাজিদ ইসলাম
সম্পাদক, সীরাত পাবলিকেশন

নফসকে শিকলবদ্ধ করুন

রামাদান—আল্লাহর অশেষ নিয়ামতের মধ্যে অন্যতম বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহর অনুগ্রহে আরেকটি রামাদান আমাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির, আলহামদুলিল্লাহ। রামাদান এমন এক নিয়ামত, যার জন্য অনেক কবরবাসীই উদগ্রীব হয়ে আছে। অন্ধকার মাটির ঘরে শুয়ে তারা আফসোস করে যাচ্ছে—ইশ! যদি আরেকটি বারের জন্যেও তারা রামাদান পেত। সেই সাথে আমরা যারা রামাদান পেয়েছি, তাদের মধ্যেও অনেকেই রামাদানের সদ্ব্যবহার না করার জন্য পরে আফসোস করবে।

রামাদানের আগমন উপলক্ষে অভিনন্দন জানানোর কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল না থাকলেও, খুশির খবর শুনলে পরস্পরকে অভিনন্দন জানানো যায়। যেমন- কা'ব বিন মালিক (ﷺ) ও তাঁর দুই সঙ্গীর ঘটনা আমরা সবাই জানি। তাবুক যুদ্ধে অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন বলে নবীজি (ﷺ) এর নির্দেশে তাঁদেরকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল। এবং পরে আল্লাহ ওহী নাযিলের মাধ্যমে তাঁদেরকে ক্ষমার সুসংবাদ দেন। সূরাহ আত-তাওবায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"আর সে তিন জনের তাওবা কবুল করলেন।" (সূরাহ তাওবা: আয়াত ১১৮)**

এই আয়াত নাযিলের পর সাহাবিরা দলে দলে গিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানান। *'যাদুল মা'আদ'* গ্রন্থে এই ঘটনার ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) বলেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে—কোনো ঈমানী সুসংবাদ পেলে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে অভিনন্দন জানানো যায়। ইবনু মুফলিহ (ﷺ) এই বিষয়ে ইমাম আহমাদ (ﷺ)-এর অনেকগুলো মত উল্লেখ করেছেন। আর সবশেষে তিনি বলেন, সবচেয়ে বিখ্যাত মত হলো এই যে—ইমাম আহমাদ এটি জায়েয বলেছেন।

আল্লাহ বলেন,

> **"তুমি বলে দাও, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার বদৌলতে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা স্তূপীকৃত করছে (পার্থিব সম্পদ), তার চেয়ে তা উত্তম।" (সূরাহ ইউনুস: আয়াত ৫৮)**

তাই মহান রবের কাছে ফরিয়াদ এই যে, তিনি যেন রামাদানে বারাকাহ দান করেন এবং আমাদের আমলগুলো কবুল করে নেন। রামাদানের সদ্ব্যবহার এবং খালিসভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করার তাওফীক দিয়ে আল্লাহ যেন আমাদেরকে

সম্মানিত করেন। সেই সাথে আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেসব মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যারা এই রামাদানে নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে জাহান্নাম থেকে নাজাতপ্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে।

জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই দামি, তার মাঝেও বেশি দামি রামাদানের এই মুহূর্তগুলো। তাই এই মাস হোক নিজেদের ইলমকে আমলে পরিণত করার মাস। আমলে পরিণত করার ব্যাপারটি এমন যে, যখন কুরআনের কোনো আয়াত উল্লেখ করা হয় তখন মনে করুন আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলছেন, আর আল্লাহ যা বলছেন আপনি তা মেনে চলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। যখন কোনো হাদিস উল্লেখ করা হবে, মনে করবেন যেন প্রিয় নবীজি (ﷺ) নিজেই এই হাদিস বর্ণনা করছেন—আর আপনি মনোযোগ দিয়ে তা শুনছেন, হাদিস নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন এবং হাদিসটি মেনে চলার জন্যও আপনি প্রস্তুত। যখন সালাফদের ঘটনা শুনবেন, মনে করুন যেন আপনি তাঁদের সময়ে ফিরে গেছেন। যেন আল্লাহ্‌র প্রিয় সেসব বান্দারা হৃদয় বিগলিত করে ওয়াজ নসিহত করছেন, আর আপনি সামনে বসে তাঁদের সেসব ইলমের অমিয় সুধা পান করছেন।

রামাদানে শুধু সেসব আল্লাহ্‌র বান্দারাই সফল, যারা এই একটি মাসের মেহনতের বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের কাছ থেকে ক্ষমার পুরস্কার লাভ করবে। আমাদের নবীজি (ﷺ) বান্দার এই সফলতাকে একজন দাসের মুক্তি পাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো—তারা কী থেকে মুক্তি পেল? এটা বোঝার জন্য একটু ফিকহ্ বুঝতে হবে। তালাক, বিয়ে এবং দাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে কেউ বুঝে শুনে বলুক আর কৌতুক করে বলুক—সে যা বলেছে তা আর ফিরিয়ে নেয়ার উপায় নেই। কেউ বুঝেশুনে বা ঠাট্টাচ্ছলে স্ত্রীকে তালাক দিলে বা দাসকে মুক্ত করলে তা কার্যকর হয়ে যায়, কথা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মানুষের তো অনেক সীমাবদ্ধতা আর ভুল-ত্রুটি আছে। তারপরও সামান্য এই মানুষের কথাই যদি ফিরিয়ে নেয়া না হয়, তাহলে সর্বশক্তিমান, মহাক্ষমাশীল, মহাদয়ালু, মহাসম্মানিত আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত যদি আপনাকে একবার ক্ষমা করে দেন—আপনার কি ধারণা তিনি তাঁর কথা আবার ফিরিয়ে নেবেন? আপনাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন? প্রশ্নই উঠে না। রামাদান এমন এক মাস, যখন সবদিক থেকে ক্ষমা আর সফলতা আপনাকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করে। আর এই মাসে আল্লাহর ক্ষমা না পাওয়ার অর্থ হলো আপনি ক্ষমা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেননি—এটা আপনার ব্যর্থতা। তাই রামাদানের শুরু থেকেই আসুন আমরা আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। আর রামাদানে আল্লাহ্‌র এই ক্ষমা পাওয়ার জন্য তিনটি মহামূল্যবান সুযোগ থাকছে।

প্রথম সুযোগ

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশায় রামাদানে সিয়াম পালন করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।” [১]

এই হাদিসে ‘ঈমান’ ও ‘ইহতিসাব’ শব্দ দু’টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার (رحمه الله) বলেন, ঈমান অর্থ বিশ্বাস আর এই ঈমান আনা সবার উপর ফরয। আর ‘ইহতিসাব’ মানে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কারের আশা করা।

আর এই পুরস্কার হচ্ছে—আল্লাহর ক্ষমা। শুধু ক্ষমা-ই কি শেষ পুরস্কার? না, এটাই শেষ পুরস্কার নয়। বরং এর বাইরেও প্রতিদিন কিছু বিশেষ মুহূর্ত আপনি পাবেন, যখন আপনার দু'আগুলো কবুল করা হয়। প্রতিদিন আপনি পাহাড় সমান আমল করতে পারেন। সেটা এত বিশাল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে এগুলোর হিসাব রাখা সম্ভব নয়। প্রতিদিন সিয়াম পালনের মাধ্যমে আপনি জাহান্নাম থেকে কমপক্ষে সত্তর বছরের দূরত্বে চলে যেতে পারেন। যদি আপনি পুরো রামাদান সিয়াম পালন করেন, তাহলে সত্তর গুণ ত্রিশ—অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে আপনি দুই হাজার একশ বছরের দূরত্বে চলে গেলেন।

অর্থাৎ প্রথম হাদিস অনুযায়ী যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ঈমান ও ইহতিসাব সহকারে সিয়াম পালন করে—তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় সুযোগ

কোনো কারণে হয়তো আপনার সাওমে কিছু ত্রুটি বা কমতি থেকে গেল। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ আরেকটা সুযোগ আছে আল্লাহর ক্ষমা লাভের। তা হলো রাতে সালাত পড়া।
“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশায় রামাদানে কিয়াম করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।” [২

তৃতীয় সুযোগ

ধরুন কারো সাওম এবং কিয়াম দুটোতেই ত্রুটি ছিল। তার জন্য তৃতীয় আরেকটি সুযোগ আছে। আর সেই সুযোগটি হলো লাইলাতুল ক্বদর—যে একটি রাতই আল্লাহর মাগফিরাত অর্জন করার জন্য যথেষ্ট।

---

[১] সহিহ বুখারি: ৩৮

[২] সহিহ বুখারি: ৩৭

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কারের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে সালাত আদায় করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[৩]

খেয়াল করলে দেখবেন তিনটি হাদিসের শেষে একই কথা বলা হয়েছে—আপনার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আপনাকে মাফ করে দেওয়া হবে যদি আপনি রামাদানে সিয়াম পালন করেন, রাতে সালাত আদায় করেন এবং লাইলাতুল ক্বদরের রাতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনাকে শুধু ক্ষমা-ই উপহার দেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু নয়, বরং আপনার প্রতিটি আমলের জন্য আল্লাহ কয়েক গুণ সাওয়াব দিয়ে জান্নাতে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু আপনি যদি আল্লাহ্‌র ক্ষমা না পান—তবে সেটা আপনার গাফিলতি আর ফাঁকিবাজির ফল। কিন্তু এর মাধ্যমে আপনি কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন? আল-গাফুর আল্লাহ্‌র ক্ষমাকে? আপনি চারদিক থেকে আপনার দিকে ছুটে আসা রহমত ও ক্ষমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, দুনিয়ার শান্তি আর অনন্ত সুখের জান্নাতে প্রবেশের জন্য এই রহমত আর ক্ষমা আপনার একান্ত প্রয়োজন। একদিন যার জন্য আপনি আফসোস করবেন।

ক্ষমা আর উচ্চ মর্যাদা লাভের এত বেশি সুযোগ রামাদানে আছে যে, যে ব্যক্তি এই সুযোগ হেলায় হারায় তাকে নবীজি (ﷺ) এবং রুহুল ক্বুদুস জিবরীল (عليه السلام) —উভয়ই বদ-দু'আ করেছেন। একটি সহিহ হাদিসে আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার মিম্বরে আরোহণ করার সময় প্রতি ধাপে আমীন বললেন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমীন বললেন কেন?" নবীজি (ﷺ) জবাব দিলেন, জিবরীল (عليه السلام) এসে দু'আ করলেন যে, আল্লাহ তার নাক ধূলোয় ধূসরিত করুন যে রামাদান পেল অথচ ক্ষমা হাসিল করতে পারল না। তাই আমি বললাম- আমীন।" [৪]

রামাদানের বিশেষত্ব কোথায়?

রামাদানের বিশেষত্ব হলো—এই মাসে আমল করলে বেশি নেকী, বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। বছরের বাকি এগারো মাসে যেসব ইবাদাত আপনি হেলায় হারিয়েছেন, তার ক্ষতিপূরণের এখনই সময়। আপনি এই রামাদানে যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করবেন, যত ওয়াক্ত সালাত পড়বেন, যতটুকু যিকির করবেন—তার সাওয়াব অন্য যেকোনো মাসের চেয়ে বেশি হবে। আসলে এই মাসে ইবাদাতের সাওয়াব এত বেশি

---

[৩] সহিহ বুখারি: ২০১৪

[৪] মুসনাদে আহমাদ: ৭৪৫১

হবে, যা আপনি আমি কেউ-ই হিসাব করে শেষ করতে পারব না। এজন্যই নবীজি (ﷺ) এক হাদিসে কুদসীতে বলেন,

> “আল্লাহ বলেন, বনী আদমের সকল আমল তার নিজের জন্য, শুধু সিয়াম ছাড়া। নিশ্চয় তা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব।”[৫]

এত বেশি সাওয়াব যে, শুধু আল্লাহ তাআলাই তার হিসাব করতে পারেন, এমন পুরস্কার যা দিয়ে আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেন। আর এই মাসে সাওয়াবের পরিমাণ বাড়তেই থাকে যতক্ষণ না তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যায় অর্থাৎ ৮৩.৩৩ বছরের সমান হয়ে যায় (এক হাজার মাস)! লাইলাতুল ক্বদরের এক রাকাত সালাতের সাওয়াব হবে ত্রিশ হাজার রাত ধরে এই সালাত পড়ার সমান! একবার সুবহানআল্লাহ বললে সেটার সাওয়াব হবে ত্রিশ হাজার রাত ধরে সুবহানআল্লাহ বলার সাওয়াবের সমান!

জান্নাতুল ফিরদাউসের শিখরে পৌঁছানোর পথটি হলো আল্লাহর ইবাদাতপূর্ণ পথ। এ পথে চলতে গিয়ে আপনাকে একের পর এক সমতল ভূমি, উপত্যকা আর পাহাড়-পর্বত মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ এই পথ যে দুঃখকষ্ট আর পরীক্ষা দিয়ে ভরপুর! ডানে বামে চোর ডাকাত দেখতে পাবেন। এই চোর ডাকাতগুলো আপনার পথ আগলে দাঁড়াবে। তারা আপনার টাকাপয়সা চায় না। তারা আপনার ধনসম্পদ কিংবা জীবনও কেড়ে নিতে চায় না। বরং তারা আপনার সবচেয়ে দামী জিনিসটি ছিনিয়ে নিতে চায়। তারা আপনার দ্বীন, ঈমান আর আপনার মূল্যবান সময়গুলো কেড়ে নিতে চায়। তাই সমস্ত বাধা-বিপত্তি আর বিপদ সঙ্কুল পথ মাড়িয়ে অনন্ত সুখের জান্নাতে সেই নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছতে হলে এ পথের পথিকের সঠিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজন।

কোন পথটা নিরাপদ, কোথায় চোর ডাকাত ওঁত পেতে আছে, কখন জোর কদমে হাঁটতে হবে, আর কখন একটি নির্দিষ্ট বেগে এগিয়ে যেতে হবে—এসব বিষয়ে তাঁর দিকনির্দেশনার দরকার আছে।

রামাদান একটি বরকতময় মাস এবং পরিশ্রম করার উপযুক্ত মৌসুম। আমাদের দায়িত্ব হলো পরস্পরকে হকের পথে আহবান করা এবং ইবাদাত ও নেক আমল করতে উৎসাহিত করা। যদিও এটা আমাদের সারা বছরেরই দায়িত্ব, তবে রামাদানে এই দায়িত্বের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

> **“পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে।” (সূরাহ আসর: আয়াত ৩)**

[৫] সহিহ বুখারি: ১৯০৪

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেওয়ার মহান দায়িত্ব থেকে কেউ-ই মুক্ত নয়, আর কেউ-ই দাওয়াত পাওয়ার ঊর্ধ্বেও নয়। রামাদান প্রধানত যে উদ্দেশ্যে রহমত হিসেবে দেওয়া হয়েছে, অনেকেই সে উদ্দেশ্য থেকে পথচ্যুত হয়ে যায়। আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেয়ে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই অনেক জায়গায় রামাদানের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদেরকে রামাদানের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকে কোনো ইবাদাত না করেই রামাদান পার করে দেয়, অনেকে শুধু নফল ইবাদাতে ব্যস্ত থাকে, আর অনেকে শুধু গুনাহতেই ডুবে থাকে। খুব কম মানুষই সঠিক পথে অবিচল থাকে। যাবতীয় ফিতনা এড়িয়ে দ্রুতবেগে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটবর্তী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে যায় খুব অল্প কিছু সৌভাগ্যবান বান্দা।

রামাদানে শয়তানকে শিকলবদ্ধ রাখা হয়, যে শয়তান আপনার গুনাহ করার একটি কারণ। গুনাহ করার অন্য আরেকটি কারণ হলো আপনার নফস। কিন্তু কেউ যদি রামাদানেও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে তার নফসুল আম্মারাহ বিস-সু স্বয়ং শয়তানের চেয়েও খারাপ। আল্লাহ্ বলেন,

"নিশ্চয় নাফস মন্দ কজের নির্দেশ দিয়ে থাকে।" (সূরাহ ইউসুফ: আয়াত ৫৩)

তাই নফসকে নিয়ন্ত্রণ ও পরাজিত করার এটাই সময়। শয়তান যেমন শিকলবদ্ধ আছে, আপনার খারাপ প্রবৃত্তিকেও তেমনিভাবে শিকলবদ্ধ করে ফেলুন। রামাদান হলো ঈমানের জন্য শিফা বা ঔষধ। কারণ সময়ের সাথে সাথে ঈমানে দুর্বলতা আসে। প্রতিবার কাপড় ধোয়া হয়, বারবার ধোয়ার ফলে কাপড় পুরোনো হয়ে যেতে থাকে। একইভাবে ধাতুর জিনিস যেমন- লোহা বাতাসে ফেলে রাখলে অক্সিডেশনের মাধ্যমে তার গায়ে মরিচা পড়ে যায়। তাবারানি গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি (ﷺ) বলেন, "কাপড় যেভাবে পুরোনো হয়ে যায়, তেমনি তোমাদের অন্তরে ঈমানও পুরোনো হয়ে যায়। তাই আল্লাহর কাছে দু'আ কর যেন তিনি তোমাদের অন্তরসমূহে ঈমানকে পুনরায় তাজা করে দেন।"[৬]

তাই আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবেন, তবে সে অনুযায়ী আপনাকে আমলও করতে হবে। রামাদান আপনার অন্তরের ময়লা ঝেড়ে দেয়। কাপড় সেলাই করার মতোই রামাদান ঈমানকে নতুন, তাজা করে দেয়, আর আপনাকে নতুন উদ্যমে ইবাদাতের জন্য উজ্জীবিত করে। রামাদান আমাদেরকে নফসের সাথে লড়াই করতে শেখায়। শয়তান যেভাবে শিকলবদ্ধ হয়ে পড়ে—সেভাবে নফসকেও বন্দী করার মাধ্যমে রামাদান আমাদের ঈমানে প্রাণশক্তি সঞ্চার করে দেয়। এই রামাদানে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের মতো হালাল কাজ থেকে যদি আপনি বিরত থাকেন, তবে সারা বছরই যে সব কাজ হারাম থাকে—তা থেকে বিরত থাকার জন্য রামাদান আপনাকে তৈরি হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

[৬] মুসতাদরাক আল হাকিম: ৫

তাই এখনই সময়, আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কটা মজবুত করে নিন। আর এই প্রক্রিয়া আপনাকেই শুরু করতে হবে, প্রথম পদক্ষেপটা আপনাকেই নিতে হবে। এক হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "বান্দা আমাকে যেমন ভাবে, আমি তেমনই। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথেই আছি।" আপনিই আগে আল্লাহকে স্মরণ করবেন। আল্লাহ বলছেন, "সে যদি নিজে আমাকে স্মরণ করে, আমি নিজে তাকে স্মরণ করি। আর সে যদি কোনো মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি এর চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"[৭]

সুতরাং আল্লাহর দিকে প্রথম কদমটা আপনাকেই রাখতে হবে, তারপর আল্লাহ তাআলা আপনার ডাকে সাড়া দেবেন। কুরআনে এই ব্যাপারে বলা হয়েছে,

> **"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরাহ গাফির: আয়াত ৬০)**

আল্লাহ আরও বলেন,

> **"অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৫২)**

আল্লাহ তাআলার সাথে আপনার সম্পর্কের প্রথম পদক্ষেপ আপনাকেই নিতে হবে। আর রামাদান হলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর দিকে সেই কদম বাড়ানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। যেভাবে শীত আসলে আপনি গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করেন, ফায়ারপ্লেসের আগুনটাকে জ্বালিয়ে দেন—তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য আপনার মনের আকাঙ্ক্ষাও উজ্জীবিত করতে হবে। আপনার হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসাকে আরও তীব্র করার চেষ্টা করুন, যাতে করে এই মাসে আপনি যে ইবাদাত করবেন সেটা আপনার জন্য আনন্দের হয়, এবং আপনি যেন ইবাদাতকে উপভোগ করতে পারেন। আপনি যদি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আপনার হৃদয়কে উজ্জীবিত করতে না পারেন, তাহলে আপনার ইবাদাত কখনোই উপভোগ্য হবে না। আমরা চাই না আপনি আল্লাহ তাআলার শুধু ইবাদাতই করুন, বরং আমরা চাই আপনি এমন ইবাদাত করুন যা আপনি উপভোগ করছেন।

যারা অনিচ্ছায় সাওম পালন করে তারা ফাসিক, তারা একরকম বাধ্য হয়েই এটা করে। আর যারা আল্লাহর জন্য সাওম পালন করে আনন্দ পায়, সাওমকে উপভোগ

---

[৭] বুখারি: ৭৫৩৬, মুসলিম: ৭০০৮

করে তারাই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা। এই দুই শ্রেণীয় সাওম পালনকারীর মাঝে পার্থক্য আছে। আল্লাহ্ বলেন,

> **"তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে।" (সূরাহ ফাতির: আয়াত ৩২)**

কিছু বান্দা আছে যারা মধ্যম পর্যায়ের, আর কিছু বান্দা আছে যারা এই আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় পর্যায়ের—আর তারাই সর্বোত্তম। তারা সাওম পালন করে এবং সাওম পালন করে আনন্দ পায়। এদেরকেই বলা হচ্ছে সাবিকুন বিল-খাইরাত, অর্থাৎ যারা তাদের ভালো কাজে অগ্রবর্তী থাকে। একদল লোক আছে যারা তারাবীহ সালাত আদায় করে, কিয়াম করে আর ভাবতে থাকে কখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরাবেন। আর একদল আছে যারা শুধু করার জন্যই করে, অর্থাৎ তারাবীহ পড়তে হয় তাই পড়ে, সাওম রাখতে হয় তাই রাখে। তাদের কাছে এগুলো শুধু কিছু সামাজিক নিয়মনীতি অনুসরণ করার মতো। কিন্তু এদের বাইরেও এমন অনেক আল্লাহ্‌র বান্দারা আছে সালাতের সময় যাদের হৃদয়গুলো এই অনুভূতি দ্বারা কম্পিত থাকে যে, সে তো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে! তারা সাওমকে উপভোগ করে, উপলব্ধি করে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার গভীরতা, আল্লাহর জন্য তাদের কুরবানী; যদিও তাদের পেট ক্ষুধার জ্বালায় চৌচির হয়ে যায়। শরীরে একটু কষ্ট হলেও তাদের মন তো থাকে অন্য ধ্যানে। তাদের মন ব্যস্ত থাকে সাওম আর অন্য সকল ইবাদাতের সৌন্দর্য অনুধাবনে।

শরীরের কষ্ট নিয়েও তাঁর হৃদয় হাসছে এই ভেবে যে, এটা তাকে জাহান্নাম থেকে কত দূরে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাঁকে করে দিচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউসের কত কাছাকাছি! সে তার সালাতকে ইহসানের পর্যায়ে নিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ, উপভোগ করে প্রতিটি রুকু, সিজদা! কারণ তার এই কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকা তাকে যে পুরস্কার এনে দেবে, সে শুধু ঐ পুরস্কারের চিন্তায় বিভোর থাকে। আর সেই পুরস্কার হচ্ছে এমন একটি প্রাসাদ, যার ছাদ হলো আল্লাহর আরশ। সেই প্রাসাদের প্রতিবেশী হবেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তাই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে আপনার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিন, যাতে আপনি আপনার ইবাদাত উপভোগ করতে পারেন। যেন এই রমাদানে অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে আপনার রব আপনাকে তাঁর জান্নাতে ঠাঁই করে দেন।

আল্লাহর পথে যাত্রা

মহান রবের ইবাদাতকে উপভোগ করার জন্য রবের সাথে আমাদের আত্মার বন্ধন মজবুত হওয়া চাই। কারণ ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ, আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য দরকার উপযুক্ত প্রস্তুতি। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে মূসা (ﷺ)-এর কথোপকথনের ঘটনাটি একটি উদাহরণ হতে পারে। কুরআনে উল্লেখিত এই ঘটনায় মূসা (ﷺ) আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

> **"হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে এলাম, যাতে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন।" (সূরাহ ত্ব-হা: আয়াত ৮৪)**

মূসা (ﷺ) আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চেয়েছিলেন। ফিরাউনকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ তায়ালা মূসা (ﷺ) ও বনী ইসরাইলের জন্য একটি সময় ও স্থান নির্বাচন করে দিলেন। মহান রব তাঁর বান্দা মূসা (ﷺ)-কে তুর পাহাড়ের নিচে আসতে বললেন। মূসা (ﷺ) হারুন (ﷺ)-কে বনী ইসরাইলের সাথে রেখে একাকী আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত তুর পাহাড়ের দুরুত্ব যত ঘনিয়ে আসছিল, মূসা (ﷺ)-ও গন্তব্যের দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মূসা (ﷺ) তো তাড়াহুড়া না করে ধীরেসুস্থে এগোতে পারতেন। কিন্তু এটা ছিল তাঁর জন্য এক বিশেষ সাক্ষাৎ—মহা আকাঙ্ক্ষিত। কারণ এই সাক্ষাৎ ছিল স্বয়ং আল্লাহর সাথে! এমন এক সাক্ষাৎ—যা কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না!

মূসা (ﷺ) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য, একটিবার তাঁর রবের সাথে কথা বলার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আপনার কাছেও দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ আছে। আসলে রামাদানের প্রতিটা মুহূর্তই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ। আপনি চাইলে এই সুযোগ গাফিলতি করে পার করে দিতে পারেন, মূসা (ﷺ)-এর মতো তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসার সাথে আল্লাহর সাক্ষাতে দ্রুত এগিয়ে আসতে পারেন, কিংবা চাইলে এই সাক্ষাৎ একেবারেই বাতিল করে দিতে পারেন। সিদ্ধান্ত একান্তই আপনার।

কিন্তু কেন মূসা (ﷺ) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য এত উদগ্রীব ছিলেন? কারণ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ মূসা (ﷺ)-এর জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত ছিল। আর এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার পেছনের কারণ হলো, মূসা (ﷺ) আল্লাহর ইবাদাত করতে পছন্দ

করতেন। আপনি যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসাকে তীব্রভাবে উজ্জীবিত করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ইবাদাত করে আনন্দ পাবেন না। কেউ যদি কারো ভালোবাসার প্রত্যুত্তরে তীব্র আবেগ ও ভালোবাসাবিহীন আচরণ করে, তার সেই আচরণে যদি কোনো আকাঙ্ক্ষাই না থাকে, তাহলে এই ভালোবাসা সস্তা, মূল্যহীন। আপনার প্রধান কাজ আল্লাহ্র ইবাদাত। এই ইবাদাতের মাঝে আপনি যদি আল্লাহর প্রতি আপনার আবেগ, তীব্র ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষা ঢেলে দিতে পারেন, তবেই সেই ইবাদাত আপনার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসার মধ্যে কেন দুর্বলতা দেখা দেয়? কারণ সময়ের সাথে সাথে আমাদের অন্তরের উপরে রা'আন পড়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন,

> **"কখনো নয়; বরং তারা যা করেছে তা-ই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" (সূরাহ্ মুতাফফিফিন: আয়াত ১৪)**

রা'আন হলো একটি কালো দাগ। প্রতিবার গুনাহ্ করার পরে গুনাহ্কারীর অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়ে যায়। যারা তাওবা করে তাদের অন্তর থেকে এই কালো দাগ মুছে যায়। আর যারা তাওবা করে না—এই কালো দাগগুলো তাদের অন্তরকে কালো কয়লার মতো করে দেয়। রামাদান হচ্ছে অন্তর থেকে এই রা'আনকে (কালো দাগ) মুছে ফেলার উৎকৃষ্ট সময়। গুনাহের কারণে আমাদের অন্তরে যে কালো আস্তরণ পড়েছে, তা মুছে ফেলতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। হতে পারে গুনাহের দরুন আমাদের অন্তর আজ মৃতপ্রায়। কিন্তু এই মৃত অন্তরকেও জীবিত করা সম্ভব। গুনাহের কারণে অন্তরে যে কালো আবরণ পড়েছে, সেটাও পরিষ্কার করা সম্ভব।

কিন্তু কীভাবে আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসা পুনরুজ্জীবিত করতে পারি? এজন্য আপনাকে নিতে হবে চারটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

কুরআনকে অন্তরে ধারণ করা

কুরআন তিলাওয়াত করুন, এর অর্থ বুঝুন এবং অর্থ নিয়ে ভাবুন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বোঝার চেষ্টা করুন। আরবি না বুঝলে কুরআনের অর্থ পড়ুন, তাফসীর পড়ুন। তাফসীর ইবনু কাসির পড়ুন, এর অনুবাদ পাওয়া যায় এবং এটা আমাদের জন্য একটি বিরাট অর্জন। আমাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে, কুরআন বুঝতে হলে আগে এই তালা ভাঙতে হবে।
আল্লাহ্ বলেন,

> **"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (সূরাহ্ মুহাম্মাদ: আয়াত ২৪)**

এই আয়াতে আসলে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি, বরং এর মাধ্যমে আপনাকে কিছু জানানো হয়েছে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তারা কুরআনকে বুঝতে পারে না; কারণ তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। কুরআন তিলাওয়াতের সময় কুরআনের ব্যাপারে অসচেতন, অমনোযোগী থাকবেন না। কুরআন তিলাওয়াত করা খুব সহজ, আল্লাহর প্রশংসা করাও খুব সহজ, কিন্তু আপনার মন হয়তো যত্রতত্র ঘুড়ে বেড়াচ্ছে আর আপনার এই মনকে কুরআনের দিকে, আল্লাহর দিকে স্থির রাখাই আপনার জন্য কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি।" (সূরাহ কাহাফ: আয়াত ২৮)**

আল্লাহ তাদের আনুগত্য করতে কেন নিষেধ করলেন, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল? কারণ অনেকেই আল্লাহর যিকির করে, কিন্তু খুব কম বান্দা-ই যিকিরের সাথে সাথে অন্তরকেও আল্লাহর স্মরণে মগ্ন রাখতে পারে।

আসুন কীভাবে কুরআন পড়তে হয়, তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখি। কীভাবে কুরআনের একটি আয়াত আবু দারদা (ﷺ)-কে উজ্জীবিত করেছিল!

> **"কে আছো এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ২৪৫)**

আল্লাহকে ঋণ! বান্দা দেবে আল্লাহকে ঋণ! আবু দারদা (ﷺ) এই আয়াত শুনে বিস্ময়ের সাথে নবীজি (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ আমাদের কাছে ধার চাচ্ছেন?' নবীজি (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ'। আবু দারদা (ﷺ) বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার হাতটি দিন, আমি কথা দিচ্ছি আমার খেজুর বাগানটি ধার দিব। আবু দারদা (ﷺ) নবীজি (ﷺ)-কে ৬০০টি খেজুর গাছ সমৃদ্ধ সবচেয়ে ভালো খেজুর বাগানটি দিয়ে দিলেন। আবু দারদা (ﷺ)-এর অনেকগুলো বাগান ছিল, তিনি ধনী ছিলেন। তিনি তাঁর সবচেয়ে উত্তম বাগানটিতে গেলেন। কোন বাগানটিতে জানেন? যেখানে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'সবকিছু গুছিয়ে নাও, আমরা এই বাগান থেকে চলে যাচ্ছি। এই বাগান এখন আর আমাদের নয়, কারণ এই বাগানটি আমি উত্তম ঋণ হিসেবে আল্লাহকে দিয়েছি।' এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তাঁর স্ত্রী কি অভিযোগ করেছিলেন? বলেছিলেন, কেন, কী হচ্ছে এসব! না, তিনি কোনো অভিযোগই করেননি, কোনো পাল্টা প্রশ্নও না। তিনি চুপচাপ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বাচ্চাদের হাত ধরলেন। তিনি বুঝলেন যে, এই বাগানটি উত্তম ঋণ হিসেবে আল্লাহকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এর মধ্যে যা আছে সেগুলাও আর তাঁদের নয়। কাজেই তিনি বাচ্চাদের হাতে যে খেজুরগুলো ছিল, সেগুলো নিয়ে নিলেন, এমনকি বাচ্চাদের মুখে যা ছিল তাও বের করে রেখে দিলেন। একেবারে শুন্য হাতে বাচ্চাদের নিয়ে তিনি বাগান থেকে বের হয়ে গেলেন।

আল্লাহকে পেতে চাওয়ার তীব্র আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত মানে হচ্ছে এটাই—আল্লাহর কথাকে (কুরআনকে) বুঝতে পারা। কুরআনে যে আদেশ নিষেধ আছে, তা মেনে নেয়া এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের ইতস্তত ভাব বা বাধা সৃষ্টি না হওয়া। যখন নবীজি (ﷺ) আবু দারদা (رضي الله عنه)-এর প্রতিশ্রুতির কথা শুনলেন, তিনি বলেন,

"আবু দারদা (رضي الله عنه)-এর জন্য জান্নাতে এমন অনেকগুলো বাগান আছে।"[৮]

আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুদান স্মরণে রাখা

অন্তর থেকে পাপের কালো দাগ দূর করে আল্লাহর প্রতি আশা, আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায় হলো—আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নিয়ামত ও রহমত স্মরণ করা। মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হলো সে যার দ্বারা উপকৃত হয়, তাকে পছন্দ করে—এটা আল্লাহ তাআলাই মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। মানুষকে কেউ যদি একটি ফুলের তোড়া দেয় বা চাকরি পেতে সাহায্য করে, তাহলে সে উপকারকারীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকে, তার প্রশংসা করে। অনেক সময় এর চেয়েও ছোট ব্যাপারে মানুষ কারো প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তো মানুষকে সবার চেয়ে বেশি কিছু দেন। তিনি এমন সব নিয়ামত দেন—যা আর কেউ মানুষকে দিতে পারে না। শ্রবণশক্তি, জিহ্বা, দৃষ্টিশক্তি, আকাশ, পৃথিবী, রাত আর দিনের ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত আছে। কুরআনের এসব আয়াতের উদ্দেশ্য কী? যাতে করে আল্লাহর রহমত আর নিয়ামতের স্মরণ আমাদের অন্তরে দৃঢ় হয় এবং আল্লাহর প্রতি আশা, আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমাদের অন্তর আলোকিত হয়।

আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে আপনি যত বেশি জানবেন, যত বেশি অনুধাবন করবেন—আল্লাহর কাছে শুকরিয়া প্রকাশের ইচ্ছা আপনার মধ্যে তত বেশি প্রবল হবে। প্রত্যেক দিন আপনার এবং আপনার পরিবারের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করুন। আর আপনার চারপাশে এমন সব মানুষদের দেখুন—যাদের কিছুই নেই। আল্লাহর নিয়ামতের কথা ভাবুন, এভাবেই আপনার ভিতরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি ঘুম থেকে নির্বিঘ্নে উঠলাম যখন অনেকেই কারাগারে বন্দী, অনেকের উপরই বোমা বর্ষন করা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি সুস্থ আছি। আলহামদুলিল্লাহ! আজ সারাদিন চলার জন্য আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। নবীজি (ﷺ)-এর এই হাদিসটি স্মরণ করুন, "ব্যক্তি নিজ ঘরে ঘুম থেকে নিরাপদে এবং সুস্থভাবে উঠল, এবং এমনভাবে উঠল যে তার কাছে ঐ দিনের জন্য রিযিক আছে, তবে সে যেন দুনিয়ার সকল কিছু পেয়ে গেল।"

---

[৮] মুসলিম: ২২৮৩

অনুতাপ ও তাওবা

প্রথমত কুরআনকে অন্তরে ধারণ করা, দ্বিতীয়ত আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা। আর তৃতীয় হলো—অতীতে যে সময় নষ্ট করেছেন, তার ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে নিজের অন্তরকে জীবিত করে তোলা। সে সময়গুলোর জন্য অনুতপ্ত হোন—যা আল্লাহর ইবাদাত করার বদলে পাপাচারে অতিবাহিত হয়েছে। এতটাই অনুতপ্ত হতে হবে, যাতে করে আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পুনরুজ্জীবিত হয়। হৃদয়কে অনুতাপের আগুনে জ্বালিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে খালিস মনে তাওবা করে নিতে হবে, অতপর সেই অতীত অধ্যায়কে বাদ দিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে। এখন একমাত্র লক্ষ্য হবে অতীতে যে ঘাটতি রয়ে গেছে তা পুষিয়ে নেয়া। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে নিজেকে ভালোভাবে গড়ে তোলা। অন্য যে কারোর চেয়ে নিজের আত্মাকে আরও বেশি পরিশুদ্ধ করে নেওয়া।

অগ্রজদের মনে রাখা

চতুর্থ পদক্ষেপ হলো—সালাফদের কথা স্মরণ করা। যাতে করে সালাফদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন, তাঁদের সাথে নিজের তুলনা করতে পারেন। আর এটা আপনার মনে এমন অনুভূতির সৃষ্টি করবে—যা আপনাকে তাঁদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আল্লাহ্ বলেন,

> **"তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে।" (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১৩৩)**

তিনি আরো বলেন,

> **"তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমার আশায়।" (সূরাহ আল হাদিদ: আয়াত ২১)**

> **"এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" (সূরাহ আল মুতাফফিফিন: আয়াত ২৬)**

হ্যাঁ, জান্নাতের বিভিন্ন স্তরের জন্য আপনাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। আল্লাহর প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য জ্বালানি স্বরূপ। এটাই আপনাকে খুশি মনে আগ্রহ নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করতে উদ্বুদ্ধ করবে। যখন ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ কমে যায়, অন্তরে আল্লাহর প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা কমে যায়, তখন আপনার চূড়ান্ত গন্তব্যের (জান্নাতের) কথা স্মরণ করুন। আর এই গন্তব্য তো সেই সকল মুমিনের, যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর উপর আশা আর আকাঙ্ক্ষা রাখে।

আল্লাহর রাসূলের একটি হাদিস, এ হাদিসটি আপনার মনে গেঁথে রাখুন। আপনার কম্পিউটারের সামনে, আপনার বাসায়, আপনার রুমে লাগিয়ে রাখুন।

মোট কথা এই হাসিদটি কখনো যেন অন্তর থেকে মুছে না যায়। সহিহ মুসলিমে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"যখন জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের বলবেন, তোমরা কি আমার কাছে আরো কিছু চাও?"

তখন তারা বলবে, "আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দেননি?"

"আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?"

যদিও জান্নাতে সবাই আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবে। আল্লাহ বলেন,

"এদিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে।" (সূরাহ ইয়াসিন: আয়াত ৫৫)

কিন্তু তারপরও জান্নাতীরা সেদিন এর চেয়েও বেশি কিছু পাবে। আল্লাহ সেদিন তাঁদের চোখের উপর থেকে পর্দা তুলে নেবেন আর আল্লাহর বান্দারা সেদিন তাদের রবকে নিজের চোখে দেখতে পাবে। আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার তুলনায় তারা এ পর্যন্ত যা যা পেয়েছে, সবকিছু ভুলে যাবে। [৯]

সুতরাং আল্লাহর উপর আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখুন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করুন, জান্নাতে আল্লাহকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসের আকাঙ্ক্ষা রাখুন।

এই রামাদানে আপনার লক্ষ্য হবে আল্লাহর সিংহাসন যেন জান্নাতে আপনার ছাদ হয়, আপনার ছাদের উপর যেন আল্লাহর সিংহাসন থাকে। আপনি যেন ওয়াসিলার সবচেয়ে নিকটে থাকেন। আপনি যেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, খালিদ, আবু উবায়দাহ, আইশা, খাদিজা, উম্মে সালামা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের প্রতিবেশী হন।

এইভাবেই আপনি আল্লাহর প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্জন করুন। তবে এই পথটা মোটেই সহজ নয়। আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত করার সময় আপনার সামনে অন্তরের অনেক ফিতনাহ এসে উপস্থিত হবে। চাকরি, সামাজিক প্রতিপত্তি, ধনসম্পদ, সন্তান, জীবনসঙ্গী—একের পর এক ফিতনা আসতেই থাকবে। এর মধ্যে কিছু আপনাকে আনন্দিত করবে, ধোঁকায় ফেলে দেবে। তাই এগুলোকে আপনার জন্য ফিতনাহ হতে দেবেন না, জান্নাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেবেন না।

---

[৯] সহিহ মুসলিম: ৪৬৭

শুধু আমার রব জানেন

আমাদের ইবাদাতের একমাত্র লক্ষ্য হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। মানুষকে দেখানোর জন্য কিংবা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা নয়। আল্লাহ্‌ বলেন,

“তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে।” (সূরাহ আল-বাইয়্যিনাহ: আয়াত ০৫)

যারা রিয়ায় আক্রান্ত এবং রিয়া থেকে বেঁচে থাকতে চান, তাদের জন্য উত্তম উপায় হলো নিজেদের অন্তরে এই সত্য গেঁথে ফেলা যে—খেল-তামাশার এই দুনিয়াতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী বান্দা বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সবাই একথা স্বীকার করে যে, মানুষ ছোট-বড় যেই সমস্যার মধ্যেই পড়ুক না কেন—আশেপাশের সবাই তখন তাকে ছেড়ে চলে যায়। কাজেই যারা দুনিয়াতে সামান্য বিপদের সময়ে আপনার পাশে থাকেনি তাদেরকে খুশি করতে গিয়ে কেন আপনি আপনার মহা মূল্যবান ইবাদাত বরবাদ করবেন! দুনিয়া এবং আখিরাতে আপনার পাশে সব সময় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে পাবেন, আর আপনার সকল ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য মালিক তো তিনিই।

আল্লাহর জন্য করা আপনার একান্ত আন্তরিক আর গোপনীয় আমলগুলোই আপনার একমাত্র সম্বল, এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে আপনার দুনিয়া এবং আখিরাতের যাবতীয় চাহিদা পূরণের দু’আ করুন।

সহিহ মুসলিমে তিন ব্যক্তির ঘটনা নিয়ে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তিনজন লোক একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। এমন সময় একটা পাথর এসে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তাদের একজন বলল, চলো আমরা সবাই নিজেদের ভালো আমলের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু’আ করি যাতে তিনি আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করেন। প্রথম লোকটি উঠে পড়ল এবং বলল, “হে আল্লাহ্‌! আমার বাচ্চারা একবার দুধের জন্য আমার পা ধরে কান্নাকাটি করছিল, কিন্তু আমার মা-বাবাকে দুধ পান করানোর আগে অন্য কাউকে দুধ পান করানোর কথা আমি ভাবতে পারছিলাম না। সেদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল, আর আমার মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত আমি তাঁদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম আর আমার বাচ্চারাও দুধের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকল। এভাবে ভোর হয়ে গেল, আমার মা-বাবা ঘুম থেকে উঠলেন। প্রথমে আমি তাঁদেরকে দুধ পান করালাম, এরপর

আমার বাচ্চাদের দুধ পান করতে দিলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি শুধু আপনার এবং কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি, তাহলে আপনি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।” তার দু’আর পরে পাথরটি গুহামুখ থেকে একটু সরে যায়, তবে সেই ফাঁকটুকু কারো বের হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

লক্ষণীয় যে, লোকটা বলেছিল যদি আমি শুধু আপনার এবং কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই কাজটি করে থাকি। মূলত তার এই নেক কাজের সাথে ইখলাস অর্থাৎ আন্তরিকতা এবং গোপনীয়তাও ছিল।

এরপর দ্বিতীয় লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, “হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোনের প্রতি আকর্ষণ ছিল। তার কাছে আমি মিলিত হওয়ার প্রস্তাব দিলাম, সে তা প্রত্যাখ্যান করল। এরপর একদিন বিপদে পড়ে সে আমার কাছে এসে ১০০ দিনার সাহায্য চাইল। সুযোগ বুঝে আমি তাকে এই শর্তে ১০০ দিনার দিলাম যে, সে নির্জনে আমাকে সুযোগ দেবে। সে বাধ্য হয়ে রাজি হলো। কিন্তু আমি যখন তার নিকটবর্তী হলাম তখন সে বলে উঠল, ‘আল্লাহকে ভয় কর, আমার সতীত্ব নষ্ট করো না।’ তার এই কথা শুনে আমার মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হলো, আমি খারাপ কাজ থেকে বিরত হলাম।”

এরপর সে দু’আ করল, “হে আল্লাহ! এই কাজটি যদি শুধু আপনার এবং কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করে থাকি, তবে এই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।” সাথে সাথে পাথরখণ্ডটি আরেকটু সরে গেল, কিন্তু তাতেও বের হওয়ার মতো সুযোগ হলো না।

এরপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, “হে আল্লাহ্! একবার আমার এক শ্রমিক পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে গেল। তার ঐ অর্থ আমি কাজে লাগালাম। এতে করে আমার গরু ও ছাগলের অনেকগুলো পাল হলো, আমি ধনী হয়ে গেলাম। কিছুদিন পর ফিরে এসে সে তার পারিশ্রমিক দাবি করল। আমি তাকে গরু ছাগলের পালগুলো নিয়ে নিতে বললাম। এতে সে হতবাক হয়ে গেল এবং ভাবল আমি তার সাথে ঠাট্টা করছি। সে বলল, ‘আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না।’ আমি বললাম, ‘আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না।’” এরপর সে দু’আ করল, “হে আল্লাহ! এ কাজটি যদি শুধুমাত্র আপনার এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করে থাকি, তাহলে এই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। তখন আল্লাহ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন এবং তারা সবাই নিরাপদে বেরিয়ে এলো।

আপনি যদি চান যে, আল্লাহ তাআলা এভাবে আপনাকেও বিপদে সাহায্য করুন, আপনার দু’আ কবুল করুন—তবে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। আর এভাবে নেক কাজের উসিলা দিয়ে দু’আ করা নবীজি (ﷺ)-ই শিখিয়েছেন। বেশি বেশি ইখলাসপূর্ণ এবং একান্ত গোপন আমল করার জন্য রামাদানই শ্রেষ্ঠ সময়। আমরা আমল করব শুধুমাত্র

আল্লাহর জন্য, এমনভাবে করব কেউ যেন এই আমলের ব্যাপারে জানতে না পারে, এমনকি আমল করার পরে আমরা নিজেরাও ভুলে যাব এই আমলের ব্যাপারে।

আমলের জন্য সময় কখনো থেমে থাকে না, আর দুনিয়ার জীবন তো পরীক্ষা এবং ফিতনা দিয়ে পরিপূর্ণ। হতে পারে কয়েক বছর পরে আপনার সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়বে, হতে পারে ক্যান্সার ধরা পড়বে, আপনার উপর হয়তো দুঃখ আর দারিদ্র্য আপতিত হবে। আল্লাহ যেন এসব থেকে আমাদের সবাইকে হেফাযত করেন, আমীন।

কিন্তু বিপদ যদি এসেই যায়, তাহলে আল্লাহর কাছে আপনার ইখলাসপূর্ণ এবং একান্ত গোপন আমলের উসিলায় দু'আ করুন, তাঁর কাছে আশ্রয় চান। আর দুনিয়াতে কোনো পুরস্কার দাবি না করে আপনি যদি সব পুরস্কার আখিরাতে পেতে চান, সেটা তো সর্বোত্তম। সেক্ষেত্রে বিচার দিবসে আমলনামার হিসাবের সময় আল্লাহ স্বয়ং আপনার নেক আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে বলবেন,

> **"আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" (সূরাহ আল-আম্বিয়া: আয়াত ৪৭)**

এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) বলেন, "ইখলাসবিহীন আমলের নমুনা ঐ মুসাফিরের মতো, যে একটি ময়লা পানি ভর্তি পাত্র বহন করছে। অনেক কষ্ট করে সে পানির পাত্রটি বহন করে, কিন্তু পানিতে ময়লা থাকায় এটা তার কোনো উপকারে আসে না।" চমৎকার তুলনা। আসলেই ময়লা পানি যেমন আমাদের কোনো কাজে আসে না, তেমনি ইখলাসবিহীন আমলও আমাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

দাউদ ইবনু আবি হিন্দ চল্লিশ বছর যাবত সিয়াম রেখেছিলেন, অথচ তাঁর স্ত্রীও এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না।[১০] তিনি পশমের কাপড় বানাতেন। প্রত্যেক দিন তাঁর স্ত্রী খাবার তৈরি করতেন এবং দাউদ কাজে বের হওয়ার সময় তাঁর সাথে ঐ খাবার দিয়ে দিতেন। আর দাউদ বাজারে গিয়ে খাবারটি একজন গরীব মানুষকে দিয়ে দিতেন এবং মাগরিবের পর বাসায় ফিরে তাঁর স্ত্রীর সাথে খাবার খেতেন অর্থাৎ ইফতার করতেন। বাজারের লোকজন ভাবত তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে খাবার খেয়ে এসেছেন, আর তাঁর স্ত্রী ভাবতেন তিনি বাজারে গিয়ে তাঁর তৈরি করে দেয়া খাবার খাবেন। কিন্তু দাউদ সিয়াম রাখতেন আর সাথে করে আনা খাবার একজন গরীব লোককে দিয়ে

---

[১০] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৩৭৮

দিতেন। সুবহানআল্লাহ! এটাই তো ইখলাস। শুধু তা-ই নয়, তিনি বিশ বছর ধরে কিয়ামুল লাইল করেছেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী এটাও কখনো জানতে পারেননি।

আইয়্যুব আস সাখতিয়ানি (ﷺ) সারারাত সালাত পড়তেন আর ফজরের কিছুক্ষণ আগে থেকে কিছুটা আওয়াজ করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যাতে মানুষ মনে করে তিনি ফজরের কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছেন, অথচ তিনি সারারাতে একটুও ঘুমাননি। হাসান ইবনু আবি সিনান (ﷺ)-এর স্ত্রী বলেছেন "আমার স্বামী প্রায়ই আমার সাথে চালাকি করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন, যেমনটি আমরা আমাদের বাচ্চাদের চালাকি করে ঘুম পাড়িয়ে দেই, আর যখনই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম তখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।" একবার হাসানের স্ত্রী তাঁকে সালাত পড়তে দেখে ফেললেন আর বলে উঠলেন, "আবু আব্দুল্লাহ! কেন নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন? নিজের উপর একটু রহম করুন।" আবু আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, "কী বোকার মতো কথা বলছ! তুমি আমাকে দুনিয়াতে ঘুমাতে বলছ! আমি অবশ্যই ঘুমাব, বিশ্রামও নেব। কিন্তু সেদিন—যেদিন আমাকে আর ঘুম থেকে উঠতে হবে না।"

আলী ইবনু আবি তালিব (ﷺ)-এর নাতির ছেলে, যাইনুল আবিদীন দশ বছর ধরে মদীনার গরীব লোকদের খাবার দিতেন কিন্তু কেউ জানতে পারত না কে তাদের খাবার দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে তারা বাড়ির সামনে খাবার পেত। শেষ পর্যন্ত যাইনুল আবিদীন মারা গেলে তারা বুঝতে পারল যে তিনিই তাদের খাবার দিতেন, কারণ তিনি মারা যাবার পর তাদের বাড়ির সামনে খাবার আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরে যাইনুল আবিদীন (ﷺ)-কে গোসল করানোর সময় তারা তাঁর পিঠে অনেক দাগ দেখতে পেল, এই দাগগুলো আসলে গরিবদের জন্য খাবার বহন করতে করতে তাঁর পিঠে বসে গিয়েছিল।

আল-আ'মিশ (ﷺ) বলেন, আমি ইবরাহীম আন নাখা'ঈ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি কুরআন পড়া শুরু করেছেন এবং একটানা পড়েই যাচ্ছেন। কিন্তু অন্য কেউ আসার সাথে সাথে তিনি কুরআন পড়া বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আমি তাঁর এই গোপন আমলের কথা কাউকে বলব না। তাই আমাকে বলতেন, "আমি চাই না লোকজন আমাকে কুরআন পড়া অবস্থায় দেখুক।"

এই সব নেককার ব্যক্তি আর যারা আল্লাহর রাস্তায় এক বিন্দু ঘাম না ঝরিয়েও নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ব্যস্ত—তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য। যারা সাধারণ একটি খুতবা দিয়ে, অল্প কিছু এতীমের ভরণপোষণ দিয়েই গর্ব করে বেড়ায়। পাঁচ মিনিটের হালাকা করে, রামাদানে দুই তিনবার তারাবীহ সালাতে গিয়েই বুক ফুলিয়ে চলে—মূলত তাদের এ সকল কাজে কোনো ইখলাস বা আন্তরিকতা থাকে না। আর যারা নিজেদের নেক আমলকে নিজেদের গুনাহের মতোই গোপন রাখে, তাদের আমলই ইখলাসপূর্ণ হয়, আর এ ধরনের আমলই বেশি কার্যকর।

ইবনুল জাওযি (رحمه الله) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (رحمه الله) ১৮০ হিজরিতে মারা যান। তিনি ছিলেন একজন আলিম, ইখলাসের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। এমনকি তিনি আশংকা করতেন যে, লোকেরা তাঁর আমলের ব্যাপারে জেনে গেলে অথবা তাঁর প্রশংসা করলে হয়তো তাঁর ইখলাস বরবাদ হয় যাবে। নাঈম ইবনু হাম্মাদ (رحمه الله) বলেন, ইবনু মুবারক (رحمه الله) হাদিস পড়ার সময় ঐভাবেই কাঁদতেন, কুরবানী করার সময় উট বা গাভী যেভাবে শব্দ করে কাঁদে। সুফিয়ান আস সাওরি (رحمه الله) বলতেন, "আমার খুব ইচ্ছা হয়, আমি যেন অন্তত এক বছর হলেও আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (رحمه الله)-এর মতো আমল করতে পারি। কিন্তু আফসোস, আমি তো মাত্র তিন দিনও তাঁর মতো আমল করতে পারি না।"

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (رحمه الله) ছিলেন এমন একজন মুমিন, হক আলিম এবং মুজাহিদ, যিনি তাঁর হক ইলমকে কাজে পরিণত করেছিলেন।

ইবনু মুবারক (رحمه الله) একবার রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে গেলেন। দুদল ছিল একে অপরের মুখোমুখি, লড়াই শুরু হবার উপক্রম। তখনকার যুদ্ধের রীতি ছিলো উভয় দল থেকে একজন করে এসে মুখোমুখি লড়াই করবে। রোমানদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বলল, কে আছ এমন যে আমার তরবারির সামনে দাঁড়াবে? অর্থাৎ এটা ছিল তরবারি লড়াইয়ের আমন্ত্রণ। একজন মুসলিম তার সাথে কিছুক্ষণ লড়াই করে আহত হলো এবং রোমান লোকটি মুসলিম লোকটিকে শহীদ করে ফেলল। এরপর দ্বিতীয় মুজাহিদ এগিয়ে গেল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় শহীদ হয়ে গেল।

তৃতীয় বারও একই ফলাফল হলো। কিন্তু চতুর্থ মুজাহিদ আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমান লোকটিকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। ফলে এই বীর মুজাহিদকে দেখার জন্য মুসলিম বাহিনী তার চারপাশে ভিড় করতে লাগল। ইবনু সুলায়মান (رحمه الله) বলেন, আমিও এই মুজাহিদের পরিচয় জানার জন্য ঐ ভিড়ের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু ঐ মুজাহিদের মুখ ঢাকা ছিল। কারণ তিনি নিজেকে জাহির করতে চাচ্ছিলেন না, আর তিনি এমনভাবে ভিড় থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন যেন কিছুই হয়নি। ইবনু সুলায়মান বলেন, আমি তাঁর মুখের কাপড় টান দিয়ে খুলে ফেললাম আর দেখলাম যে, এই বীর মুজাহিদ আর কেউ নন—তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (رحمه الله) আমার কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আবু উমার! (আবু উমার, ইবনু সুলায়মানের কুনিয়াত) তুমিও কি তাদের মতো, যারা মানুষকে অন্যের সামনে অনাবৃত করে দেয়?"

ইবনু মুবারক মনে করতেন, নেক আমল অন্যের কাছে প্রকাশ হয়ে যাওয়া মানে অন্যের সামনে অনাবৃত হয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ইবনুল জাওযি (رحمه الله) মন্তব্য করেন, "ইবনু মুবারক (رحمه الله) এমনই মুখলিস আলিম ছিলেন যে, তিনি আশংকা করতেন, কেউ যদি তাঁর নেক আমল দেখে ফেলে বা তাঁর আমলের প্রশংসা করে, তবে এটা তাঁর ইখলাসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।" ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (رحمه الله) বলেন,

"আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (ﷺ)-কে তাঁর ইখলাস আর গোপন আমলের জন্যই আল্লাহ তাআলা সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।"

আপনিও এই রামাদানে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের মতো গোপন আমল করার চেষ্টা করুন। ইবনুল জাওযি বলেন, "হাসান আল বসরি (ﷺ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (ﷺ) বেশ কিছুদিন একে অপরের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। একদিন তাঁরা হাঁটতে বের হলেন। একটি ঝর্ণার কাছে পানি পান করতে গেলেন, কিন্তু সেখানে আগে থেকেই ভিড় ছিল। যদি লোকজন তাঁদের পরিচয় জানত, তাহলে অবশ্যই তাঁদেরকে আগে সুযোগ দিত। আব্দল্লাহ ইবনু মুবারক (ﷺ) ভিড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ঝর্ণার পাশে গিয়ে পানি পান করলেন এবং চলে গেলেন। হাসান আল বসরি (ﷺ) বলেন, 'ইবনু মুবারক আমাকে বললেন এটাই জীবন যাপনের উত্তম পদ্ধতি।'"

আমরা যেদিক থেকেই বিচার করি না কেন, তাঁরা ছিলেন সব দিক থেকেই প্রকৃত ইমাম। তাঁরা চাইতেন না মানুষ তাঁদের কোনো আমল সম্পর্কে জানুক। আপনি গভীর রাতে আল্লাহর কাছে কাঁদুন, কুরআন তিলাওয়াত করুন, আল্লাহ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে আপনার সম্মান এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। আর-রাবঈ ইবনু খুসাইম সব সময় তাঁর ইবাদাত গোপন করার চেষ্টা করতেন, যাতে কেউ জানতে না পারে। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন, আর পাশ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলেই কুরআনটিকে তাঁর জুব্বার মধ্যে লুকিয়ে ফেলতেন, যাতে কেউ জানতে না পারে যে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।

> **"কোনো ব্যক্তিই (এখন) জানে না চোখ জুড়ানো কী (জিনিস) তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে।" (সূরাহ আস-সাজদাহ: আয়াত ১৭)**

আল্লাহ কেন এখানে বলেছেন যে, লুকিয়ে রাখা হয়েছে? আর কেনই বা এটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে? যারা তাদের আমল মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, আল্লাহ্ তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার লুকিয়ে রেখেছেন। আমলের ধরনের উপর পুরস্কার নির্ভর করে। আপনি যেমন আমল করবেন, তেমনই পুরস্কার পাবেন। আপনি যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য গোপনে কোনো আমল করেন, আল্লাহও আপনার জন্য গোপন পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।

সহিহ মুসলিমে[১১] বর্ণিত আছে, একজন উষ্কখুষ্ক ধূলি ধূসরিত লোক যাকে মানুষ এমন ছোট চোখে দেখে যে, যদি সে কারো দরজায় কড়া নাড়ে, তাহলে তার জন্য দরজা পর্যন্ত খোলা হয় না। কিন্তু আল্লাহর কাছে সে আসলে কেমন? নবীজি (ﷺ)

---

[১১] মুসলিম: ৬৮৪৮

তাঁর ব্যাপারে বলেন, সে আল্লাহর নামে কোনো শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। আপনার আমার কাছে মনে হতে পারে সে তো কেউই না! কিন্তু সে তার বাড়িতে গভীর রাতে গোপনে এমন কিছু আমল করেছে যে, সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে দু'আ করে, আল্লাহ তাতে সাড়া দেবেন। যদি সে আল্লাহর কসম করে বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এটা দিন, তবে আল্লাহ তাকে সেটা দেবেন।

আর তাই দু'আ করার সময়, আল্লাহ অবশ্যই দু'আ কবুল করবেন, এই ইয়াক্বীনের সাথে দু'আ করতে হবে।

প্রত্যেকদিন সতের বার আপনি এই দু'আ করেন,

> **"আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরাহ ফাতিহা: আয়াত ৫)**

প্রত্যেকদিন ফরয সালাতে আপনি সতের বার বলেন, আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। সুন্নাহ সালাতে আরও দশ বারেরও বেশি বলেন। প্রত্যেকবার আপনি যখন এই দু'আ করবেন, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই আপনি এই দু'আ করছেন। আর যতটা সম্ভব গোপনে এই দু'আ করুন।

এই রামাদানে পরিকল্পনা করে গোপনে আমল করা শুরু করুন এবং এভাবে আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলুন। শুধু আল্লাহর জন্যই ইবাদাত করুন, আর এমনভাবে করুন যাতে আপনি আর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ঐ ইবাদাতের ব্যাপারে না জানে। আপনি সালাত, দু'আ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত, তারাবীহ, সাদাকা, ইলম অর্জন বা দাওয়াহ যা-ই করুন না কেন, সবই গোপন রাখার চেষ্টা করুন। এমনকি আপনি নিজেও ভুলে যান যে, আপনি কী আমল করেছেন।

আল্লাহর কসম! বিচার দিবসে আপনাকে গোপন আমলের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়, দুনিয়াতেই আপনি এর প্রভাব দেখতে পাবেন। আর এভাবে আমল করার দীর্ঘদিন পর, যদি আপনি কোনো বিপদে পড়েন, তাহলে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, "হে আল্লাহ! আমি রামাদানের প্রত্যেক রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম শুধুমাত্র তোমার ইবাদাত করার জন্য, এটা তুমি এবং আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি যদি এই কাজ তোমার জন্য এবং কেবল মাত্র তোমার জন্য করে থাকি, তবে আমাকে এই বিপদ থেকে হেফাযত করো।"

বিশ্বাস রাখুন—আল্লাহ্ আপনার এই দু'আ কখনোই ফিরিয়ে দেবেন না।

"সাওম কেবল আমারই জন্য"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, "বনী আদমের সকল আমল তার নিজের জন্য, শুধু সাওম ছাড়া। নিশ্চয় তা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব।"[১২]

এটি সহিহ বুখারিতে বর্ণিত একটি হাদিসে কুদসী। হাদিসে কুদসী হলো সেই সমস্ত হাদিস যার বক্তব্য স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার, কিন্তু রাসূল (ﷺ) নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এসব হাদিসের ভাব আল্লাহ্র এবং ভাষা আল্লাহ্র রাসূলের। কুরআনের সাথে হাদিসে কুদসীর পার্থক্য হলো হাদিসে কুদসীকে সালাতে তিলাওয়াত করা যায় না এবং এ হাদিস পাঠে সাধারণ সাওয়াব পাওয়া যায়, যেমনটা অন্যান্য হাদিস পাঠের জন্য সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু কুরআন পাঠে প্রতি অক্ষরে দশ নেকীর যে বিশেষ পুরস্কার রয়েছে, তা হাদিসে কুদসীর জন্য প্রযোজ্য নয়। আরেকটি ব্যাপার হলো, হাদিসে কুদসীকে অন্যান্য হাদিসের মতোই যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ রয়েছে। মুহাদ্দিসীনরা হাদিসে কুদসীর মধ্যে কিছু কিছুকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন আবার কিছু কিছুকে গ্রহণ করেননি। মোটকথা হাদিসে কুদসীকে কেবল এজন্য বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করা যাবে না যে, এটা হাদিসে কুদসী, বরং উলামাদের তাহকীক অনুসারে তার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ্ এই হাদিসে কেন বললেন—"সাওম কেবল আমারই জন্য?"

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক কাজ তার নিজের জন্য, ব্যতিক্রম কেবল সাওম—সাওম একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য এবং তিনি নিজেই এর পুরস্কার দেবেন। এটা তো আমরা জানি যে, সব নেক কাজই একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়। তাহলে আল্লাহ্ কেন সাওমকে আলাদাভাবে তাঁর নিজের জন্য বলে ঘোষণা করলেন? সাওম কীভাবে অন্যান্য ইবাদাতের থেকে আলাদা?

"সাওম কেবল আমারই জন্য"—আল্লাহ্র এ ঘোষণাকে খুব সাধারণ মনে হলেও লক্ষণীয় যে, আহমাদ ইবনু ইসমাঈল কাজউইনি (رحمه الله) তাঁর *হাজাইর আল কুদস* বইয়ে এই ব্যাপারে উলামাদের পঞ্চান্নটি মতামত তুলে ধরেছেন। আর ইবনু হাজার (رحمه الله) বলেছেন দশটি মতের কথা। সুতরাং বিষয়টি খুব যে সাধারণ, তা কিন্তু নয়।

---

[১২] বুখারি: ১৯০৪, মুসলিম: ২৭৬০

আমরা এখন উলামাদের কিছু বক্তব্যের আলোকে হাদিসটির অর্থ বোঝার চেষ্টা করব, যাতে আরও ভালোভাবে আল্লাহ্‌র এই বক্তব্যের মাহাত্ম্য বুঝতে পারি।

প্রথম মত

আল মাজিরি, আল কুরতুবি, ইবনুল জাওযি রাহিমাহুমুল্লাহসহ উলামাদের অনেকেই বলেছেন যে সাওমকে এই হাদিসে আল্লাহ্ তাআলার কেবল তাঁর নিজের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হচ্ছে, সাওম এমন একটি ইবাদাত যেখানে রিয়া বা লোক দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। সাওমের মাধ্যমে লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না, নিজের পরহেজগারী প্রদর্শন করা যায় না, অন্যদের সামনে নিজেকে বড় আবেদ হিসেবে তুলে ধরা যায় না। সাওম হলো আল্লাহ্ আর বান্দার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক, একটি বিশেষ ইবাদাত, যেটার কথা মানুষ জানতে পর্যন্ত পারে না—যতক্ষণ না অন্যের কাছে নিজের সাওমের কথা বলে দেওয়া হয়। অন্যান্য ইবাদাতের সাথে সাওমের এটা একটা মৌলিক পার্থক্য। আপনি যদি সাদাকা করেন, সালাত আদায় করেন, হজ্জ্ব আদায় করেন, বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল হন, প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় হন, এবং এরকম আরো যত ইবাদাত আছে, সবার ক্ষেত্রেই রিয়ার সুযোগ থেকে যায়; কারণ এগুলো মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য এসব ইবাদাতের ক্ষেত্রে বারবার নিজের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার দরকার পড়ে, যেন লোক দেখানো বা রিয়ার মনোভাব চলে না আসে। এভাবে ইবাদাতকারীর মধ্যে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার লড়াই চলতে থাকে।

সাওমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। একজন মানুষ, যে সাওম রাখেনি কিন্তু সাওম পালনের ভান করছে, তার সাথে কিন্তু যে সত্যিই সাওম রেখেছে তার বাহ্যত কোন পার্থক্য নেই। সবাই ঐ দুজনকেই সাওম পালনকারী বলে ধরে নেবে। প্রকৃত ব্যাপার একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। একজন মানুষ রামাদানের ফরয সাওমের বাইরেও নফল সাওম রাখতে পারে, আবার একজন রামাদানের ফরয সাওম ভাঙতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া তা কেউই জানবে না, কারণ বাইরে থেকে দেখে কে সাওম রেখেছে আর কে রাখেনি—এই পার্থক্য বোঝা যায় না। সাওম একটি গোপন ইবাদাত আর আল্লাহ্ ছাড়া বান্দার এই ইবাদাতের খবর অন্য কেউই জানতে পারে না, যদি না সেই ব্যক্তি নিজেই সেটা প্রকাশ করে দেন।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে। একটা গল্প ছিল এমন, একটা মাংসের দোকানের সামনে ক্রেতারা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ লাইনের পেছন দিক থেকে এক লোক কসাইকে বলে উঠল-"তাড়াতাড়ি কর। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে আর মাগরিবের আগেই এই মাংস রান্না করতে হবে, কারণ আমি সাওম রেখেছি।" ঐ লোকটির পেছনে ছিল আরেক ব্যক্তি যে সম্ভবত তার সামনের জনের চেয়েও নির্বোধ। সে তার সামনের জনকে বলল- "তুমি তাড়াহুড়ো করছ অথচ তুমি

মাত্র একদিন সাওম রেখেছ, আর আমি তিনদিন ধরে সাওম রাখছি তবু আমি সারাদিন লাইনে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কসাইকে তাড়া দিচ্ছি না।" এখানে লক্ষনীয় ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাওমের ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলেন আর অন্য কেউ জানতেও পারেনি। আর তারা যদি বলে না দিত, তাহলে কেউই তাদের সাওমের ব্যাপারে জানতেও পারত না। কাজেই সাওম কেবল আল্লাহ্ আর বান্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, আর সেজন্যই আল্লাহ্ সাওমকে কেবল তাঁর নিজের জন্য বলেছেন এবং নিজের হাতে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। উক্ত হাদিসে কুদসীর ব্যাপারে আলেমরা যত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, এটি তাঁর একটি।

একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'সাওমে কোনো রিয়া নেই।'[১৩]

দুর্বল হওয়ার হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সেটা সহিহ হলে আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়ে যেত। তাই প্রথম মতানুসারে, অন্যান্য ইবাদাতের সাথে সাওমের একটি বড় পার্থক্য হলো, সাওমে লোক দেখানোর সুযোগ নেই বললেই চলে। আর তাছাড়া বৈশিষ্ট্যগতভাবেই সাওম একটি বিশেষ ইবাদাত।

দ্বিতীয় মত

দ্বিতীয় মত হলো, সাওম হচ্ছে আল্লাহ্‌র সবচাইতে প্রিয় ইবাদাতগুলোর একটি। সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

> **"তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালাত।"**[১৪]

এভাবে সাওমের ক্ষেত্রেও ঘোষণা এসেছে। আরেকটি সহিহ হাদিসে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে সাওম পালন করতে বললেন, কারণ সাওমের সমতুল্য কোনো ইবাদাত নেই।[১৫]

সাওমকে শ্রেষ্ট ইবাদাতগুলোর মধ্যে ধরা হয়, কারণ সাওমের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় তথা তাকওয়া সৃষ্টি হয়। সাওম অদ্বিতীয় ইবাদাত এজন্যই যে, এটা অন্তরের গভীরে একদিকে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা, আরেকদিকে তাঁর ভয় সৃষ্ট করে। আল্লাহ্ তাআলা সাওমের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিজেই বলেছেন যে, সাওম তাকওয়া সৃষ্টি করে।

---

[১৩] বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান: ৩৫৯৩

[১৪] মুসনাদে আহমাদ: ২২৩৭৮

[১৫] মুসনাদে আহমাদ: ২২১৪৯

আল্লাহ্ বলেন-

> **"...যাতে তোমরা মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো।" (সূরাহ বাকারা: আয়াত ১৮৩)**

সাওমের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে এই সচেতনতা সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন, এবং আল্লাহ্ আমার সবকিছু জানেন। এজন্যই একজন সাওম পালনকারী স্ত্রীর কাছে (মিলনের জন্য) যায় না, তার সামনে খাবার থাকলেও সে খায় না, কারণ সে জানে কেউ তাকে না দেখলেও আল্লাহ্ তাকে দেখছেন। এভাবে সাওম অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে।

তাহলে হাদিসের ব্যাখ্যায় প্রথম মতানুসারে সাওমে রিয়ার সুযোগ নেই, আর দ্বিতীয় মতানুসারে সাওম আল্লাহর কাছে প্রিয় ইবাদাত।

তৃতীয় মত

তৃতীয় মতটি হচ্ছে, আল্লাহ্ সাওমকে কেবল তাঁর নিজের জন্য বলেছেন—কারণ সাওমের প্রতিদান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। আর এটিই আমাদের আলোচ্য হাদিসটির দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য। প্রত্যেক নেককাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পুরস্কার রয়েছে, ব্যতিক্রম শুধু সাওম। সহিহ মুসলিমের একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক নেককাজের পুরস্কার দশগুণ থেকে সাতশোগুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়, কেবল সাওম ব্যতীত। সাওমের পুরস্কার কেবল আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ একে কতগুণ বর্ধিত করবেন, আর কী পুরস্কার দেবেন, সেই জ্ঞান আল্লাহ্ তাঁর নিজের কাছে রেখেছেন—প্রকাশ করেননি।[১৬]

এই হাদিসে নেক আমলসমূহকে দশ থেকে সাতশোগুণ বর্ধিত করার কথা বলা হয়েছে, আর সাওমের ব্যাপারে বলা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় ইনশাআল্লাহ্ সাওমের প্রতিদান সাতশোগুণের চেয়েও অনেক বেশি দেওয়া হবে। আল্লাহ্র কসম, এই ব্যাপারটা যে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে, সে তার জীবনের বেশিরভাগ সময় রামাদানের মতোই কাটাবে।

যখন এই দুনিয়ার কোনো বাদশাহ বা প্রভাবশালী ব্যক্তি কাউকে পুরস্কৃত করেন, তখন তাঁর পুরস্কার এমন হয় যাতে নিজের মর্যাদা প্রকাশ পায়। তাহলে চিন্তা করুন সকল বাদশাহের বাদশাহ আল্লাহ্ যখন নিজে সাওমের প্রতিদান দেবার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন সেই প্রতিদান কত বেশি হতে পারে!

---

[১৬] মুসলিম: ২৭৬৩

চতুর্থ মত

এ ব্যাপারে চতুর্থ মতটি হলো, সাওমের মাধ্যমে ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে থাকে। দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য মূলত তিন ধরনের হয়।

প্রথমত, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে যাবার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ যেসব কাজ হারাম করেছেন সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন।

তৃতীয় প্রকার হলো, আল্লাহ্‌র বিধান আর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন।

সাধারণভাবে, যে কোনো দুনিয়াবি কাজের জন্য এবং অন্য ইবাদাতের জন্য এই তিন প্রকার ধৈর্যের মধ্যে যেকোনো একটির দরকার হয়। কিন্তু সাওম পালনের ক্ষেত্রে এই তিন ধরনের ধৈর্যই প্রয়োজন হয়।

যেমন প্রথমত, সাওম পালন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই হারাম থেকে বেঁচে থাকার পরীক্ষা দিতে হবে। যথাযথভাবে সাওম পালনের জন্য সাওমের সময়টুকুতে সর্বপ্রকার পানাহার বর্জন করতে হবে, স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করতে হবে। রামাদান মাসে দিনের বেলায় এই কাজগুলো হারাম হয়ে যায়। অথচ এমনিতে এগুলো হালাল কাজ। আর যেগুলো সব সময়ের জন্য হারাম, সেসব তো বর্জন করতে হবেই। যেমন- গীবত, পরচর্চা, গালি দেওয়া, মিথ্যা বলা ইত্যাদি। এগুলো সবসময়ের জন্যই হারাম, আর রামাদানে এগুলোতে লিপ্ত হওয়া তো আরো ভয়ানক গুনাহ। এ কারণেই হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। হয়তো রামাদানের রাতে একটা আড্ডায় বসেছেন কিন্তু সেখানে পরচর্চা চলছে, এ অবস্থায় সেখান থেকে সরে আসার জন্য অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র আদেশ মানার জন্যেও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। আপনি হয়তো কঠিন সময় পার করছেন, আপনার মন চাইছে না সাওম রাখতে, কিন্তু আল্লাহ্ হুকুম করেছেন রাখার জন্য। আপনাকে নিজের নফসের বিরুদ্ধে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তবেই সাওম রাখতে হবে। এটা একটা কঠিন পরীক্ষা, যাতে সাওম পালনকারীকে উত্তীর্ণ হতে হয়। আল্লাহ্ বলেন-

> **"...মানুষের প্রবৃত্তি মন্দের দিকেই বেশি ঝুঁকে থাকে...।" (সূরাহ ইউসুফ: আয়াত ৫৩)**

তবে কেউ যদি সাওম পালন এজন্য ঘৃণা করে যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ, তাহলে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে তো ঘৃণাকারীর ঈমানই চলে যাবে, বরং এই ব্যক্তিকে আবার নতুন করে শাহাদাহ পাঠ করে ঈমান আনতে হবে। তবে আমরা যেটার কথা

বলছি সেখানে বান্দা সাওমকে ঘৃণা করে না, তবে তার অন্তর তাকে আল্লাহ্‌র হুকুম মানতে বাধা দেয়। তখন তাকে নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাওম পালন করতে হয়।

তৃতীয় প্রকার পরীক্ষা হলো, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও নিজের তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার পরীক্ষা। যেমন- প্রচণ্ড গরমের দিন। এই উত্তাপ, এই আবহাওয়া আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। আবার আল্লাহ্‌ই আদেশ করেছেন এমন উত্তপ্ত দিনে সাওম রাখার। কাজেই আপনাকে আল্লাহ্‌র এই ফয়সালা মেনে নিতে হবে। কখনো হয়তো আপনাকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, কখনো আপনি অবসাদ আর ক্লান্তি অনুভব করবেন, পিপাসার্ত হবেন—কিন্তু সেই মুহূর্তেও আল্লাহ্‌র হুকুমের ওপর অটল থাকতে হবে এবং সাওম পালন করে যেতে হবে। প্রচণ্ড গরম, শরীর আর মনের কষ্ট—এ সবকিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়েছে। নিজের তাকদীর আর আল্লাহ্‌র ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা দিয়েই সাওম পালন করতে হবে।

এভাবে সাওমের মধ্যে ধৈর্যের তিনটি প্রকারই একত্রিত হয়। আর এজন্যই সাওমের প্রতিদান অনেক অনেক বেশি, যে কারণে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাওমকে কেবল তাঁর নিজের জন্য বলে উল্লেখ করেছেন আর এর পুরস্কারের ব্যাপারে বলেছেন,

"আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।"

আর আল্লাহ্‌ ছাড়া সাওমের প্রকৃত পুরস্কার কেউই জানে না।

পঞ্চম মত

সাওমকে আল্লাহ্‌ কেবল তাঁরই জন্য বলে ঘোষণা করার পঞ্চম কারণ হিসেবে আলিমরা বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ সাওমকে এক অদ্বিতীয় মর্যাদা দান করেছেন। যেমন- কাবাকে বায়তুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ঘর হিসেবে উল্লেখ করে সম্মানিত করা হয়। আবার পবিত্র কুরআনে সামূদ জাতির উদ্দেশ্যে পাঠানো উটনীটিকে "আল্লাহ্‌র উটনী" বলে সম্মানিত করা হয়েছে-

> **"...এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র উটনী আর এটি তার পান করার জায়গা।" [সূরাহ আশ শামস: আয়াত ১৩]**

যেকোনো বস্তুকে সাধারণভাবে উল্লেখ করার চেয়ে যখন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হয়, তখন এর মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। কোনো মসজিদকে কেবল মসজিদ হিসেবে উল্লেখ করা হলে তার যা সম্মান, আল্লাহ্‌ একে তাঁর ঘর (বায়তুল্লাহ) বলে উল্লেখ করলে এর সম্মান তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি হয়ে যায়। যখন সেই উটনীকে আমরা বলি নাকাতাল্লাহ (আল্লাহ্‌র উটনী), তখন উটনীটির মর্যাদা সাধারণ সব উটনীর চেয়ে বেড়ে যায়। সালাত, যাকাত, সাওম সবই আল্লাহ্‌র ইবাদাত। কিন্তু

সাওমকে আল্লাহ্ কেবল তাঁর জন্য বলে উল্লেখ করায় সাওম একটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ইবাদাতে পরিণত হয়েছে।

সাওম একটি বিশেষ ইবাদাত এবং এর পুরস্কারও অন্যরকম। সাওমের মাধ্যমে একজন বান্দা কেবল তার রবের সন্তুষ্টির জন্য নিজের সমস্ত চাহিদা, খায়েশকে দমন করে রাখে। এই সংযমই সাওমের মূলকথা। একজন সাওম পালনকারী, বন্ধ ঘরে তার স্ত্রীকে পেয়েও স্ত্রীর মাধ্যমে নিজের চাহিদা মেটানো থেকে দূরে থাকে। একজন সাওম পালনকারী প্রচণ্ড গরমের দিনে কর্মস্থল থেকে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফেরে। বাসায় রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা পানি আছে, অনেক রকম খাবার আছে, তবু সে কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে এসব থেকে দূরে থাকে। এভাবে সাওমের মাধ্যমে তাকওয়ার প্রকৃত পরীক্ষা হয়, তাই এর প্রতিদানও অনেক বেশি। এজন্য আল্লাহ্ সাওমকে কেবল তাঁর নিজের জন্য বলেছেন আর এর পুরস্কারের পরিমাণ গোপন রেখেছেন। এভাবে আল্লাহ্ সাওমকে যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, তা অন্য কোনো ইবাদাতকে দেননি। একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা দ্বারা সাওমের বিশেষত্ব অনুভব করতে পারবে।

ষষ্ঠ মত

কিয়ামাতের দিনও সাওমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এ ব্যাপারে ষষ্ঠ মতামত হিসেবে সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ (ﷺ)-এর মতটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন সাওমকে আল্লাহ তাআলা কেবল তাঁর জন্য বলেছেন এর কারণ হলো, সাওম এমন একটি ইবাদাত যার সাওয়াব কিয়ামাতের দিনেও অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিয়ামাতের ময়দানে যেসব মানুষ একে অপরের প্রতি জুলুম করেছে, অন্যের হক নষ্ট করেছে, তাদের থেকে সাওয়াব নিয়ে নেওয়া হবে। দুনিয়াতে একজন মানুষ আরেকজনের হক নষ্ট করে থাকলে সেদিন হক নষ্টকারী ব্যক্তির আমলনামা থেকে নেকী ছিনিয়ে নিয়ে যার হক নষ্ট করেছে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। সব ধরনের নেক আমলের সাওয়াবই নিয়ে নেওয়া হবে, একমাত্র ব্যতিক্রম হবে সাওম।

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই সবাইকে যার যার হিসেব পূরণ করতে হবে, আর এই হিসেব টাকা দিয়ে পূরণ হবার নয়। যদি টাকা দিয়ে এই হিসাব থেকে পার পাওয়া যেত, তবে সেটা অনেক সহজ হতো। কিন্তু ঐদিন যার যার নেক কাজ দিয়েই মজলুমের পাওনা শোধ করতে হবে। যদি আমি কারো হক নষ্ট করে থাকি, সেদিন সে আমার নেক আমলের অংশ নিয়ে যাবে। আবার অন্য কেউ আমার হক নষ্ট করলে আমি তার আমল নিয়ে নেব। আল্লাহ্ আমাদের এমন পরিস্থিতি থেকে হেফাযত করুন। সেই কঠিন সময়ে হয়তো এমন হবে, কারো অনেক সালাত আছে, যাকাত আছে, সাদাকা আছে, হজ্জ-উমরাহ আছে, কিন্তু সেদিন এসমস্ত নেকী তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যার

হক সে নষ্ট করেছে, তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি নেক আমল এভাবে দিতে দিতে শেষ হয়ে যায়, তবে মজলুমের গুনাহ নিয়ে হক নষ্টকারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম সাওম। সাওমের নেকী আমলকারীর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে না। সুফিয়ান আল উয়ায়নাহর মতে এটার কারণ হলো—আল্লাহ্‌ সাওমকে তাঁর নিজের বলে অভিহিত করেছেন, তাই সাওমের সাওয়াব নিয়ে নেওয়া হবে না।

সপ্তম মত

মুশরিকরা সাওমের ক্ষেত্রে শির্ক করেনি।

উলামাদের সর্বশেষ মতটি হলো—সাওমের বিশেষত্ব এখানে যে, মুশরিকরাও এই ইবাদাতটির ব্যাপারে কখনো শির্ক করেনি। যখনই কোনো মানুষ, হোক সে মুসলিম, কিংবা কাফির মুশরিক, সাওম পালন করেছে, তা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই করেছে। এজন্য আপনি মুশরিকদের ব্যাপারে শুনে থাকবেন তারা তাদের দেবদেবীর মূর্তির উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছে, মূর্তির উদ্দেশ্যে দান করেছে, মূর্তির নামে শপথ করেছে, মূর্তির উদ্দেশ্যে রুকূ-সিজদাহ করেছে, মূর্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছে, মূর্তির প্রতি ভয় করেছে—কিন্তু কখনো মূর্তির উদ্দেশ্যে সাওম পালনের কথা শুনবেন না। এতে বোঝা যায়, সাওম হলো সেই বিশেষ ইবাদাত যার মধ্যে শির্ক কখনো প্রবেশ করতে পারেনি।

আল্লাহ্‌ আমাদের সাওমের গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন

আল্লাহ্‌ সাওমকে এবং সাওমের প্রতিদানকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে আমাদেরকে সাওমের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্‌ এজন্য এভাবে বলেছেন, যেন বান্দার অন্তরের মধ্যে সাওমের তাৎপর্য গেঁথে যায়। আর বান্দা যেন খুব গুরুত্ব দিয়ে ইবাদাতটি পালন করে। আপনি যে দিনগুলোতে সাওম পালন করবেন, সে দিনগুলো অন্যান্য দিনের মতো হওয়া উচিত নয়। এ দিনগুলো বিশেষ কিছু—বিশেষত রামাদান মাসে। তাকওয়াকে যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা হয়, তবে সাওম হচ্ছে তাতে পৌঁছানোর একটি স্কুল। আর সেজন্যই এর গুরুত্ব সীমাহীন। কল্পনা করুন শেষ বিচারের দিনের কথা, সেদিন আপনার সবচেয়ে আপনজন, আপনার বাবা-মা আপনার কোনো কাজে আসবে না। কোনো মানুষ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না, সেদিনও আপনার এই সাওম আপনার কাজে আসবে। সাওম সেদিন ঢাল হয়ে আপনাকে রক্ষা করবে। এই ব্যাপারগুলো যদি আমরা মুসলিমরা গভীরভাবে চিন্তা করতাম, উপলব্ধি করতাম, এবং সাওমের গুরুত্ব আর এর অপরিসীম প্রতিদানের কথা স্মরণ করতে পারতাম—তাহলে আমরা এই মাসে সাওমকে ফরয করে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদায় লুটিয়ে পড়তাম।

রামাদানে নারীরা

নারীদেরকে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যেমন- হায়েজের সমস্যা। রামাদানে অন্য সবাই যেখানে নিয়মিত ইবাদাত করতে থাকে, সেখানে এই বরকতময় মাসেও নির্দিষ্ট কিছু দিন সাওম পালন করতে না পারায় আমাদের অধিকাংশ বোন এক ধরনের চাপা কষ্ট অনুভব করেন। বিষয়টা যদিও বোনদের সাথেই বেশি সম্পর্কিত, তবে ভাইদেরও এসব ব্যাপার জানা থাকা উচিত। এই মুহূর্তে তাঁদের অনেকেরই স্ত্রী না থাকলেও মা, বোন, খালা, ফুফু আছেন এবং ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ তাঁদের স্ত্রী-কন্যাও থাকবে। কাজেই এ বিষয়ে তাঁদেরও জানা থাকা উচিত।

এই ব্যাপারে আমাদের বোনদের মধ্যে যেন কখনোই চাপা কষ্ট, হতাশা এবং দুঃখ না আসে। অন্যরা ইবাদাতের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে, এমনটাও ভাবার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, যিনি আপনাকে সালাত ও সাওম পালন করার আদেশ দিয়েছেন, তিনিই আপনাকে এই সময়ে সালাত আদায় না করতে ও সাওম পালন না করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং আপনি আল্লাহর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে কার্যত ইবাদাতের মধ্যেই আছেন।

ইবাদাত করতে না পারার মনোকষ্ট আমাদের সকল বোনেরই আছে এবং অনেক বোন তা দুঃখের সাথে প্রকাশ করেন। আর তাঁদেরও আগে এই একই অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন আমাদের মা আইশা (ﷺ)। আল্লাহ যেন আমাদের বোনদেরকে মা আইশার পাশে সুউচ্চ প্রাসাদ দান করেন। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) একবার হজ্জে যাবার সময় মক্কার কাছাকাছি অবস্থিত সারিফ নামক জায়গায় থামলেন। এসময় তিনি আইশা (ﷺ)-কে কাঁদতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?" আইশা দুঃখের সাথে বললেন, "আমি যদি এ বছর হজ্জ না করতাম!" তিনি কীসের কথা বলছেন তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাথে সাথেই বুঝে গেলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সম্ভবত তোমার হায়েজ শুরু হয়েছে।" আইশা (ﷺ) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে বললেন, "এই ব্যাপারটি আল্লাহ তাআলা আদমের সকল কন্যার জন্য নির্ধারণ করেছেন।" সান্ত্বনা দেবার পর তিনি এই অবস্থায় করণীয় শিখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "হাজীরা যা করে, তুমিও তা করবে। তবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত কাবার চারদিকে তাওয়াফ করবে না।" হজ্জের বরকতময় সময়ে তাওয়াফ করতে না পারায় মা আইশা (ﷺ) অনেক কষ্ট

পেয়েছিলেন, একইভাবে রামাদানেও কিছু দিন ইবাদাত করতে অপারগ আমাদের বোনেরাও অত্যন্ত চাপা কষ্ট আর বেদনা অনুভব করেন।

বৈধ কারণে ইবাদাতে অপারগ ব্যক্তির পুরস্কার

বোনদের জন্য আনন্দের সংবাদ এই যে, যদি কোনো বোন আন্তরিকভাবে সালাত-সাওমের জন্য নিয়ত করে, হোক সেটা ফরয বা নফল, কিন্তু কেবলমাত্র হায়েজের কারণে সেই বোন ইবাদাত করতে পারছে না। এক্ষেত্রে ইবাদাত করলে যে সাওয়াব পাওয়া যেত, ইবাদাত না করেও ঠিক একই রকম সাওয়াব পাওয়া যাবে—সাওয়াবে এতটুকু কম হবে না।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে তেমন সাওয়াবই পাবে, যেমনটা সে সুস্থ অবস্থায় বা সফরে না থাকা অবস্থায় পেতো।"[১৭]

সে একটি বৈধ কারণে ইবাদাত করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সেজন্য সে প্রতিদান পেয়ে যাবে। আর যতবার এরকম বৈধ কারণে ইবাদাত করতে অপারগ হবে, ততবার প্রতিদান পাবে। নারীদের হায়েজের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। হাদিসটি থেকে বোঝা যায় যে—কোনো নারী নিয়ত থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র হায়েজের জন্য সাওম পালন করতে না পারলেও সে ঐ পরিমাণ সাওয়াবই পাবে—যেমনটা সে বাস্তবে সাওম পালন করলে পেত। হায়েজ আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল নারীর জন্য নির্ধারিত, এখানে বোনদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কাজেই তারা ইবাদাত থেকে বঞ্চিত হলেও ছুটে যাওয়া আমলের পুরস্কার পেয়ে যাবে। কারণ এটা তাদের অনিচ্ছায় হয়েছে। হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ অসুস্থ হলে তার ছুটে যাওয়া ইবাদাতের প্রতিদান পেয়ে যাবে, যেহেতু তারা অসুস্থ। ঋতুবতী নারীর ব্যাপারটিও অনেকটা একই। দুটির মধ্যে মিল হলো—তারা ইবাদাত করতে অপারগ। আর তাদের এই অপারগতা ইচ্ছাকৃত নয়, বাধ্য হয়ে। ইবনু হাজার (রাহি.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো আমল এমনিতে করত, তবে তার সাধ্যের অতীত পরিস্থিতির কারণে তা করতে পারেনি, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে হাদিসটি প্রযোজ্য।"

বেশ কিছু হাদিসেই উল্লেখিত হয়েছে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না থাকায় কোনো ব্যক্তি ইবাদাত করতে না পারলেও এর সাওয়াব পেয়ে যাবে। এমনকি জিহাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং মদীনায় কয়েকজন সাহাবিকে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সাথে থাকা সাহাবিদের বললেন, "তোমরা এমন এক পা-ও ফেলোনি এবং এমন কোনো উপত্যকাও অতিক্রম করোনি, যার

[১৭] বুখারি: ২৯৯৬

সাওয়াব আমাদের সাথে যোগ না দেওয়া ব্যক্তিরা পাবে না। (অর্থাৎ তারা আমাদের সাথে যোগ না দিলেও তোমাদের মতোই সাওয়াব পাবে।) কারণ, তারা তো বৈধ কারণে আসতে পারেনি।”

মোটকথা, দুঃখ পাবেন না, হতাশ হবেন না, যন্ত্রণা বোধ করবেন না। যেসব বোন ইবাদাত করতে পারছেন না, তাঁরা মূলত ইবাদাত না করেও ইবাদাতের মধ্যেই আছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলাই তাঁদেরকে ইবাদাত না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আন্তরিকভাবে নিয়ত করে থাকলে তাঁরা প্রতিদান পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

কোনো নারী কি হায়েজ বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে পিল ব্যবহার করতে পারবেন?

সহজ উত্তর হলো, হ্যাঁ। এই ধরনের বিষয়গুলো শরীয়াহর সাধারণ বিধানের আওতায় পড়ে। শরীয়াহর বিধান হলো—কোনোকিছু অকাট্যভাবে হারাম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেটা হালাল। তবে ইমাম মালিক (رحمه الله) এটিকে হারাম মনে করতেন। তিনি এর কারণও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতেন এটি ক্ষতিকর। পিল ব্যবহারে যদি কারো ক্ষতি হয়, তবে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল-মুগনীতে তিনি উল্লেখ করেছেন, ইমাম আহমাদ (رحمه الله) এটির অনুমোদন দিয়েছেন। একইভাবে আশ-শাফি'ঈ (رحمه الله) এর অনুমোদন দিয়েছেন। এটি অনুমোদিত—যতক্ষণ না তা ক্ষতির কারণ হয়। ক্ষতির ব্যাপারটি চলে আসলেই তখন আর এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আপনাকে তাই ব্যবহারের আগে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে—এটি আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।

আমার মনে পড়ে, যখন আমার বয়স দশ কিংবা এগারো বছর, একবার আমি মদীনায় আমার বাবার সাথে তাঁর একটি হালাকায় বসেছিলাম। শাইখ আতিয়্যাহ সালিম (رحمه الله) মিসওয়াকের উপকার সম্পর্কে এমন একটি হাদিস উল্লেখ করেন—যা আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। পরে আমি মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাকে পড়েছি, আমর বলেছেন, ইবনু উমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোনো নারী হায়েজ বিলম্বিত করার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে পারবে কি না। ইবনু উমার বললেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। আর তিনি মিসওয়াকের রস ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। কারণ সেই সময় এটাই সহজলভ্য ছিল। সেসময় তাঁরা আরাক গাছের মিসওয়াক নিয়ে মিসওয়াকটি কেটে ছোট ছোট টুকরা করতেন, একটি পাত্রে প্রায় দশ মিনিটের মতো ফুটাতেন। এরপর হায়েজ শুরু হবার সম্ভাব্য তারিখের আগে থেকে দিনে দুই-তিনবার করে এটি পান করতেন। আমরা এখন যে মিসওয়াক পাই, তা এই কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কারণ, এগুলো আসলে মেয়াদোত্তীর্ণ মিসওয়াক। মদীনায় যে মিসওয়াকগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো বিক্রির অল্পদিন আগে গাছ থেকে কাটা হয়। কিছু মিসওয়াকের কড়া প্রাকৃতিক স্বাদ আর পিপারমিন্টের মতো গন্ধ থাকে।

কখনও কখনও এটি এত কড়া ও ঝাঁঝালো হয় যে, কয়েক মিনিটও মিসওয়াকটি মুখে রাখা যায় না। প্রাকৃতিকভাবেই ঐ মিসওয়াকগুলো এরকম, বাইরে থেকে এগুলোতে কিছুই মেশানো হয় না।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে রাখা ভালো, সাওম পালন অবস্থায় টুথপেস্ট ব্যবহার করা কিন্তু মাকরূহ না। বস্তুত এটি কিয়াসের ভিত্তিতে জায়েয। দিনের বেলা, এমনকি লম্বা দিনে (অর্থাৎ যখন সূর্যাস্ত হয় দেরিতে) সাওম পালনরত অবস্থায় মিসওয়াক ব্যবহার করার অনুমোদন আছে। আর মিসওয়াকে কখনও কখনও টুথপেস্টের চেয়েও কড়া স্বাদ থাকে। তাই টুথপেস্ট মাকরূহ না হওয়ার পেছনে এটি একটি যৌক্তিক কারণ।

এই দিনগুলোতে একজন নারী কী করতে পারে?

এই দিনগুলোতে সালাত আদায়, সাওম পালন এবং (উমরায় গিয়ে থাকলে) তাওয়াফ করা ব্যতীত বাকি সব ইবাদাতই করা যাবে। পরে সাওমের কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু সালাতের কাযা করতে হবে না। সমস্যা হলো, কিছু বোন ভাবেন যে, তারা সাওম পালন করতে পারছেন না বিধায় রামাদানে তাদের আর কিছুই করার নেই। তারা টেলিভিশনের সামনে বসে থাকেন এবং এই পবিত্র ও বরকতময় সময়গুলোকে অবহেলা করেন। হায়েজের জন্য আপনি সাওম পালন করতে পারবেন না, সালাত আদায় করতে পারবেন না, কিন্তু তারপরও আপনি রামাদানের পবিত্র দিনগুলো পাচ্ছেন। অন্য অনেক ইবাদাত করার সুযোগ আপনার সামনে আছে। যিকির করুন, দু'আ করুন, কুরআন তিলাওয়াত করুন।

একজন নারী কি ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে?

কুরআন স্পর্শ না করে মুখস্থ তিলাওয়াত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মতটি ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) তাঁর ফতওয়ার ২১তম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিক, আশ-শাওকানি এবং আরও অনেকে একই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, মুখস্থ পড়া বা কুরআন স্পর্শ না করে পড়া বৈধ। এ ধরনের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হালাল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। আর আলোচ্য বিষয়ে হারাম সাব্যস্তকারী কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। এমন কোনো অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই—যা দ্বারা ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত করাকে হারাম বলা যায়। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, আশ-শাওকানি ও ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন—একজন নারী কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারে। কারণ এ ব্যাপারে কোনো অকাট্য দলীল নেই

যে—হায়েজ অবস্থায় নারীদের জন্য কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত হারাম। "নারীরা হায়েজ অবস্থায় কুরআন পড়তে পারবে না" এমন একটি কথাকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এটি আছে ইবনু মাজাহ ও তিরমিযিতে। কিন্তু হাদিসটি এতই দুর্বল যে, একে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) প্রতি সম্পর্কিত করা যায় না।[১৮]

কেউ কেউ বড় অপবিত্রতা (জুনুব) অবস্থায় থাকা পুরুষের সাথে নারীকে তুলনা করে কিয়াস করেছেন। একটি সহিহ ও স্পষ্ট হাদিসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুনুব অবস্থায় তিলাওয়াত করতেন না। যা হোক, বড় অপবিত্রতায় থাকা পুরুষের সাথে ঋতুবতী নারীকে তুলনা করে কিয়াস করতে চাইলে অবস্থা দুটিকে পুরোপুরি একই হতে হবে। জুনুবী (বড় অপবিত্রতা) অবস্থায় থাকাটা পুরুষের জন্য ইচ্ছাধীন, এ অবস্থায় সে বাধ্য হয়ে থাকে না। সে অলস বসে না থেকে উঠে গিয়ে গোসল করে ফেললেই পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু নারীদের ব্যাপারটা তেমন নয়। তাকে পবিত্র হবার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে হয়। কাজেই দুই ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকায় দুটিকে তুলনা করা যাবে না, এবং এরপর কিয়াস করার সুযোগ নেই।

হায়েজ সকল নারীর জীবনে ঘটে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগেও তা ছিল, এমনকি এর আগেও ছিল। তখন অনেক মুসলিম মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন, যাঁরা আমাদেরকে রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের এবং তাঁদের নিজেদের জীবনের সকল বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার কি মনে হয়, ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত সত্যিই হারাম হয়ে থাকলে একে হারাম সাব্যস্তকারী অন্তত একটিও সর্বজনসম্মত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস থাকত না?

ঋতুবতী নারী কি কুরআন স্পর্শ করে পড়তে পারে?

এটা জানতে হলে যে মূল বিষয়টির দিকে ফিরে যেতে হবে তা হলো—অপবিত্র অবস্থায় কি কুরআন স্পর্শ করা যায়? বেশিরভাগ আলিমের মত অনুয়ায়ী, কুরআন স্পর্শ করার আগে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। অল্পসংখ্যক আলিম বলেছেন অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বৈধ। তাঁদের মধ্যে আছেন ইবনু আব্বাস, আশ-শা'বি, আয যাহহাক, আল হাকম ইবনু উতাইবাহ, হাম্মাদ ইবনু আবি সুলায়মান, দাউদ আয যাহিরি এবং আয যাহিরিয়্যাহ। যা হোক, ফয়সালা ভোটের ভিত্তিতে হবে না, আমরা প্রমাণের ভিত্তিতে এগোবো। কারণ এটা গণতন্ত্র নয়।

[১৮] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিইয়াহ (ﷺ) বলেন, 'হাদিসবিশাদরদদের ঐক্যমতে এই হাদিসটি দুর্বল।' (মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২১/৪৬০) আর এধরনের সর্বসম্মত দুর্বল হাদিস দিয়ে কোনো বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় না।—শর'ঈ সম্পাদক

মদীনায় শরীয়াহ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় আমাকে প্রত্যেকটি ক্লাসের ওপর একটি করে সংক্ষিপ্ত নোট লিখতে হতো। আমার মনে হয় আমার নোটটি প্রায় ১৫ পৃষ্ঠার মতো অথবা কাছাকাছি ছিল। ফিকহ ক্লাসের জন্য আমার শিক্ষক আমাকে বললেন, "তোমার বিষয়বস্তু হলো এই, তোমাকে এর ওপর লিখতে হবে।" এটি ছিল নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে। ইসলামি জ্ঞান নিয়ে আপনি যতই গবেষণা চালিয়ে যাবেন, সময়ের সাথে সাথে আপনার জ্ঞান ততই বাড়তে থাকবে। যতই সময় যাবে, ততই আপনি দেখবেন, আগে যে হাদিস আপনি পাননি, যে মতটির কথা আপনি আগে জানতেন না অথবা মনোযোগ দেননি, সেসব খুঁজে পাচ্ছেন। আপনি দেখবেন, আপনি যে হাদিসটিকে সহিহ ভেবেছিলেন তা দুর্বল, কিংবা উল্টোটা। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি ঐ সিদ্ধান্তের ওপরই স্থির আছি, যা আমি এই বিষয়ে আমার থিসিসের শেষ বাক্যে লেখেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, উপসংহার হলো, এ প্রসঙ্গে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য বিশুদ্ধ নয়, আর যা কিছু বিশুদ্ধ তা স্পষ্ট নয়।

উদাহরণস্বরূপ, অনেক অনির্ভরযোগ্য হাদিস আছে, কিন্তু একটা প্রমাণ অনেকেই ব্যবহার করে, তা হলো কুরআনের একটি আয়াত। আল্লাহ বলেন,

> **"এমন এক কিতাব যা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না।" (সূরাহ আল ওয়াকিয়াহ: আয়াত ৭৯)**

ইবনু আব্বাস (ﷺ) বলেন, এটি হলো আসমানে তথা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত কিতাব। এখানে কুরআনের কথাও বলা হচ্ছে না। এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হচ্ছে এবং লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত ফলকগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। আমাদেরকে কিংবা আমার কাছে থাকা কুরআনকে বোঝানো হচ্ছে না।

আরবিতে মুত্বাহহার (مطهر) শব্দটি সাধারণ 'পবিত্র' বোঝাতে ব্যবহার করা হয় না, বরং 'সন্দেহাতীতভাবে ভুলের ঊর্ধ্বে' বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। আপনার-আমার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা হবে না। যদিও আমরা ওযু করার সময় 'পবিত্র' বোঝাতে কাছাকাছি শব্দ 'মুতাত্বাহহির' (متطهر) ব্যবহার করি, মুত্বাহহার নয়। মুত্বাহহার ব্যবহার করা হয় তাঁদের জন্য যারা কখনো ভুল করেন না, যেমন-ফেরেশতাগণ।

উপরন্তু, প্রথমে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছিল, যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আইশাকে বললেন, নারীরা যা করে তা-ই করতে, কেবল তাওয়াফ ও সালাত ছাড়া। হজ্জের সময় মানুষ কুরআন পড়ে এবং স্পর্শ করে। এবং তারা এটা প্রতিদিনই করে থাকে। হজ্জে তো অবশ্যই আরও বেশি করে থাকে। তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আইশা (ﷺ)-কে কেন কুরআন স্পর্শ করতে ও পড়তে নিষেধ করলেন না?

আল-হাকিম, আহমাদ, মালিক ও অন্যান্য বর্ণনায় একটি বিশুদ্ধ হাদিস আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।"

কিন্তু এখানে ত্বাহির শব্দটি দ্বারা “কুফর থেকে পবিত্র” এমনও বোঝানো হতে পারে। “ওযুর মাধ্যমে পবিত্র” বোঝানো না-ও হতে পারে।

আল্লাহ বলেন,

“নিশ্চয়ই মুশরিক মাত্রই অপবিত্র।” (সূরাহ আত-তাওবাহ: আয়াত ২৮)

এ থেকে বোঝা যায়, মুমিনরা পবিত্র। কাজেই ত্বাহির শব্দ দ্বারা ইসলামের পবিত্রতা বোঝানো হতে পারে।

অন্য একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।”

সুতরাং এটি কুফরের বিরুদ্ধে ইসলামের পবিত্রতা হতে পারে। হাদিসটি ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনু হিজামের প্রতি লেখা একটি চিঠিতে। তখন আমর ইবনু হিজাম থাকতেন নাজরানে, খ্রিস্টানদের সাথে। কাজেই এটা হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন যেন তিনি কাফিরদেরকে কুরআনের পৃষ্ঠা স্পর্শ করতে না দেন।

সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করে এমন কোনো স্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস নেই। আর যেসব বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, তাদের অন্য অর্থও আছে।[১৯]

শ্রদ্ধা সংক্রান্ত ব্যাপার

হালাল-হারামের বিষয়টিকে বাদ দিলেও এখানে শ্রদ্ধার একটি ব্যাপার আছে। কুরআন অর্থাৎ আল্লাহর বাণীর প্রতি সম্মান বজায় রাখা প্রয়োজন। সেটি ভিন্ন কথা। যদিও আমি বিশ্বাস করি কুরআন স্পর্শ করতে চাইলে পবিত্র হতে হবে এমন কোনো স্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস নেই, তবুও আমার মনে পড়ে না ছোটবেলা থেকে কখনও জেনেশুনে ওযুবিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করেছি। এটি যদি আবশ্যক না-ও হয়, তবুও এখানে শ্রদ্ধার বিষয়টি জড়িত। আল্লাহ বলেন,

---

[১৯] অধিকাংশ আলিম বিশেষ করে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামদের মত হলো, ওযুবিহীন অবস্থায় কিংবা নারীদের হায়েজ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে কোনো প্রতিবন্ধক থাকলে যেমন-কাপড়, কাঠ, ব্যাগ ইত্যাদি, তবে এতে সমস্যা নেই। বিস্তারিত isalmqa.info-ফাতওয়া নং ২৫৬৪, ১০৬৭২। আর ওযুবিহীন অবস্থায় মোবাইল বা প্যাড থেকে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে, এটা মুসহাফের বিধানের আওতায় পড়বে না। বিস্তারিত islaqa.info ফাতওয়া নং ১০৬৯৬১। তবে হায়েজ অবস্থায় নারীদের জন্য মুখস্থ কিংবা মোবাইলে দেখেও তিলাওয়াত করা যাবে কি না এই প্রশ্নেও আলিমরা মতপার্থক্য করেছেন। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, ইবনু তাইমিয়্যাহ মত দিয়েছেন, মুখস্থ কিংবা স্পর্শ না করে তিলাওয়াত করা যাবে। হানাফি মাযহাব মতে হায়েজ অবস্থায় মুখস্তও তিলাওয়াত করা যাবে না—সাজিদ ইসলাম

“এবং যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, এটি নিশ্চয়ই অন্তরের তাকওয়ার কারণে।” (সূরাহ আল- হজ্জ: আয়াত ৩২)

সালাফদের কেউ কেউ, যেমন ইবনু উমার, কুরআন স্পর্শ করার পূর্বে উযু করতেন। অনেকে শ্রদ্ধার কারণে ওযু করতেন, মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন, কিবলার দিকে মুখ করে বিনীতভাবে বসতেন, সম্মানের সাথে কুরআন পড়তেন। কারণ এটি তো আল্লাহর বাণী!

কোনো নারী চাইলে এই পুরো মতভেদটা এড়িয়ে যেতে পারেন এবং মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক দিয়ে রেখে (স্পর্শ না করেই) কুরআন পড়তে পারেন। এটি বৈধ। কিংবা তিনি চাইলে শেষ উপায় হিসেবে আইফোন, আইপ্যাড বা কম্পিউটার থেকে পড়তে পারেন। কেননা এগুলো মুসহাফ হিসেবে বিবেচিত হয় না, এবং এক্ষেত্রে আগের উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য নয়। কাজেই ঐ সকল ডিভাইস থেকে পড়া অবশ্যই বৈধ, কারণ সেক্ষেত্রে মুসহাফের বিধান খাটে না।

"সুশীতল বাতাসের পরশে রোমাঞ্চিত হও"

"আমরা যে দিনগুলো অতিক্রম করছি, তার মধ্যে এমন কোনো দিন নেই যা বলে না— 'হে আদম সন্তান! আমি আজকে তোমার কাছে এসেছি কিন্তু বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না। তাই তুমি সতর্কতার সাথে ঠিক কর আজ কী করবে। যখন এই দিন শেষ হয়ে যাবে, তখন তাকে গুটিয়ে নেওয়া হয় এবং এতে সিল মেরে দেওয়া হয়। কিয়ামাত দিবসে মহান আল্লাহ্ কতৃক এই সিল উঠিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত এটি সিল মারা অবস্থাতাতেই থাকবে।"

ইবনু আবিদ দুনিয়া (ﷺ) মালিক ইবনু দিনার (ﷺ) এবং মুজাহিদ (ﷺ)-এর সূত্রে এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, তবে মালিক ইবনু দিনার (ﷺ) এবং মুজাহিদ (ﷺ) ছাড়া আরও অনেকেই এই উক্তি উল্লেখ করেছেন। আর সামান্য পরিবর্তিতরূপে হাসান আল-বাসরি (ﷺ), আবু বকর আল-মুযানি (ﷺ) সহ সালাফদের আরও অনেকেই এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায় হাসান আল-বাসরি (ﷺ) এই দিনকে মেহমানদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই দিন আমাদেরকে ডেকে বলে,

> "হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের মেহমান, আর মেহমানরা হয় তোমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অথবা দুর্নাম করে বিদায় নেয়। হয় তারা তোমাকে অতিথিপরায়ণ বলে অথবা নীচু মানসিকতার ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে। তারা তোমার সম্পর্কে হয় ভালো বলে না হয় খারাপ কিছু প্রচার করে। দিন আর রাতও ঠিক এরকমই, মেহমানের মতো। তারা হয় তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে আর না হয় তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।"

দিন আর রাত হলো দুটি গুপ্ত ধনভাণ্ডারের মতো। তাই আমাদের উচিত প্রতিটি দিন ও রাতকে অতি সতর্কতার সাথে কাজে লাগানো। গুপ্তধন পেলে তার প্রতি আমরা যেমন যত্নশীল হতাম, এই দিন আর রাতের বেলায়ও আমাদের তেমনটাই যত্নশীল হওয়া উচিত। কারণ আমাদের অস্তিত্ব অল্প কিছু সময়ের জন্য, আমরা আমাদের সময়গুলোকে যেভাবে ব্যয় করব, আমাদের দিন ও রাতগুলো ঠিক সেভাবেই অতিবাহিত হবে। সময়ই আমাদের প্রধান সম্পদ, আমাদের বিনিয়োগ।

আমাদের জীবন একটি রাস্তার মতো, যা আমাদেরকে হয় জান্নাতে আর না হয় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। দিন আর রাত সবই হচ্ছে ইবাদাতের জন্য, তবে দিনের বেলায় আমরা জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকি। তাই রাতের সময়টুকু আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একবার আমি শাইখ ইবনু ক্বা'দের সাথে হজ্জ করতে গিয়েছিলাম। আল্লাহ জান্নাতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। তিনি আমাদের সময়ের একজন হকপন্থী ইমাম—যিনি সত্যের প্রচার করতেন। অনেক বছর আগে তিনি ইফতার (সরকারি ফাতওয়া বিভাগ) উলামাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন হয়তো আমাদের অনেকের জন্মই হয়নি। একবার তিনি কিছু ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন এবং তার পরেই ঐ উলামা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তবে নির্ভরযোগ্য সত্য হলো—তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

অনেকেই বলে থাকে হকপন্থী আলিলরা কোথায়? আলহামদুলিল্লাহ্, আসলে অবস্থা এখন এতটাই খারাপ যে, হকপন্থী আলিম থাকলেও আমরা তাঁদেরকে সহজে খুঁজে পাই না। কারণ আমরা তাঁদেরকে ভুল জায়গায় খুঁজে বেড়াই। কেননা তাঁদেরকে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো এড়িয়ে চলে। কিন্তু সরকার তাঁদেরকে ঠিকই খুঁজে বের করে, ধরে নিয়ে জেলে বন্দী করে রাখে। হকপন্থী আলিমদেরকে এভাবে অত্যাচারের মাধ্যমে দমনের পাশাপাশি সরকার অন্যান্য চাটুকার আলিমদের জনগণের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। দুঃখের ব্যাপার হলো, আজ মুসলিম উম্মাহ ভণ্ড আলিমদের ভিড়ে হকপন্থী আলিমদের খুঁজে বের করার যে মানদণ্ড ছিল, তা হারিয়ে ফেলেছে।

ইবনু ক্বা'দ (ﷺ) যেসব ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল টেলিভিশন। সত্তর এবং আশির দশকে সৌদিতে টেলিভিশন ছিল যাবতীয় নষ্টামির মূল। এটি হারামাইনের পবিত্র ভূমিকে দূষিত করছিল।

১৯৭৯ সালে আমরা যখন মদীনায় ছিলাম, তখনকার একটি ঘটনা আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। আলহামদুল্লিলাহ, প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমরা হারাম থেকে বের হচ্ছিলাম। সে সময় গেটের ঠিক বাইরেই বাজার ছিল, এখনকার মতো ছিল না। আমরা দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটছিলাম। সেখানে টেলিভিশনের দোকানও ছিল আর দোকানভর্তি টেলিভিশনগুলো দিব্যি চলছিল। সমগ্র দেশে তখন কেবলমাত্র একটা চ্যানেলই ছিল এবং এটি ছিল সরকারী চ্যানেল। আমার মনে পড়ে, একদিন আমরা হারামের বাইরে হাঁটছিলাম। তখন দোকানের টেলিভিশনে Donny Osmond এর অনুষ্ঠান চলছিল। জুহাইমানের বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে মক্কায় যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, তার জন্য এই টেলিভিশনও দায়ী ছিল। তাই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তখনকার বাদশাহ আলিমদের সাথে একটি মিটিং ডাকলেন। কারণ লোকজন আলিমদের মেনে চলত এবং তাঁদের কথা শুনত। মিটিং শুরু হলে বাদশাহ বললেন,

"আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা টেলিভিশনের সমস্যাকে মিটিয়ে ফেলেছি এবং আলিমদের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছি আর টেলিভিশন হবে এখন দাওয়াহ কেন্দ্রিক।" বাদশাহর কথার উত্তরে কেউই কিছু বলছিল না, সবাই নীরব ছিল। এমন সময়েই শাইখ ইবনু ক্বা'দ নীরবতা ভেঙে হকের পক্ষে দাঁড়ালেন, ব্যাপারটা এমন যে ঠিক যেন একটা সিংহ গর্জন করে উঠল। আল্লাহ জান্নাতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। ইবনু ক্বা'দ দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "এটি সত্য নয়।" ফলে সাথে সাথেই সেখানে বিবাদ শুরু হয়ে গেল।

আমি ইবনু ক্বা'দের সাথে হজ্জ করার সময়ে একদিন তাঁর পাশে বসেছিলাম। তখন একজন লোক তাঁর নিকট আসলো এবং জিজ্ঞেস করল, "শাইখ, টেলিভিশন দেখা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?" লোকটি কোনো তালিবুল ইলম ছিল না, একজন সাধারণ লোক ছিল। তাই শাইখ তাকে বিস্তারিত না বলে সংক্ষেপে এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যাতে লোকটি সহজে বুঝতে সক্ষম হয়। ইবনু ক্বা'দ বলেছিলেন, "এমন কেউ কি আছে যে জানে তার প্রতিটি হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে এবং সে এটাও জানে তার হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস সবই নির্দিষ্ট, কিন্তু তার পরেও টেলিভিশনের মতো নোংরা জিনিসে সময় নষ্ট করে?"

সাধারণ দিনগুলিও একজন মুমিনের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। রামাদানে যখন বিভিন্ন নেক আমলগুলোর সাওয়াব কয়েকগুণ থেকে কয়েকশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়, তখন এই দিনগুলো কতই না মূল্যবান হয়! তাহলে কী করে আমরা এই দিনগুলো হেলায় ফেলায় পার করে দিতে পারি!

আল্লাহ কিছু মাসকে অন্য মাসের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আশহুর আল-হুরুমের চার মাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আল্লাহ বলেছেন,

> **"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে বিশেষভাবে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটিই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করো না।" (সূরাহ আত-তাওবাহ: আয়াত ৩৬)**

এগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে আশ-শাহরুল হারাম। আল্লাহ বলেন,

> **"হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ...।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৯৭)**

এই বার মাসের মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। তার মধ্যে একটি হলো জিলহজ্জ মাস, আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম মাসের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

> **"রামাদান মাস এমন এক মাস, যেই মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে....।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৮৫)**

একইভাবে, কিছু দিন আছে যা অন্য দিনের তুলনায় মর্যাদাপূর্ণ। আবার কিয়ামের মর্যাদার কারণে দিনের তুলনায় রাত বেশি মর্যাদাপূর্ণ। যেমন- আল্লাহ তাআলা জিলহজ্জ মাসের দশ দিনের শপথ নিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

"ফজরের শপথ, দশ রাতের শপথ।" (সূরাহ ফজর: আয়াত ১-২)

তাছাড়া লাইলাতুল ক্বদরের রাত হচ্ছে হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম একটি রাত। এখন রামাদান মাস আর রামাদানে যে ক্ষণস্থায়ী সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হয়—সেটা উপভোগ করার এখনই উপযুক্ত সময়। রামাদানের এই সুশীতল বাতাসে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে না, বরং এই বরকতময় আবহাওয়া আমাদেরকে এমন লোকজনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তোলে, যারা চির সফল, যারা কখনোই দুঃখী আর হতাশ হবে না।

রামাদানের সুশীতল বাতাস! সেটা আবার কী?

প্রায় সময়ই যখন আমাদের কারো চুল ভিজা থাকে অথবা ব্যায়াম করার সময় শরীর ঘামে, তখন আমরা ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে তাদের বাইরে যেতে নিষেধ করি। বিশেষত শীতপ্রধান দেশে এমন ভেজা অবস্থায় বাইরে বের হলে অনেকে মৃত্যুর আশঙ্কাও করে। একটি হাদিসে রাসূল (ﷺ) মর্যাদাপূর্ণ দিনগুলিকে (যেমন রামাদানের দিনগুলো অথবা জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন) একটি মৃদুমন্দ ক্ষণস্থায়ী সুশীতল বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন—যা অনাবিল প্রশান্তির সুবাস বহন করে। এই বাতাস আমাদের চারপাশ দিয়ে বয়ে যায় ঠিকই, তবে এটি মুহূর্তের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। এ কারণে একবার চলে গেলে (অর্থাৎ রামাদান শেষ হয়ে গেলে) এই বাতাস উপভোগের আর কোনো সুযোগ থাকে না।

এই মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়াতে কারও ঠাণ্ডাও লাগে না, আবার কারো মৃত্যুও হয় না। বরং এই ঠাণ্ডা হাওয়া মানুষকে আনন্দ দেয়। যে এই বাতাস গায়ে মাখে, সে আর কখনো দুঃখী হবে না। এ ব্যাপারে একটি সহিহ হাদিস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (ﷺ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "নিজেকে ঐ মৃদু বাতাসে মুক্ত করো, নিজেকে রোমাঞ্চিত করো তার পরশে, নিজের বাহুগুলোকে মেলে ধরো ঐ মুক্ত বাতাসে।"[২০]

যে কখনো ঐরকম কোনো ঠাণ্ডা হাওয়াকে অনুভব করতে পেরেছে, সে কখনোই কোনো দুঃখের সম্মুখীন হবে না। এরকম মৃদু বাতাস রামাদান মাস, জিলহজ্জ মাস, লাইলাতুল ক্বদরের রাত্রিতে প্রবাহিত হয়—যখন নেক আমলের সাওয়াবকে কয়েকগুণ থেকে কয়েকশগুণ বর্ধিত করা হয়।

এক সৎ ও জ্ঞানী লোক একবার একজনের জানাযায় অংশগ্রহণ করল। সে তার পাশের অন্য একজন লোককে উদ্দেশ্য করে বলল, "ধরো, এই মৃত লোকটি যদি

[২০] মু'জামুল আওসাত: ৬২৪৩

পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তুমি কি মনে করো যে, তিনি ভালো ও উত্তম কাজ করবেন? অথবা তিনি কি ধরনের কাজ করবেন বলে মনে কর?" জবাবে ঐ লোকটি বলল, "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে ফিরে আসলে অবশ্যই ভালো কাজ করবে। আর কিছু না হোক, সে অন্তত দুই রাকাত সালাত পড়ে তারপর মরতে চাইবে। উত্তর শুনে জ্ঞানী লোকটি বললেন, "যেহেতু পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা কোনো মৃত লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়, তাই তিনিও আর ফিরে আসতে পারবেন না। কিন্তু আমরা তো এখনো জীবিত। কাজেই চলো আমরাই ভালো আমল করা শুরু করি।"

তাই যখন অলসতা আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতে বাধা দেয়, অথবা মানুষ এবং জিন শয়তান ঐ মুক্ত মৃদু সুশীতল ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন আমাদের অবশ্যই তা প্রতিহত করতে হবে এবং এসব বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দ্বীন ইসলামে আমাদের যেকোনো সমস্যারই সমাধান রয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদেরকে দিকনির্দেশনাহীন অবস্থায় রেখে যাননি। অলসতা, একঘেয়েমি, জিন ও মানুষের ওয়াসওয়াসা এ জাতীয় সমস্ত সমস্যার সমাধান দ্বীন ইসলামে বিদ্যমান।

উদাহরণস্বরূপ, যখন রাসূল (ﷺ) রাতে তাহাজ্জুদ সালাত পড়তে উঠতেন, তখন প্রথমেই তিনি প্রস্তুতিমূলক দুই রাকাত সালাত পড়ে নিতেন। যেকোনো ব্যায়াম যেমন ভারোত্তোলন, জগিং ইত্যাদির আগে আমরা স্ট্রেচিং করে নিই, একটু ওয়ার্ম আপ করে নিই, কারণ আমরা জানি একটু পরেই আমাদের পেশিতে চাপ পড়বে। একইভাবে আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রেও কিছু ওয়ার্ম আপের প্রয়োজন আছে। অথচ আমরা তো ফরয ইবাদাত করতে গিয়ে প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, এ অবস্থায় নফল ইবাদাতের কথা বলাই বাহুল্য।

আমরা যদি এই সকল ইবাদাতের পুরস্কারের কথা চিন্তা করি, তবে আমাদের একঘেয়েমি ও অলসতা দূর হয়ে যাওয়ার কথা। আমাদের উচিত সালাফদের জীবন সম্পর্কে জানা ও তাঁদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে নেককার বন্ধু অত্যন্ত সহায়ক, কারণ তারা ভালো কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং একে অপরকে ভালো কাজের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। সেই সাথে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে ভালো আমল করার বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে না।

হাসান আল-বাসরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যদি তোমার সাথে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাহলে তুমি এগিয়ে যাও এবং এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো। কিন্তু যদি এই প্রতিযোগিতা হয় দুনিয়ার ব্যাপারে, তাহলে তা তার মুখে ছুঁড়ে মারো এবং তার কাছে থেকে প্রস্থান করো।" রামাদান মাসে নিজের চাইতে উত্তম ব্যক্তিদের সাথে বেশি মেলামেশা করুন। কাউকে বলার প্রয়োজন নেই যে, আপনি তার সাথে

প্রতিযোগিতা করছেন, বরং আপনি নিজে নিজেই এটাকে প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহ বলেন,

> **"এই (আখিরাতের) ব্যাপারে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" (সূরাহ মুতাফফিফিন: আয়াত ২৬)**

আল্লাহর শপথ! এটা আল্লাহর পথে দৌড়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো। উহাইব ইবনুল-ওয়ারদ বলেন, "তুমি যদি এই দৌড়ে প্রথমেই আল্লাহর নিকট পৌঁছতে পার, তাহলে প্রথম হও।" শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমিন আত তুর্কিস্তানী বলেছেন, "যখনই আমি কাউকে কোনো ইবাদাত করতে শুনেছি, আমিও হয় তার মতোই ইবাদাত করেছি অথবা তার থেকে বেশি ইবাদাত করেছি।"

নাফি (ﷺ)-কে ইবনু উমার (ﷺ)-এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল শুধু ওযু আর সালাতের সমষ্টি। আর এই দুইয়ের মধ্যে বাকি সময়টা কাটত শুধু কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। কোনো ওয়াক্তের জামাত ছুটে গেলে তিনি এর বিনিময়ে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতেন, পরের দিন সাওম রাখতেন এবং সারা রাত আল্লাহর ইবাদাত করতেন।"

ইবনু উমার (ﷺ) যে মাপের সাহাবি ছিলেন, নিশ্চয়ই উনার জামাত ছুটে যাওয়ার পিছনে কোনো বৈধ কারণ ছিল। তারপরেও তিনি একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতেন, পরের দিন সাওম রাখতেন এবং সারা রাত আল্লাহর ইবাদাত করতেন। আসলে তাঁদের ঈমান ছিল অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আর তাঁরা তাঁদের লেভেল অনুযায়ীই সবসময় আমল করে যেতেন।

সুতরাং আমাদেরও উচিত আমাদের এই মূল্যবান সময়কে কাজে লাগানো। সময় এমন মূল্যবান সম্পদ, যা অন্য সকল সম্পদ—এমনকি সোনা থেকেও মূল্যবান। সালাফদের অনেকেই অর্থসম্পদ যতটা উদারভাবে দান করেছেন, সময়ের ব্যাপারে ঠিক ততটাই এমনকি তার থেকে বেশি হিসেবি ছিলেন।

সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার তাগিদ দিয়ে মহান আল্লাহ "আসর" নামে একটি সূরাহই নাযিল করেছেন। এখানে সাধারণ দিনের সময়গুলোর মূল্য বোঝানো হয়েছে, তাহলে চিন্তা করুন এই মহিমান্বিত মাসের দিনগুলোর গুরুত্ব কত বেশি!

একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সকল ইবাদাত করবেন আর এভাবেই নিয়তকে নির্ধারণ করবেন। নিজের জীবনের সবটুকু নিয়োজিত করবেন শুধু আল্লাহকেই খুশি করার জন্য। তাহলেই আপনি দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম পুরস্কার পাবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। ব্যাপারটা এমন যে, আপনি মূল্যবান কিছু কেনার জন্য সঞ্চয় করছেন, অর্থাৎ আখিরাতের জন্য দুনিয়াতেই সঞ্চয় করছেন।

কোনো কিছু কেনার প্রয়োজন হলে আমরা দোকানে যাই। অনেক সময়ে দোকানে বিশেষ কিছু অফার থাকে, যেমন- একটা কিনলে আরেকটা ফ্রি। রামাদানও আমাদের জন্য তেমন একটা সুবর্ণ সুযোগ। এই মাসে একগুণ ইবাদাত করলে সেটার বিনিময় যে কত গুণ হবে—তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। আর আল্লাহর দেওয়া উদাহরণ তো সর্বোত্তম। মহান আল্লাহ বলেন,

"...আল্লাহর উদাহরণই মহান," (সূরাহ আন-নাহল: আয়াত ৬০)

"যে মুমিন সৎকাজ করবে, হোক সে পুরুষ অথবা নারী, তাকে আমি উত্তম জীবন দান করব। আর তাদেরকে অবশ্যই তারা যা করত তার চেয়ে উত্তম প্রতিফল দেব।" (সূরাহ আন-নাহল: আয়াত ৯৭)

এটা আল্লাহর ওয়াদা—যদি আমরা মুমিন হই আর সৎকাজ করি—আল্লাহ অবশ্যই উত্তম জীবন দান করবেন। এখানে নারী পুরুষে কোন বৈষম্য নেই।

এই উত্তম জীবন আর খুশি তো দুনিয়ার জীবনের জন্য। তবে এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ আরও বলেন, "এবং আমরা তাদেরকে অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের চেয়ে উত্তম বদলা দেব" —এখানে আখিরাত এবং জান্নাতের জীবনকে বুঝানো হয়েছে।

তাই এ পুরস্কার পেতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানাতে হবে। নিজের সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই আখিরাত ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য উত্তম ফয়সালা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে এমন এক অফার দিচ্ছেন—যেই অফার গ্রহণ করলে আমরা আখিরাতে চূড়ান্ত সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাব।

শুরু হোক প্রতিযোগিতা

আমাদের ইবাদাতকে প্রাণবন্ত করে তোলার অনেকগুলো উপায়ের একটি হচ্ছে—ইতিহাসের সোনালী পাতায় ফিরে যাওয়া। ইবাদাতের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার অনেকগুলো উপায় আছে। নিজেদের ইবাদাতকে প্রাণবন্ত করার একটি উপায় হলো ইবাদাতের জন্য ওয়ার্ম আপ করা, যেভাবে খেলোয়াড়রা খেলার আগে ওয়ার্ম আপ করে নেয়। যেমন- রাসুলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নিতেন। এই আমলগুলো আমাদের ইবাদাতকে সুন্দর ও উদ্যমী করে তোলে। তেমনি আবার মৃত্যুর স্মরণ অলসতাকে ঝেড়ে ফেলে, ঘুমকে তাড়িয়ে দিয়ে ইবাদাতের রাস্তা প্রশস্ত করে। সালাফদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা অলসতাকে কাটিয়ে তোলে। সালাফদের ইবাদাত সম্পর্কে যখন আমরা শুনি বা পড়ি, তখন তা আমাদেরকে উদ্যমী করে তুলে এবং আমাদের ইবাদাতে প্রাণ সঞ্চার করে।

আমাদের প্রথম করণীয় হলো—সালাফদের (অর্থাৎ আমাদের প্রথম প্রজন্মের সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মুসলিমদের) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা। তাঁদের একজনকে বেছে নিন এবং বন্ধুত্ব তৈরি করুন। প্রত্যেক জাতির আকাশে তাদের নিজস্ব তারকা আছে, যাদের দেখানো পথে তারা চলে, আর আমাদের আকাশের সেই তারকা হলেন আমাদের সালাফরা। তাঁরাই হচ্ছেন আমাদের নক্ষত্র। কেউ কেউ বলতে পারে, কীভাবে আমরা সালাফদের বন্ধু হবো? তাঁরা তো সকলে মৃত। হ্যাঁ, তাঁরা প্রত্যেকে মৃত কিন্তু তাদের ইবাদাতের যে আদর্শ তারা রেখে গেছেন—তা আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। আজকে আমাদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, কেউ যদি খুব বেশি হারাম কাজ না করে, তাতেই আমরা তাকে বিরাট সাধু মনে করি। আমাদের ইবাদাতের মান এত নিচে নেমে গেছে যে, যারা সালাতের সুন্নাহ ও নফলগুলো আদায় করে, তাদের অনেক বড় আবেদ ভাবা হয়—সাবিকুম বিল খাইরাতি বিইযনিল্লাহ। আমাদের পুর্বপুরুষদের দিকে তাকান, তাঁরাই ছিলেন ইবাদাতের মানদণ্ড। রামাদানে তাঁরা কেমন ইবাদাত করতেন—সেটা তো অনেক দূরের কথা, বছরের বাকি সাধারণ দিনগুলোতে তাঁরা কেমন ইবাদাত করতেন—সেটা দেখেই তো আমাদের চোখ কপালে উঠে যাবে।

যেমন- আবু মূসা আল আশআরি (رضي الله عنه) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন আনসার সাহাবি। তিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। ইয়েমেনে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দুইজনের একজন। ইয়েমেন ও তার আশেপাশের স্থানের যত মানুষ আছে,

তাদের প্রত্যেকের সাওয়াবের ভাগীদার হচ্ছেন আবু মূসা আল আশআরি ও মুয়াজ ইবনু জাবাল। তিনি ছিলেন একজন দাঈ, আলিম, মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ এবং নেককার ইমাম। আবু মূসা সারাটি জীবন ধরে অনেক পরিশ্রমের সাথে ইবাদাত করেছেন। লোকেরা বলত, "আপনি কেন একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন না, আবু মূসা?" তিনি বলতেন, "যখন ঘোড়া দৌড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অথবা তারা পানির পাত্র দেখতে পায় এবং সেখানে পৌঁছানোর উপক্রম হয়, তখন ঘোড়া আরো জোরে দৌড়ায়। আমিও তো জীবনের শেষ প্রান্তে আছি, তাই মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে এভাবে চলতে দাও।"

এই কথাগুলো তাঁকে জীবনের শেষ পর্যায়ে বলা হয়নি—বলা হয়েছিল যৌবনকালে। যখন একজন ব্যক্তি দুই মাইল দৌঁড়ায়, তখন তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। সে শুরু করে ধীরে, তারপর আস্তে আস্তে গতি বৃদ্ধি করে, আর একদম শেষ পর্যায়ে সবচেয়ে দ্রুত ছোটে। কিন্তু সালাফরা এমন ছিলেন না। তাঁদের জীবন ছিল সবসময় সেই শেষ পর্যায়ের মতো—তাঁরা সর্বদাই জোরে ছুটতেন।

আবু মুসলিম আল খাওলানি ছিলেন তাবেয়ীনদের একজন, সাহাবিদের পরের প্রজন্ম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখার জন্য তিনি খুব আকুল ছিলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখার জন্য ইয়েমেন থেকে মদীনার দিকে গেলেন, সেখানে পৌঁছানোর আগেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তেকাল হয়ে গেল। অল্পের জন্য তিনি সাহাবি হতে পারলেন না। সাহাবি হতে না পারার দুঃখে তিনি সাহাবিদের বলে ওঠেন, "আপনারা মনে করেছেন আমাদের হারিয়ে দেবেন? আল্লাহর কসম! আমরা আপনাদের সাথে প্রতিযোগিতা করব এবং আপনাদের পরাজিত করব।" খুব শক্তিশালী কিছু কথা। আমাদেরও এমন মানসিকতা থাকা উচিত। যদি আমরা তাঁদের পর্যায়ে পৌঁছাতে চাই, জান্নাতে তাঁদের প্রতিবেশী হতে চাই—তবে আমাদের উচিত সালাফদের সাথে প্রতিযোগিতা করা। আল্লাহ বলেন,

> **"তোমরা কি মনে কর তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?" (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১৪২)**

আপনি কি মনে করেন যে বিলাল, আবু বকর, খালিদ, উমার, হাফসা আর সুমাইয়াহ যে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, আপনিও সেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন, অথচ তাঁরা যে কাজ করেছেন তা না করেই? আপনি কি মনে করেন যে, শুধু শাহাদাহ পাঠ করেছেন, মুসলিম হয়ে জন্মেছেন বলে আপনার হাতে জান্নাতের টিকেট ধরিয়ে দেওয়া হবে—যেখানে আপনি নিদ্রাহীন ইবাদাতের একটি রাতও কাটাননি? সালাফদের ব্যাপারে আমরা বিস্ময়কর কিছু জিনিস দেখি। তাঁদের মাঝে এমন অনেকে ছিল, যদি তাঁদের বলা হতো আগামীকাল আপনি মৃত্যুবরণ করবেন—তারপরেও তাঁদের বিশেষভাবে অতিরিক্ত ইবাদাত করার মতো সময় পাওয়া যেত না।

কারণ তাঁরা জীবনের প্রতিটি দিনই অনেক বেশি ইবাদাত করতেন। তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনটাই ছিল এমন—যেন তাঁরা সেদিনই অথবা তার পরদিনই মৃত্যুবরণ করবেন। আপনি হয়তো বলতে পারেন—আমরা তো তাঁদের মতো হতে পারব না। আল্লাহর কসম, এটা সম্ভব। সাহাবিরা কোনো ওহী পাননি—আমরাও পাই না। যারা ওহী পেতেন, তাঁদের তাবেয়ীরাও দেখেননি—আমরাও দেখিনি। কিন্তু তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ছিল, আমাদের নেই—এটাই সমস্যা। এটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব না। ইবাদাতের ক্ষেত্রে আমরা বড় বড় উদাহরণগুলো দিই যাতে অন্তত ছোট একটি অংশ করতে পারি। তাহলে আমরা সকল বাধা অতিক্রম করে সফলকাম হতে পারব, জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর জান্নাতে দাখিল হতে পারব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ বলেন,

> **"অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু না।" (সূরাহ আলে ইমরান: ১৮৫)**

এই উদাহরণগুলো নিজেদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এমন যেন না হয় যে, বরকতময় দিনগুলো আসলো আর চলে গেল—কিন্তু আমরা উপকৃত হতে পারলাম না। আরেকটা ব্যাপার হলো সালাফদের ইবাদাতের পরিমাণই শুধু নয়—তাঁদের ইবাদাতের মানের দিকেও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। কাতাদাহ (ﷺ) বলেন, মাওরিদ আল আজলি (ﷺ) বলেছেন, "একজন প্রকৃত মুমিনের উদাহরণ এরূপ যে, তার নৌকা ডুবে গেছে, সে একটি ছোট কাঠের টুকরো ধরে ভেসে আছে, আর বলছে ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ—যাতে আল্লাহ তাকে পানি থেকে বাচান।" জীবন এমনই হওয়া উচিত। সালাফদের সমগ্র জীবন ছিল সেই ব্যক্তির মতো—যে সমুদ্রে ভেসে থাকে, তার জীবন নির্ভর করে একটি ছোট্ট কাঠের ওপরে, আর সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে যেন আল্লাহ তাকে নিরাপদে তীরে ভিড়িয়ে দেন।

সুফিয়ান আস-সাওরি (ﷺ) সম্পর্কে বলা হতো—তিনি যেন একটি ডুবন্ত নৌকার যাত্রী। তাঁর বেশিরভাগ দু'আ ছিল—ইয়া রব সাল্লিম, ইয়া রব সাল্লিম (হে আল্লাহ নিরাপত্তা দাও! হে আল্লাহ নিরাপত্তা দাও!)। মহা বিপদের দিনে এটাই হবে রাসূলদের দু'আ। ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক ছিলেন উমার ইবনু আব্দুল আযীযের স্ত্রী। তিনি তাঁর স্বামীর ব্যাপারে বলেন, "আমি উমারের চাইতে আর কাউকে এত বেশি সালাত, সাওম, আল্লাহকে ভয় করতে দেখিনি।" ফাতিমা আরো বলেন, 'উমার ইশার সালাত আদায় করে কাঁদতেন, সারা রাত ছটফট করতেন। যখন স্ত্রীর সাথে বিছানায় যেতেন, পরকালের কোনো আয়াত মনে পড়লে তিনি ভয়ে কাঁপতেন আর কাঁদতে থাকতেন, —যেভাবে ঠাণ্ডা পানিতে ভেজা পাখি কাঁপতে থাকে। তিনি উঠে বসতেন, সারাটা রাত কাঁদতেন, আমি তাঁকে ঢেকে দিতাম, সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতাম।" আল মুগীরা ইবনু হাকিমকে ফাতিমা একদিন বলেছিলেন, "হয়তো উমার ইবনু আব্দুল আযীযের চাইতে বেশি সালাত বা সাওম পালন করে এরকম লোক খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে তাঁর ধারে কাছে তোমরা কেউ আসতে পারবে না।" এই মানুষগুলো হচ্ছেন তাঁরা—যাদের ইবাদাতই তাঁদের গড়ে তুলেছে এবং তাঁদেরকে দিয়েই আল্লাহ্ এই দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

উকবাহ ইবনু নাফি বলেন, "আমি একদিন ফাতিমার কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার স্বামী উমার ইবনু আবদুল আযীয কেমন ইবাদাত করতেন?" উকবাহ্র প্রশ্নের জবাবে ফাতিমা বলেছিলেন, "খলিফা হবার পর আর কোনোদিন উমার জানাবাহ গোসল করেছেন বলে আমার জানা নেই।" অর্থাৎ, এই দুই বছর চার মাসে তাঁদের মধ্যে কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। দিনের বেলা আল্লাহর বিধান ও ন্যায় বিচার কায়েম করেছেন—যেটা হলো তাওহীদ। আর রাতের বেলা আল্লাহর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এই দুই বছর চার মাসে স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের সুযোগ পাননি।

এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি তাবেয়ীনরা শেখার জন্য একে অপরের কাছে যেতেন, তাঁদের ইবাদাতের ব্যাপারে খোঁজ নিতেন। আমরাও এই কাজটি করব, সালাফদের থেকে শিখব। উকবাহ ফাতিমার কাছে গিয়েছিলেন উমার বিন আব্দুল আযীয সম্পর্কে জানতে। তিনি গিয়েছেন তাঁর স্ত্রীর কাছে, কারণ একমাত্র স্ত্রী-ই তার স্বামী সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে। উকবাহ জানতে চেয়েছিলেন বন্ধ দরজার অপর পাশে উমার ইবনু আবদুল আযীয কী করেন? কিন্তু কেন উকবাহ উমারের ব্যক্তিগত ইবাদাত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন? কী সেই কারণ? কী এমন বিশেষত্ব উমারের? কারণ হচ্ছে—এই উমার তার মাত্র দুই বছর চার মাসের খিলাফতকালে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আল্লাহর আইনকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শুধু মুসলিমরা নয়, মুসলিম বিশ্বের আহলে যিম্মারাও (যেসব অমুসলিম ইসলামি রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ থাকে) তাঁর শাসনামলে অনেক সম্পদ লাভ করেছিল।

আমীর ইবনু আবদিল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি কীভাবে এত ইবাদাত করেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "বিষয়টা সহজ। আমি যা করি তা হলো—রাতের খাবার একটু দেরিতে খাই, আর দিনের ঘুমটা কিছুটা পিছিয়ে নিই।" আসলে মহৎ ব্যক্তিদের জন্যই আল্লাহর ইবাদাত করা সহজ। আরেকবার তিনি বলেন, "যখন আমি ক্লান্ত হয়ে যাই, তখন আমি জাহান্নামের কথা চিন্তা করি, জাহান্নাম আমার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নেয় আর আমাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখে।" আহমাদ ইবনু হারব বলেন, "আমি সেই ব্যক্তিকে দেখে অবাক হই, যে জানে তার মাথার ওপরে জান্নাত সজ্জিত আছে আর তার নিচে জাহান্নামের আগুন জ্বলছে, আর এই দুইয়ের মাঝে সে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে।"

আরেকজন সালাফ মানসুর ইবনু আল মুতামিরকে দেখে মানুষ মনে করত, নিশ্চয়ই তিনি কোনো বিপদে আছেন। কারণ তাঁর চোখে থাকত পানি, হৃদয় ব্যথিত, গলার স্বর থাকত নিচু। তাঁর মা তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী হয়েছে? তুমি

সারারাত কাঁদো, থামো না। তুমি কি কাউকে খুন করেছ?” তিনি বললেন, “আমিই জানি আমার কী হয়েছে।”

> **“তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে দুরে থাকে, তারা তাদের রবকে ডাকে আশঙ্কায় ও আশায় এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।” (সূরাহ আস-সাজদা: আয়াত ১৬)**

সাফওয়ান ইবনু সালিম সম্পর্কে বলা হয়, সারারাত দাঁড়িয়ে থেকে ইবাদাত করার কারণে তাঁর পা ব্যথা করত। তিনি এত বেশি ইবাদাত করতেন যে, কেউ যদি তাঁকে বলত আগামীকাল কিয়ামাত, তবে সেটার জন্য আলাদা করে অতিরিক্ত ইবাদাত করার সময় তিনি পেতেন না। তিনি সর্বদা বলতেন,

> “হে আল্লাহ আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি।”

আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা, আল্লাহর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল মৃদুমন্দ বাতাসের মতো—যা তাদের হৃদয়ে সর্বদা বয়ে বেড়াত। এই বাতাস তাঁদের হৃদয়ে দুনিয়ার আগুনকে নিভিয়ে দিয়েছিল। মূসা ইবনু ইসমাইল বলেন, “আমি যদি তোমাদের বলি, হাম্মাদ ইবনু সালামাহকে আমি কখনো হাসতে দেখিনি—তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?” তিনি সারাদিন শিক্ষকতা করতেন, তিনি ছিলেন একজন আলিম। হয় তিনি ছাত্রদের পড়াতেন, কুরআন পাঠ করতেন, যিকির করতেন অথবা তিনি সালাত আদায় করতেন—এভাবেই তাঁর সমস্ত দিন অতিবাহিত হতো। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ বলেন, “আমরা কখনো সুলাইমান আত-তাইমিকে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে দেখিনি। তাঁকে আমরা দেখেছি সালাত আদায় করছেন, মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন, জানাযায় যাচ্ছেন বা জানাযা থেকে ফেরত আসছেন, ছাত্রদের পড়াচ্ছেন বা নিজে পড়াশোনা করছেন। আমরা বলতাম এই মানুষটি কোনো গুনাহ করতে পারেন না।”

ওয়াকী ইবনু আমাশ ৭০ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কখনো ইমামের পেছনে তাকবীর আল ইহরাম তাঁর বাদ যায়নি। ৬০ বছর যাবত কখনোই সালাতের প্রথম রাকাত বাদ যায়নি। এমনই ছিলো আমাদের সালাফদের ইবাদাত। আল্লাহ্ আমাদেরকেও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন। আমীন।

তাওবা এবং ইনাবা

আমরা সবাই তাওবা শব্দটির সাথে কমবেশি পরিচিত। একই রকম আরও একটি শব্দ কুরআনে বহুবার এসেছে। শব্দটি হলো—ইনাবা।

ইনাবা কী? ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, "ইনাবা হলো প্রতিনিয়ত আল্লাহকে খুশি করার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকা, বারবার আল্লাহর দিকেই ফিরে যাওয়া।" অর্থাৎ, এটা তাওবাই। কিন্তু এ তাওবা হলো ক্রমাগত তাওবা—বিরতিহীন তাওবা। ইনাবা করার জন্য মন থেকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে, ভয় নিয়ে, আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে ছুটে যেতে হবে—আর তা হতে হবে কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক। আল্লাহর কিছু বান্দা আছে যারা রামাদানের শেষ দশ দিনে, দুনিয়ার সবকিছু পেছনে ফেলে, ইতিকাফের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দিকে ছুটে যায়। ঠিক তেমনি ইনাবা হলো আল্লাহর দিকে অনবরত ইতিকাফ করা। মানবহৃদয়কে আল্লাহর দিকে ছুটে যেতেই হবে—এতেই মানুষের জন্য সম্মান নিহিত। কেউ যদি আল্লাহর পানে না ছোটে, তাহলে অবশ্যই সে অন্য কারো দিকে ছুটবে, আর মানুষ হয়ে নিজের রব ছাড়া অন্য কারো দিকে ছোটার মধ্যে কোনো সম্মান নেই।

সুখের দিনে, কিংবা দুঃখের মুহূর্তে—সবরকম অবস্থায় আল্লাহর দিকে পুরোপুরি ফিরে যাওয়াই হলো ইনাবা। মুনইব হলো সেই ব্যক্তি, যে গুনাহর পর তাওবা তো করেই, বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নিজেকেই বদলে ফেলে—আল্লাহর সাথে নিজেকে একটা সার্বক্ষণিক সম্পর্কে জুড়ে নেয়। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যাপারে বলেছেন,

> **"নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিল ধৈর্য্যশীল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, এবং আল্লাহ অভিমুখী।" (সূরাহ হুদ: আয়াত ৭৫)**

এই আয়াতে আল্লাহ্‌র বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-এর তিনটি গুণের কথা বলা হচ্ছে। তিনি ছিলেন হালিম অর্থাৎ ধৈর্যশীল, আউয়াহ অর্থাৎ কোমল হৃদয়ের অধিকারী, এবং মুনইব অর্থাৎ বারবার আল্লাহর দিকে তাওবাকারী।

কুরআনের একটি আয়াতকে কিছু উলামা সব চাইতে বেশি আশা জাগানিয়া আয়াত বলে মনে করেন। সেই আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন,

> **"বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি**

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও।" (সূরাহ যুমার: আয়াত ৫৩-৫৪)

এই আয়াতে তাওবার পরেই আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন ইনাবার কথা।

ইনাবার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হলো ইনাবার সবচেয়ে মৌলিক স্তর—শির্ক ছেড়ে তাওহীদ এবং কুফর ছেড়ে ইসলামের দিকে ফিরে আসা। এটুকু না থাকলে একজন মানুষ আর মুসলিম থাকে না—কাফিরে পরিণত হয়। কুফর ছেড়ে ইসলামে আসাটা ইনাবার একেবারে প্রাথমিক স্তর। কুরআনের আয়াত থেকেই ইনাবার এই স্তরটির উল্লেখ পাওয়া যায়:

"যারা তাগুতের ইবাদাত করা থেকে দূরে থাকে এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদের।" (সূরাহ যুমার : আয়াত ১৭)

ইনাবার দ্বিতীয় স্তর হলো মুত্তাকীদের ইনাবা—গুনাহ ছেড়ে ভালো কাজ করা। যে এখনও ইনাবার প্রথম স্তরে আছে, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছাতে পারেনি, সে মুসলিম হলেও আমরা তার জন্য জাহান্নামের আশঙ্কা করি। কারণ সে তার গুনাহর কারণে জাহান্নামে যেতে পারে—যদি না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।

ইনাবার এই স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায় কুরআনের সূরাহ যুমারে,

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ যুমার: আয়াত ৫৩)

এবং এর পরবর্তী আয়াত -

"তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" (সূরাহ যুমার: আয়াত ৫৪)

ইনাবার তৃতীয় আরেকটি স্তর রয়েছে। তৃতীয় স্তরটিকেই আমাদেরকে রামাদানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে হবে। আর সেটা হলো মুহসিনীনদের ইনাবা। এটাই হলো ইনাবার সর্বোচ্চ স্তর—দেহ এবং মন দিয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া। সবসময়, সকল পরিস্থিতিতে, বারবার কেবল আল্লাহর দিকেই ফিরে যাওয়া, এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সকল আদেশ মেনে নেওয়া। এটাই হলো সর্বোত্তম পর্যায়ের ইনাবা। ইবরাহীম (عليه السلام) এভাবেই ইনাবা করেছেন, তাঁর ইনাবার স্তর ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইনাবা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **“নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিল ধৈর্য্যশীল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, এবং আল্লাহ অভিমুখী।” (সূরাহ হুদ: আয়াত ৭৫)**

শুধু ইবরাহীম (ﷺ)-ই নন, কুরআনে নবী শুয়াইব (ﷺ)-এর ব্যাপারেও উল্লেখ করা হয়েছে, সায়্যিদিনা শুয়াইব (ﷺ) বলেছেন,

> **“এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো থেকে সাহায্য আসতে পারে না, আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই।” (সূরাহ হুদ: আয়াত ৮৮)**

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, “শয়তান এই স্তরের লোকদের পিছেই সবচেয়ে বেশি লাগে, কেননা সবচেয়ে উত্তম লোকগুলোকেই শয়তান ভুল পথে নিয়ে যেতে চায়।” সব ইমামদের ইমাম, তাওবাকারীদের নেতা, ইবাদাতকারীদের নেতা, আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ)-বলেন,

> “আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং প্রতিদিন ৭০ বার তাওবা করি।”*[২১]*

সহিহ বুখারির বর্ণনা মতে ৭০ বার, আর সুনান নাসাঈ এর বর্ণনা মতে নবীজি (ﷺ) ১০০ বার তাওবা করতেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত— তাঁর জীবনের সামনের পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে, এরপরও তিনি ৭০ থেকে ১০০ বার তাওবা করতেন। অথচ আমাদের গুনাহর কোনো কমতি নেই, মাত্র একটি গুনাহ মাফের ব্যাপারেও আমাদেরকে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। তাহলে চিন্তা করুন আমাদের কত বার মাফ চাওয়া উচিত?

গুনাহ অন্তরকে শক্ত করে দেয়। কাজেই পাপে মরিচা পড়া অন্তরটাকে কোমল করতে আল্লাহর কাছে তাওবা করুন। এটা একটা ব্যাধি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **“অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মতো অথবা তার চাইতেও কঠিন...।” (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ৭৪)**

গুনাহ করলে অন্তর কালো হয়ে যায়, কাজেই তাওবাহ করুন। তাওবার মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার করে নিতে রামাদানের মতো এমন বরকতময় সময় আর পাবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **“কখনও না, বরং তারা যা করে, তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।” (সূরাহ মুতাফফিফীন: আয়াত ১৪)**

---

[২১] বুখারি: ৬৩০৭

ফোঁটা ফোঁটা করে আমাদের অন্তরে প্রতিনিয়ত দাগ পড়ছে। একটা সময় এটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে—পরিষ্কার করা জরুরি হয়ে পড়ে।

আউন ইবনু আব্দুল্লাহ্ বলেন, "যারা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তাদের সাথে থাকুন, কারণ তাঁরাই সবচেয়ে নরম মনের মানুষ।"

তাওবা বান্দা আর আল্লাহর মধ্যকার একটা অসাধারণ চুক্তি। কেমন সেই চুক্তি? আপনি একটা গুনাহ্ করলেন, নিজের উপর জুলুম করলেন, এরপরও আপনি তাওবা করুন, গুনাহর কাজ থেকে সরে আসুন—আল্লাহ্ আপনার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। রামাদানের জন্য কেউ কি খাবার-দাবার কেনার কথা ভুলেছে? না। মাগরিবের আগেই সবাই ইফতার প্রস্তুত করে ফেলে। অথচ নিজেকে প্রস্তুত করার কথা আমরা ভুলে যাই। রামাদানের খাবার জমানোর চাইতে তাওবা, ইস্তিগফার আর ভালো আমল করা কি বেশি জরুরি না?

> হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহ্ যদি পাহাড় সমানও হয়ে থাকে, তোমার ক্ষমা তো তারচেয়েও বড়! যদি নেককাররাই কেবল তোমাকে ডাকতে থাকে, তবে আমদের মতো পাপীরা কোথায় যাবে?
>
> হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে যেভাবে ডাকতে বলেছ, আমরা সেভাবেই তোমাকে ডাকি। বিনয়ের সাথে, একাগ্র হয়ে। তুমি যদি আমাদের ডাক না শুনো, তাহলে কে শুনবে? তুমি যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও, তাহলে কে আমাদেরকে ক্ষমা করবে? তুমি যদি আমাদের উপর দয়া না করো, তাহলে আর কে দয়া করবে?
>
> তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনো আশা নেই, ইয়া রব! তোমার উপরই আমাদের সকল আশা ভরসা, নিশ্চয়ই তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবে! আমরা তো মুসলিম, ঈমান এনেছি, শুধু তোমারই ইবাদাত করি।

তাওবা এবং ইনাবা নিয়ে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি করা হয় সেটা হলো, "আমি তাওবা করি, তারপর আবারো গুনাহ্ করি, আবার তাওবা করি এবং এরপর আবার গুনাহ্ করি। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, নিজেকে নিয়ে আমি হতাশ।"

আপনি কি কুরআন খুলে দেখেছেন? জানেন, আল্লাহ্ আপনাকে কী বলছেন? আল্লাহ্ আপনাকে ডেকে বলছেন,

> **"বলুন, হে আমার বান্দা, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ্ যুমার: আয়াত ৫৩)**

আল্লাহ্ এখানে এমনটি বলেননি যে, 'হে মুমিন বান্দারা', এবং তিনি এটিও বলেননি, 'হে মানবজাতি'—যেভাবে তিনি কুরআনে অনেকবার বলেছেন। এ আয়াতে

তিনি মুত্তাকীদেরকেও বলছেন না, নেককারদেরকেও বলছেন না, মুহসিনদেরকেও বলছেন না, আমলে অগ্রগামীদেরকেও বলছেন না। এ আয়াতে তিনি তাঁর গুনাহগার বান্দাদের সম্বোধন করে বলেছেন—নিরাশ হয়ো না।

আসিম ইবনু রাজা বলেন, উমার ইবনু আবদুল আযিয একবার এক বক্তৃতায় বলেন, "তোমরা যদি কোনো গুনাহ করে ফেলো—তাহলে তাওবা করো, যদি আবারও গুনাহে লিপ্ত হও—তাহলে আবারও তাওবা করো, এরপর আবারও গুনাহে জড়িয়ে পড়লে—আবারও তাওবা করো। গুনাহ হলো মানুষের গলার ফাঁসের মতো। গুনাহ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। আর সবচেয়ে জঘন্য মাত্রায় ধ্বংস হলো গুনাহ করে তাওবা না করা এবং গুনাহর উপর অবিচল থাকা।"

সুনান আত তিরমিযির এক হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার থেকে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত বেশিই হোক, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে কোনো পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করে থাকো, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।"[২২]

কাজেই তাওবার মাধ্যমে আপনি গাফুরের সাথে ডিল করছেন, আপনি আর রাহমানের সাথে ডিল করছেন, আপনি আফু এর সাথে ডিল করছেন। আল্লাহ তাআলার এই গুণগুলো থেকে এটাই হলো আপনার প্রাপ্তি যে—তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।

ইবরাহীম ইবনু শাইবান বলেছেন, তিনি ২০ বছর বয়সী এক যুবককে চিনতেন। শয়তান তাকে এ কথা বলে প্ররোচিত করে যে, তুমি তো এখন যুবক। তুমি এখনই কেন তাওবা করছ, এখনই কেন দুনিয়াকে ভোগ করা থেকে বিরত থাকছ? তোমরা সামনে এখনও কত লম্বা সময় পড়ে আছে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ছেলেটা আবার সেই গুনাহর জীবনে ফিরে গেল। এভাবে গুনাহর মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থাতেই হঠাৎ একদিন তার মনে পড়ে গেল আল্লাহর অনুগত হয়ে কাটানো সময়টার কথা। একজন মুসলিম গুনাহ করার সময়েও মুসলিমই থাকে, তার অন্তরে এখনো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ গেঁথে আছে। সে তখন আগের সুন্দর জীবনটার জন্য কাঁদতে শুরু করল।

---

[২২] তিরমিযি: ৩৫৪০

নিজেকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ কি আর আমাকে কবুল করবেন? এরপর সে একটা আওয়াজ শুনল, সম্ভবত সে নিজেই নিজেকে বলছিল,

> "তুমি আমার ইবাদাত করলে, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানালাম। তুমি গুনাহ করলে, আমি তোমাকে অবকাশ দিলাম। তুমি ফিরে আসলে, আমি তোমাকে কবুল করে নিলাম।"

যদি আপনি তাওবা করার পরও শয়তানের ফাঁদে পড়ে যান, তবুও ফিরে আসুন, এতে লজ্জা পাবার বা নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনি যখন অনবরত তাওবা করবেন, এটা শয়তানের সাথে একটা কুস্তি লড়াইয়ের মতো। প্রত্যেকবার যখন আপনি তাওবা করবেন, সেটা হবে শয়তানের পরাজয়, আর আপনার বিজয়। কিন্তু যখনই আপনি নিরাশ হবেন আর তাওবা করা ছেড়ে দেবেন, তখনই শয়তান আপনার উপর বিজয় লাভ করবে। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে শয়তান জিতে যাক। কখনও হাল ছাড়বেন না। কখনও ভাববেন না যে—আপনি গুনাহ থেকে আর বেরোতে পারবেন না। খারাপ কাজের সাথে লড়াই চালিয়ে যান। গুনাহর সাথে যুদ্ধ করুন। হয়তোবা আপনার কোনো একটা তাওবা এতটাই মনের গহীন থেকে বেরিয়ে আসবে যে, সেই ডাক শুনে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন—আর আপনাকে জান্নাতের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন।

এত সব আয়াত আর হাদিস থাকার পরেও আপনি কীভাবে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারেন, যখন আল্লাহ নিজে আপনাকে ডাকছেন? আল্লাহ আপনাকে কেন তাওবাহ করতে ডাকছেন? তাঁর তো আমাকে বা আপনাকে কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি অমুখাপেক্ষী, সব কিছুর মালিক। তিনি ডাকছেন কারণ তিনি আর রাহমান, আল গাফুর, আল আফুউ। আল্লাহর কসম, আপনি সেই মহান রবের কাছে ক্ষমা চাইছেন—যার দয়া আপনার মমতাময়ী মায়ের থেকেও বেশি।

আল্লাহর শপথ, তাওবার মাধ্যমে আপনি এমন এক সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক করছেন যিনি আপনার প্রতি আপনার মায়ের চেয়েও বেশি দয়াশীল। সহিহ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, এক যুদ্ধের পর সাহাবিরা বসেছিলেন এবং তাঁরা যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে এক মহিলাকে দেখতে পেলেন। সে তার ছেলেকে খুঁজছিল, প্রতিটি বাচ্চার কাছে সে যাচ্ছিল, কোলে তুলে নিচ্ছিল, জড়িয়ে ধরছিল, পরিচর্যা করছিল, এরপর অন্য বাচ্চার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। খুবই মর্মস্পর্শী এই দৃশ্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবিদের খুব নাড়া দিয়েছিল। নবীজি (ﷺ) সিদ্ধান্ত নিলেন ঘটনাটিকে সাহাবিদের জন্য শিক্ষণীয় বানাবেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কি মনে হয় এই মা কখনো তার ছেলেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারবে?" তাঁরা বললেন, "না, কখনোই না।" নবীজি (ﷺ) বললেন, "এই মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াশীল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও বেশি দয়াশীল।"

সূরাহ নিসায় আল্লাহ যখন উত্তরাধিকার নিয়ে কথা বলেছেন, তখন তিনি সন্তানদের যত্ন নেওয়ার জন্য মা-বাবার প্রতি আদেশ করেছেন।

> **"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন..." (সূরাহ নিসা: আয়াত ১১)**

অনেক মানুষ ভাবে তাদের মা-বাবাই তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াবান। কিন্তু যাদের আপনি সবচেয়ে দয়াবান মনে করেন, এই আয়াতে আল্লাহ তাদেরকেই নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাদের সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হয়। তাহলে যিনি আদেশ করছেন, সেই মহান আল্লাহর দয়া কতটা বিশাল? কোনো কোনো সৎকর্মশীল মানুষরা দু'আ করতেন এই বলে, "হে আল্লাহ, আমার মা আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াশীল, তিনি কখনো আমাকে কষ্ট দেবেন না, বরং কষ্ট থেকে রেহাই দেবেন। হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতি আমার মায়ের চাইতেও বেশি দয়াশীল, সুতরাং আমাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করুন ইয়া আরহামার রাহিমীন।"

আপনি হয়তো কারো সাথে একবার খারাপ আচরণ করে ফেললেন। অনেক সময় খারাপ আচরণ করার আগেই, কিংবা আপনার কোনো ভুল হয়ে গেলে তা শোধরানোর সুযোগ দেওয়ার আগেই মানুষ আপনাকে পরিত্যাগ করে বসে। কিন্তু আল-গাফুর, আর-রাহীম, আল আফু এমনটা নন—তিনি ভিন্ন মানদণ্ডে আপনাকে বিচার করেন।

> **"...এবং আল্লাহর উদাহরণই সর্বশ্রেষ্ঠ..." (সূরাহ নাহল: আয়াত ৬০)**

কাজেই, কখনো হতাশ হবেন না। সহিহ মুসলিমে আবু সাঈদ আল খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত একটি সহিহ হাদিসে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা আছে—যে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহগুলোর একটি হলো অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। সেই হত্যাকারী এক মূর্খ আবেদ ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—সে যদি তাওবা করে কবুল হবে কি না। সেই মূর্খ আবেদ জবাব দিল, "৯৯ জন হত্যা করার পর তাওবা? কক্ষনো না!" তখন সেই হত্যাকারী ঐ আবেদকেও হত্যা করল।

এই ঘটনার মাঝে একটা শিক্ষা আছে। যদি তাওবার দরজা দুনিয়াতে পুরোপুরি বন্ধই হয়ে যায়—তাহলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। কারণ তখন আপনি ভাববেন আপনার অপরাধ তো আর কখনোই ক্ষমা করা হবে না, তাহলে অপরাধই করে যাই! যেহেতু নিজেকে শোধরানোর সুযোগ নেই তাহলে আরও কিছু অপরাধ করলে কী-ই বা আসে যাবে! আপনি পুরোপুরি অসৎ হয়ে যাবেন, যা খুশি করতে পারবেন, কারণ আপনার হারাবার কিছুই নেই।

সেই হত্যাকারী ব্যক্তি এরপর একজন আলিমকে জিজ্ঞেস করল, "আমি ১০০ জন মানুষকে হত্যা করেছি, আমি কি তাওবা করতে পারব?" তিনি বললেন, "অবশ্যই পারবে। তোমার উচিত এই খারাপ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া।"

আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে শুধু ক্ষমাই করলেন না, তার জন্য পুরো জমিনকে বদলে দিলেন। সে ব্যক্তি খারাপ এলাকা ছেড়ে নতুন এক শহরে যাওয়ার পথে দুই এলাকার মাঝে এক জায়গায় মারা গেল। তখন সৎ আত্মা গ্রহণকারী ফেরেশতা ও অসৎ আত্মা গ্রহণকারী ফেরেশতার মাঝে ঝগড়া বেঁধে গেল। আর আল্লাহ তখন তার সম্মানে জমিনকে এমনভাবে সংকুচিত করে দিলেন যেন সৎ আত্মা গ্রহণকারী ফেরেশতারা তাকে গ্রহণ করতে পারেন। যে লোকটি ১০০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করল এবং অতঃপর তাওবা করল, তার জন্য আল্লাহ জমিনকে সংকুচিত করে দিলেন। তাহলে সেই রব আপনার জন্য কী করবেন!

যখন আপনি হতাশা অনুভব করবেন এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাশ হয়ে পড়বেন, তখন আসহাবুল উখদুদের ঘটনা স্মরণ করুন। এটি ছিল এক গণহত্যার কাহিনী, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কালিমায় বিশ্বাস করত তাদের হত্যা করা হয়েছিল। তারা এক সৎকর্মশীল বালককে হত্যা করেছিল যে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, এটি ছিল নির্বিচারে সংঘটিত একটি গণহত্যা। আল্লাহ হত্যাকারীদের ব্যাপারে কী বলেছেন?

> **"যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।" (সূরাহ বুরুজ: আয়াত ১০)**

আল্লাহ বলেছেন—যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি। এই কথার অর্থ কী? অর্থ হলো, তারা যদি গণহত্যা চালানোর পরে তাদের অপরাধের জন্য তাওবা করত তাহলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন—এরপর তারা তাওবা করেনি।

ছোট-বড় যেকোনো গুনাহ থেকেই আপনি তাওবা করবেন এবং আল্লাহ সব মাফ করে দেবেন। আর রামাদানই তাওবার জন্য শ্রেষ্ঠ সময়। তাই এখনই শুরু করুন। প্রথমত, অতীতের জন্য অনুতপ্ত হোন। প্রতিজ্ঞা করুন যে, ঐ কাজ আর করবেন না এবং বলুন 'আস্তাগফিরুল্লাহ'। যদি এর সাথে অন্য মানুষের হক জড়িত থাকে তাহলে সরাসরি তাদের সেটি ফিরিয়ে দিন—না হলে পরোক্ষভাবে। যদি মনে হয় এর কারণে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে তাহলে তাদের জন্য দু'আ করুন, তাদের নামে দান-সাদাকা করুন অথবা ভালো কাজে তাদের নাম উল্লেখ করুন। খুবই সহজ।

আপনি আন্তরিকভাবে এই কাজ করুন, আল্লাহর কসম, আল-গাফুর, আর-রাহীম তা গ্রহণ করবেন।

> **"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং**

তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।" (সূরাহ শূরা: আয়াত ২৫)

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

"আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে?" (সূরাহ নিসা: আয়াত ১২২)

শুধুমাত্র যে তাওবা গ্রহণ করবেন তা না, তিনি সেগুলোকে সৎকর্মে রূপান্তর করবেন।

"কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ ফুরকান: আয়াত ৭০)

এবং তিনি তাওবা করার জন্য তাদের ভালোও বাসবেন।

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ২২২)

অতএব, উঠে দাঁড়ান এবং ঝেড়ে ফেলুন গুনাহের ধুলো। ওযু করে দুই রাকাত সালাত আদায়ের মাধ্যমে আপনার তাওবাকে আরও বেশি প্রাণবন্ত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলুন। আল্লাহর কাছে আপনার তাওবার ঘোষণা দিন, পাপের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকুন এবং আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করুন। তাওবা এমন এক ছায়া—যা আপনাকে কখনো ছেড়ে যাবে না। তাওবা সৎকর্মশীলদের জন্য এক সান্ত্বনা।

রামাদান হলো সমৃদ্ধি অর্জনের সময়। নিজের জ্ঞান অথবা ভালো কোনো আমল নিয়ে অহঙ্কার করবেন না। আল্লাহর কসম, এগুলো আপনার যত বেশিই থাকুক না কেন, আমরা সবাই পাপের নৌকায় সফর করছি। আমরা সবাই একই নৌকায় আছি।

সহিহ আল-বুখারির একটি চমৎকার হাদিস আছে। এক বান্দা গুনাহ করল এবং বলল, "হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দিন।" সুতরাং আল্লাহ বললেন, "আমার বান্দা একটি গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে তার একজন রব আছেন যিনি তার গুনাহ মাফ করেন এবং গুনাহের জন্য তাকে শাস্তি দেন। আমি তাকে মাফ করে দিলাম।" এরপর সে ব্যক্তি আবার গুনাহ করল।

আল্লাহ আমাদের চিনেন, তিনি তাঁর বান্দাদের ভালো করেই জানেন। তিনি বলেছেন,

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কী করে জানবেন না?" (সূরাহ মুলক: আয়াত ১৪)

আল্লাহ জানেন যে আমরা বারবারই গুনাহ করব, বেশি বেশি গুনাহ করতে থাকব। তিনি জানেন যে, তিনি কাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের স্বভাব কেমন, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। এখন সেই লোকটি আবারও গুনাহ করল এবং বলল, "হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করে দিন।" আল্লাহ বললেন, "আমার বান্দা একটি গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে তার একজন রব আছেন যিনি তার গুনাহ মাফ করেন এবং গুনাহের জন্য তাকে শাস্তি দেন। আমি তাকে মাফ করে দিলাম।"

সেই হত্যাকারী ব্যক্তি এরপর একজন আলিমকে জিজ্ঞেস করল, "আমি ১০০ জন মানুষকে হত্যা করেছি, আমি কি তাওবা করতে পারব?" তিনি বললেন, "অবশ্যই পারবে। তোমার উচিত এই খারাপ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া।"

আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে শুধু ক্ষমাই করলেন না, তার জন্য পুরো জমিনকে বদলে দিলেন। সে ব্যক্তি খারাপ এলাকা ছেড়ে নতুন এক শহরে যাওয়ার পথে দুই এলাকার মাঝে এক জায়গায় মারা গেল। তখন সৎ আত্মা গ্রহণকারী ফেরেশতা ও অসৎ আত্মা গ্রহণকারী ফেরেশতার মাঝে ঝগড়া বেঁধে গেল। আর আল্লাহ তখন তার সম্মানে জমিনকে এমনভাবে সংকুচিত করে দিলেন যেন সৎ আত্মা গ্রহণকারী ফেরেশতারা তাকে গ্রহণ করতে পারেন। যে লোকটি ১০০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করল এবং অতঃপর তাওবা করল, তার জন্য আল্লাহ জমিনকে সংকুচিত করে দিলেন। তাহলে সেই রব আপনার জন্য কী করবেন!

যখন আপনি হতাশা অনুভব করবেন এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাশ হয়ে পড়বেন, তখন আসহাবুল উখদুদের ঘটনা স্মরণ করুন। এটি ছিল এক গণহত্যার কাহিনী, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কালিমায় বিশ্বাস করত তাদের হত্যা করা হয়েছিল। তারা এক সৎকর্মশীল বালককে হত্যা করেছিল যে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, এটি ছিল নির্বিচারে সংঘটিত একটি গণহত্যা। আল্লাহ হত্যাকারীদের ব্যাপারে কী বলেছেন?

> **"যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।" (সূরাহ বুরুজ: আয়াত ১০)**

আল্লাহ বলেছেন—যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি। এই কথার অর্থ কী? অর্থ হলো, তারা যদি গণহত্যা চালানোর পরে তাদের অপরাধের জন্য তাওবা করত তাহলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন—এরপর তারা তাওবা করেনি।

ছোট-বড় যেকোনো গুনাহ থেকেই আপনি তাওবা করবেন এবং আল্লাহ সব মাফ করে দেবেন। আর রামাদানই তাওবার জন্য শ্রেষ্ঠ সময়। তাই এখনই শুরু করুন। প্রথমত, অতীতের জন্য অনুতপ্ত হোন। প্রতিজ্ঞা করুন যে, ঐ কাজ আর করবেন না এবং বলুন 'আস্তাগফিরুল্লাহ'। যদি এর সাথে অন্য মানুষের হক জড়িত থাকে তাহলে সরাসরি তাদের সেটি ফিরিয়ে দিন—না হলে পরোক্ষভাবে। যদি মনে হয় এর কারণে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে তাহলে তাদের জন্য দু'আ করুন, তাদের নামে দান-সাদাকা করুন অথবা ভালো কাজে তাদের নাম উল্লেখ করুন। খুবই সহজ।

আপনি আন্তরিকভাবে এই কাজ করুন, আল্লাহর কসম, আল-গাফুর, আর-রাহীম তা গ্রহণ করবেন।

> **"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং**

আল্লাহ এমন এক সময়ে অবতরণ করেন, যখন সবাই গুনাহ করছে না হয় ঘুমোচ্ছে। তারা হারাম কিছু দেখছে বা হারাম কিছু পান করছে, অথবা তারা গভীর ঘুমে অচেতন। পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকের অবস্থায়ই এমন। আপনি তাদের মতো হয়ে যান যারা এই সময়টায় আল্লাহর কাছে কান্না করে, ভিক্ষা চায় এবং অনুনয় বিনয় করে।

পরিশেষে, যখন কেউ কোনো সৎ কাজ করে, তখন সে সেটির প্রভাব দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জায়গায় দেখতে পাবে। দুনিয়াতে আপনি যা পাবেন তা বোনাস, কিন্তু মূল লক্ষ্য হচ্ছে আখিরাতে।

> **"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো (দুনিয়াতে) এবং প্রতিদানে তাদেরকে (জান্নাতে) তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দিবো যা তারা করত।" (সূরাহ নাহল: আয়াত ৯৭)**

এর বিপরীতটাও সত্য। ইবনু আবি মুলাইকাহ বলেছেন, যখনই আসমা (ﷺ)-এর মাথা ব্যথা হত, তিনি মাথা চেপে ধরে বলতেন, "নিশ্চয়ই এটা আমার কোনো গুনাহের কারণে হয়েছে এবং আল্লাহ এর অধিকাংশই মাফ করে দিয়েছেন।"

এই বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন,

> **"তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।" (সূরাহ শূরা: আয়াত ৩০)**

তিনি তো ফিরিয়ে দেবেন না

সূরাহ্ বাক্বারায় রামাদান নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি আয়াত আছে।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যেভাবে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী (তাকওয়া) অর্জন করতে পারো।" (সূরাহ্ বাক্বারা: আয়াত ১৮৩)

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো,

"(রোজা রাখতে হবে) কতগুলো নির্দিষ্ট দিনে।" (সূরাহ্ বাক্বারা: আয়াত ১৮৪)

তৃতীয় আয়াতটি হলো,

"রামাদানই হলো সেই মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (সূরাহ্ বাক্বারা: আয়াত ১৮৫)

পরপর তিনটি আয়াত সরাসরি রামাদানের ব্যাপারে। কিন্তু চতুর্থ আয়াতটি হঠাৎ করেই ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। এখানে প্রসঙ্গ হলো দু'আ।

"আর (হে মুহাম্মাদ), আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, (তখন বলে দিন) নিশ্চয় আমি (আমার জ্ঞানের মাধ্যমে) রয়েছি সন্নিকটে। আমি দু'আকারীর দু'আর জবাব দিই যখন তারা (কাউকে আমার সাথে শরিক না করে) আমার কাছে দু'আ করে।" (সূরাহ্ বাক্বারা: আয়াত ১৮৬)

আবার পঞ্চম আয়াতে সাওমের নিয়মাবলী নিয়ে কথা শুরু হয়েছে,

"রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।" (সূরাহ্ বাক্বারা: আয়াত ১৮৭)

প্রশ্ন হচ্ছে, সাওম প্রসঙ্গে পরপর কয়েকটা আয়াতের মাঝে হঠাৎ দু'আর ব্যাপারটা কেন আসলো? অপ্রাসঙ্গিক একটি আয়াত আল্লাহ্ এখানে কেন বসাবেন? আসলেই কি এটা অপ্রাসঙ্গিক? না! কুরআনের সবকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাওমের আলোচনায় দু'আ সংক্রান্ত আয়াত আসার কারণ হলো আপনাকে রামাদানে দু'আর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, আপনাকে জানানো যে—রামাদান হলো দু'আর মাস।

এমন কিছু সময় আছে যখন দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রামাদান এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সময়। চতুর্থ আয়াতটি আবার লক্ষ করুন,

"আর (হে মুহাম্মাদ সাঃ), আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, (তখন বলে দিন) নিশ্চয় আমি (আমার জ্ঞানের মাধ্যমে) রয়েছি সন্নিকটে। আমি দু'আকারীর দু'আর জবাব দিই যখন তারা (কাউকে আমার সাথে শরিক না করে) আমার কাছে দু'আ করে।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৮৬)

'এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে' আর 'এবং যখন তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে' কথাটা কুরআনে ১৪ বার আছে। ইয়াস'আলুনাকা আছে ১৩ বার এবং ওয়া ইযা ইয়াস'আলুনাকা আছে ১ বার। প্রতিবার যখন আল্লাহ বলেন 'এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে', তারপরই লক্ষ্য করবেন 'ক্বুল' (তাদের বলে দাও) কথাটা আছে। ব্যতিক্রম কেবল এই আয়াতে, এখানে দু'আর কথা বলা হয়েছে। সব জায়গায় ক্বুল আছে, খালি দু'আর জায়গাটা ছাড়া। "যদি তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে" তারপর কোনো ক্বুল (বলে দাও) নেই। এর মাধ্যমে আপনার কাছে বিশুদ্ধ তাওহীদের একটি বার্তা দেওয়া হচ্ছে, সেটি হলো আল্লাহর সাথে আপনার সরাসরি সম্পর্ক। আপনার এবং আল্লাহর মাঝে না আছে কোনো বার্তাবাহক, না কোনো ওলী, এমনকি নবী (ﷺ)-ও নন। দু'আ সরাসরি আপনার ও আল্লাহর মাঝে। এটিই পূর্ণাঙ্গ এবং বিশুদ্ধ তাওহীদ।

দু'আর বিশেষ সময়

সকল সময়ে সকল পরিস্থিতিতে দু'আর জবাব দেওয়া হয়। আল্লাহ সকল সময়ে (দিন, রাত, সন্ধ্যা) ও সকল অবস্থায় (দাঁড়ানো, বসা, শোয়া), ওযু সহকারে কিংবা ওযু ছাড়া বান্দার দু'আর জবাব দেন। কিন্তু এমন কিছু সময় ও পরিস্থিতি আছে, যখন দু'আ কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দু'আ কবুলের সেই ক্ষণগুলো আমাদের জেনে নেওয়া উচিত, যাতে দু'আর এই মাসে আমাদের দু'আগুলো যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়। শুধু এ মাসেই নয়, বছরের যেকোনো সময়, যেকোনো দিনে আমরা যেন আল্লাহর দরবারে দু'আ পৌঁছানোর ব্যাপারে গাফিলতি না করি।

দু'আ কবুলের বিশেষ সময়গুলো খুঁজুন। যেমন—আরাফাহর দিন, রামাদান মাস, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, বৃষ্টির সময়, ইকামাতের পর, আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় এবং সাওম পালনকারীর দু'আ। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন—কেউ কি আছে যার কিছু প্রয়োজন? কেউ কি আছে—যে ক্ষমা পেতে চায়? এই সময় ও পরিস্থিতিগুলো যত একসাথে করতে পারা যায়, দু'আ কবুলের সম্ভাবনা তত বেড়ে যায় ইনশাআল্লাহ। উদাহরণস্বরূপ, রামাদান মাসে, লাইলাতুল ক্বদরে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সেজদারত অবস্থায় করা দু'আ। কত চমৎকার এক সুযোগ! বিশেষ সময় আর বিশেষ পরিস্থিতি। এমন দু'আ কি বৃথা যেতে পারে?

দু'আর আনুষ্ঠানিকতা

আপনি যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থায় দু'আ করতে পারেন। কিন্তু মাঝেমাঝে আনুষ্ঠানিকতাগুলোও পালন করুন। যেমন- মাঝেমাঝে ওযু করে দু'আর পরিকল্পনা করুন। ব্যাপারটাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা হিসেবে চিন্তা করুন। ওযু করে দুই রাকাত সালাত পড়ে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করুন। সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে রাসূল (ﷺ) একবার হাত এত উঁচু করেছিলেন যে —তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃশ্যমান হয়ে গিয়েছিল। কখনো তিনি বুক পর্যন্ত হাত উঁচু করেছেন, কখনো আঙুল তুলে দু'আ করেছেন। আর হ্যাঁ, আঙুল তুলে দু'আ করায় কোনো সমস্যা নেই।

কেউ যখন দু'আ করার জন্য হাত তোলে, তখন চিরঞ্জীব ও সম্মানিত মহান আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। তিনি কখনোই আপনাকে শুন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন না।

আবু দারদা (رضي الله عنه) বলতেন, "তোমার হাতগুলো শিকলবন্দী হয়ে যাওয়ার আগেই সেগুলো আল্লাহর কাছে উঁচু করো।"

অতি উচ্চ ও অতি নিম্ন স্বরে দু'আ না করা

বুখারি ও মুসলিমে এসেছে একবার সাহাবিরা যখন জোরে শব্দ করে দু'আ করলেন, নবীজি (ﷺ) বললেন "তোমরা তো কোনো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না।"[২৪] একইভাবে কুরআনে আছে

> **"সালাতে তোমার কণ্ঠস্বর অতি উচ্চ বা অতি নিচু কোরো না, বরং মধ্যবর্তী পন্থা অনুসরণ করো।" (সূরাহ বনী ইসরাইল: আয়াত ১১০)**
>
> **"বিনয় ও গোপনীয়তা সহকারে তোমাদের রবকে ডাকো।" (সূরাহ আল-আরাফ: আয়াত ৫৫)**

এই আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে বেশি জোরে বা বেশি আস্তে না বলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে। এটি দু'আর আদবসমূহের একটি। যাকারিয়া (عليه السلام)-এর কণ্ঠস্বর মধ্যম পর্যায়ে রাখার কারণে আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন

---

[২৪] মুসলিম: ৭০৩৭

"যখন সে তার রব্বকে ডাকলো নিভৃতে।" (সূরাহ মারইয়াম: আয়াত ৩)

ছন্দে ছন্দে দু'আ না করা

দু'আকে একেবারে কবিতার মতো করে ফেলা উচিত নয়। স্বাভাবিকভাবে এমনটা হয়ে গেলে সমস্যা নেই, কিন্তু ইচ্ছা করে এমনটা করা যাবে না। বাংলা বা ইংরেজিতে এরকম ছন্দ মেলানোর ব্যাপারটা না থাকলেও, আরবিতে এরকম দেখা যায়। আরবিতে একে বলে সাজা', যখন ছন্দ মিলিয়ে দু'আ করার বাড়াবাড়ি রকম চেষ্টা করা হয়। আল্লাহ বলেন

> **"তোমার রব্বকে বিনয় সহকারে নিভৃতে ডাকো। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরাহ আল-আরাফ: আয়াত ৫৫)**

দু'আর ক্ষেত্রে দৃঢ়চেতা হওয়া

আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করবেন—এ কথা জেনে দৃঢ় সংকল্প সহকারে দু'আ করুন। সুনান আত-তিরমিযিতে আছে,

> "আল্লাহ তোমার দু'আর জবাব দেবেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আল্লাহকে ডাকো। তবে সে সাথে এটাও জেনে রাখো যে, গাফেল অন্তরের দু'আর জবাব দেওয়া হয় না।"[২৫]

যখন দু'আ করবেন, দৃঢ় থাকবেন এবং মন দিয়ে দু'আ করবেন। নিশ্চিত থাকবেন এই ভেবে যে—আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করবেন। এমনভাবে দু'আ করবেন না যে, 'হে আল্লাহ আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন।' বরং বলবেন, 'হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।' দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে—আল্লাহ আপনাকে মাফ করবেন। দু'আ কবুলের ব্যাপারে মনে দ্বিধা রাখবেন না। আল্লাহ শয়তানের দু'আ কবুল করেছেন, আর তিনি আপনার দু'আ কবুল করবেন না? শয়তান দু'আ করেছিল তাকে যেন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়।

> **"(ইবলীস) বলল, "আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (আল্লাহ) বললেন, "তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরাহ আরাফ: আয়াত ১৪-১৫)**

আপনি তো শয়তানের চেয়ে নিকৃষ্ট নন। আমরা যা-ই করি না কেন, শয়তানের চেয়ে আমরা বেশি খারাপ নই—যদিও আমাদের পাহাড়সম পাপ থাকে। যে আল্লাহ শয়তানের দু'আ ফিরিয়ে দেননি, তিনি কি আমাদের দু'আ ফিরিয়ে দেবেন?

---

[২৫] তিরমিযি: ৩৪৭৯

এমনকি অবিশ্বাসীরাও (মুশরিক) একটা সময় সৎভাবে আল্লাহকে ডাকে, যাতে তিনি সাড়া দেন।

> **"আর যখন তারা কোনো জলযানে আরোহণ করে, তারা আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন নিরাপদে তাদের স্থলে পৌঁছে দেন, তারা তাঁর সাথে অন্যদের শরিক করতে থাকে।" (সূরাহ আনকাবুত: আয়াত ৬৫)**

মহাসাগরের স্রোত ও বাতাস যখন তাদের ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হয়, তারা এক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। শির্ক পরিত্যাগ করে কিছু সময়ের জন্য এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তারা আগেও আল্লাহর সাথে শির্ক করেছে, আর আল্লাহ জানেন যে তাদেরকে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেওয়ার পর আবার তারা এ কাজ করবে। তারপরও যখন তারা ইখলাসের সহিত আল্লাহকে কিছু সময়ের জন্য ডেকেছে—আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেছেন। তিনি যদি অল্প সময়ের জন্য খালেসভাবে দু'আ করা মুশরিকদের দু'আ কবুল করে থাকেন, তাহলে কি তাওহীদের অনুসারীদের দু'আ তিনি ফিরিয়ে দেবেন?

দু'আতে লেগে থাকুন

ক্রমাগত দু'আ করতে থাকুন। যখন দু'আ করবেন, বারবার বারবার করবেন, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি ও ভিক্ষা করবেন।

সহিহ মুসলিমে আছে, নবীজি (ﷺ) কোনো দু'আ তিনবার করে করতেন। ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন যে, "তিনি তিনবার করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন।" দু'আ এভাবেই করা উচিত এবং নিয়মিত করা উচিত। রাতারাতি দু'আ কবুল না হয়ে গেলেও হাল ছেড়ে দেবেন না। বরং দু'আর পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিন। কখনো এমনটা বলবেন না যে—আমি এত দু'আ করলাম অথচ আল্লাহ কবুল করলেন না। এভাবে করলে আপনি নিজেই নিজের দু'আকে ধ্বংস করে ফেলবেন।

বুখারি ও মুসলিমে আছে, "তোমাদের কেউ দু'আ করলে তার জবাব ততক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হতে থাকে যতক্ষণ না সে অধৈর্য হয়ে বলে, 'আমি দু'আ করেছি কিন্তু তা কবুল হলো না।'"[২৬] সালাফদের মাঝে দেখা যায়, কেউ ২০ বছর ধরে একটা জিনিস চেয়ে তা পাননি, তারপরও তাঁরা আশা ছাড়েননি, এরপরও তাঁরা দু'আ করে গেছেন এই আশায় যে—একদিন আল্লাহ তাঁদের দু'আ কবুল করবেন।

---

[২৬] বুখারি: ৬৩৪০, মুসলিম: ৭১১০

দু'আর শুরু, মধ্যভাগ ও শেষে নবীজি (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পড়ুন

দু'আর শুরু ও শেষে নবী (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করুন এবং দু'আর মাঝেও কোনো দরূদ পাঠ করুন। আবু সুলায়মান আদ-দারানি একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পড়ে দু'আ শুরু করুন এবং দরূদ পড়ে দু'আ শেষ করুন। কেন? নবীর প্রতি দরূদ পড়লে তা এমনিই কবুল হয়। আর আল্লাহ কোনো দু'আর শুরু ও শেষের অংশ কবুল করে মাঝের অংশ প্রত্যাখ্যান করবেন—এমনটি হতে পারে না।

সবসময় দু'আর শুরু, মধ্যভাগ ও শেষে নবীজি (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করুন। সহিহ তিরমিযি ও তাফসীর ইবনু কাসিরে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে যে, উমার (رضي الله عنه) বলেন, আসমান ও জমিনের মাঝে দু'আ আটকে থাকে, নবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ না পড়া পর্যন্ত সেই দু'আ আসমানে পৌঁছে না। এটি অবশ্য উমার (رضي الله عنه)-এর ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে। কারণ তিনি বলেননি যে, রাসূল (ﷺ) এটি বলেছেন। তবে এ ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপরে আরোপযোগ্য, কারণ এগুলো দ্বীন সংশ্লিষ্ট বিষয়। এটা হতে পারে না যে, দ্বীনের ব্যাপারে উমার (رضي الله عنه)-একটা কথা বানিয়ে নিয়ে আসবেন। এই ধরনের কথা বা হাদিসের বিষয়ে এটাই বিধান।

শুআবুল ঈমানে ইমাম বায়হাকি একই রকম একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন আলী (رضي الله عنه)-এর বরাতে। তিনি বলেছেন, আলী (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না করলে সকল দু'আ কবুল হয় না। এই একই হাদিস আলী (رضي الله عنه)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন বাক্বী ইবনু মাখলাদ এবং সেটাকে মারফু হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ, বাক্বী ইবনু মাখলাদের মতে এই উক্তিটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর। বাক্বী ইবনু মাখলাদ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এক কয়েদির জন্য দু'আ করেছিলেন এবং সেই দু'আ কবুল হয়েছিল। তাঁর দু'আয় সেই কয়েদির শিকলগুলো একটির পর একটি ভেঙে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে মুক্ত হয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয়—নিশ্চয়ই তোমার মুক্তির জন্য কেউ একজন দু'আ করছিল।

অন্তরের আমল

সর্বশেষ বিষয় হলো অন্তরের আমল। যেমন- দু'আর আগে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করুন। অন্যের হক আদায় করুন, পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হোন, সাদাকা করুন আর আশ্বস্ত থাকুন যে— আল্লাহ আপনাকে হতাশ করবেন না। তিনি বলেছেন চাও— তাহলে আমি দেব। তার মানে তিনি দেবেনই।

ইবনু মুবারক (ﷺ) বলেন, “আমি একবার মদীনায় গেলাম। তখন সেখানে খরা চলছিল। লোকেরা বাইরে এসে লম্বা সময়ের জন্য ইস্তিসকা (বৃষ্টির জন্য দু’আ) করল। একদিন আমি মসজিদে গিয়ে এক কালো লোকের পাশে বসলাম, তার পরনে ছিল খাশ কাপড় (উট বা বকরির পশম থেকে তৈরি এক ধরনের খসখসে কাপড়)। লোকেরা অনেক আগেই চলে গেছে, তাদের দু’আ কবুল হয়নি। আমি মসজিদে এই কালো লোকটির পাশে বসা। তার কাপড় তার কোমর ও কাঁধে জড়ানো ছিল। তাকে বলতে শুনলাম, হে আল্লাহ! আপনি পাপীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য লোকেদের উপর বৃষ্টি বন্ধ রেখেছেন। ইয়া হালীম ইয়া আল্লাহ, ইয়া হালীম ইয়া আল্লাহ, ইয়া হালীম ইয়া আল্লাহ, যার বান্দারা তাঁর কাছ থেকে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা করে না, তাদেরকে বৃষ্টি দিন। তাদেরকে এখন বৃষ্টি দিন, তাদেরকে এখন বৃষ্টি দিন, এখন, এখন! তিনি বলছিলেন, আস-সা’আহ আস-সা’আহ! সে এভাবে দু’আ করতেই থাকল—যতক্ষণ না চারদিক থেকে মেঘ এসে গর্জন সহকারে বৃষ্টি হতে শুরু করল। বড় বড় আলিমরা কিছু সময়ের ইস্তিসকা করলেন। ধনী-গরীব, নেতা-সাধারণ লোকজন—সবাই দু’আ করেছিল। কিন্তু একজন অবহেলিত লোক, যার পরনে ছিল সবচেয়ে নিম্ন মানের পোশাক, সে যখন দু’আর জন্য হাত তুলল, আল্লাহ তা কবুল করে নিলেন।

মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে মাজলুম মুসলিমদের প্রতি দায়িত্বে অবহেলার জন্য আপনিও দায়ী। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, প্রিয় মানুষদের জন্য দু’আ তো করবেনই—সাথে নির্যাতিত অবহেলিত মুসলিমদেরও প্রতিদিন আপনার দু’আতে অন্তর্ভুক্ত করবেন, যাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে আপনি অন্তত বলতে পারেন যে, হে আল্লাহ! আমি তাদের জন্য দু’আ করেছিলাম।

এই ঘটনার পর ইবনু মুবারক দেখা করতে যান ফুদাইল ইবনু ইয়াদের সাথে। তাঁরা উভয়ই ছিলেন বড় ইমাম। ফুদাইল ইবনু ইয়াদ ইবনু মুবারককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কী হয়েছে, ইবনু মুবারক?” ইবনু মুবারক জবাব দিলেন, “এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোতে লোকেরা আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে।” এরপর তিনি তাঁর কাছে সেই কালো লোকটির পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করলেন। তাঁরা উভয়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে—কীভাবে মানুষ গোপনে ইবাদাত করে তাঁদেরকে হারিয়ে দিচ্ছে (নিজেদের দু’আ কবুল করিয়ে নেয়ার মাধ্যমে)। এ ঘটনা শুনে ফুদাইল ইবনু ইয়াদ চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

এক ভাই কিছুদিন আগে আমাকে একটি ভিডিও দেখিয়েছিল। সেখানে একদল মুসলিম একটি সেলে বন্দী, আর অহংকারে বুক ফোলানো এক বিচারক রায় দিল যে তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। তাঁরাও হেঁটে বের হলেন, সেও হেঁটে বের হল। তাঁরা কারাগারে ঢুকলেন আর সে চলে গেল। দিন যেতে থাকল। ভিডিওটাতে মূলত বন্দীদের একজন কথা বলছিল। তিনি বললেন, “আমরা খুব মন থেকে আল্লাহর

কাছে দু'আ করতে থাকলাম যেন তিনি আমাদের মর্যাদার সাথে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। আর আমরা লাগাতার দু'আ করে গেলাম।" আপনি যদি একাকী কারাপ্রকোষ্ঠে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যান, তাহলে দেখবেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দু'আ আসছে। তিনি বললেন, "আমরা ভাবলাম কেউ একজন এসে হয়তো একদিন আমাদের কারাগার খুঁড়ে বের করে নিয়ে যাবে, অথবা কারাগার বিস্ফারিত হয়ে খুলে যাবে, অথবা ভেঙে যাবে, কিংবা ভূমিকম্প হবে। আমরা জানতাম না এটা কীভাবে হবে, তবে আমরা জানতাম যে, একদিন না একদিন আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করবেন। সেটাই হলো, হঠাৎ একদিন কেউ একজন চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল, "তোমরা মুক্ত। পৃথিবীটা বদলে গেছে, এক দশকের জন্য সেই দেশের নেতা চলে গেছে আর তোমরা মুক্ত।"

রামাদানের এই মাসে আপনার দু'আর ইবাদাতটি চালু করুন। যদি দু'আ করেন, তাহলে অন্যান্য সব ফযিলত পাওয়ার পাশাপাশি কেবল দু'আ করার জন্যও সাওয়াব পাবেন। কেবল কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার করার কারণে যেমন আপনি সাওয়াব পেয়ে থাকেন, তেমনি শুধু দু'আ করার ফলেও আপনি সাওয়াব পাবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করবেন, সেই সাথে শুধু দু'আ করার কারণে সাওয়াবও পাবেন, কারণ সেটাও একটা ইবাদাত।[২৭]

তাই আল্লাহর কাছে চান, দু'আ করুন এবং তাঁর দিকে ফিরে যান। আল্লাহর দরজাগুলো কখনোই বন্ধ হয় না।

---

[২৭] তিরমিযি: ২৯৬৯, আবু দাউদ: ১৪৮১, ইবনু মাজাহ: ৩৮২৮

যে তীর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না

সূরাহ্ বাক্বারায় আল্লাহ্ তার বান্দাকে বলছেন,

> **"আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, আমি কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার ওপরই ঈমান আনা, আশা করা যায় তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।" (সূরাহ্ বাক্বারা: আয়াত ১৮৬)**

এটা মূলত দু'আর ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার অনুপ্রেরণা। আন্তরিক এবং একনিষ্ঠ দু'আ যে কতটা সুন্দর এবং শক্তিশালী হতে পারে, সেটা অনেক সময় হয়তো আমরা অনুভবই করতে পারি না। উমার (রা.) প্রায়ই বলতেন, "আমার দু'আ কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। বরং আমি চিন্তিত দু'আ করার তৌফিক পাব কি না সেটা নিয়ে—কীভাবে দু'আ করব সেটা নিয়ে।" বান্দা যখন আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে, সে মূলত তার চাওয়া-পাওয়া, দুঃখকষ্ট আর অভিযোগকে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থাপন করে এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌ই তখন সেটা দেখভাল করেন। আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম দেখভালকারী আর কে আছেন!

আপনি কি জানেন যে—কুরআন শুরু হয়েছে দু'আর মাধ্যমে এবং শেষও হয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করার মধ্য দিয়ে? এর শুরু হয়েছে আল-ফাতিহায় এবং আল ফাতিহা হলো কুরআনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, সুন্দর দু'আয় সাজানো সূরাহ্‌সমূহের একটি।

> **'তুমি আমাদের সরল পথের রাস্তা দেখাও।'। (সূরাহ্ ফাতিহা: আয়াত ০৬)**

এবং কুরআন শেষ হয়েছে সূরাহ্ নাস দিয়ে।

> **'বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার। মানুষের অধিপতির, মানুষের উপাস্যের, তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।' (সূরাহ্ নাস: আয়াত ১-৪)**

এভাবে কুরআন শুরু হয়েছে হিদায়াত চাওয়ার দু'আ দিয়ে এবং শেষ হয়েছে, ইবাদাতের সময়ে আপনার এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে যেসব চোর-ডাকাত ঢুকে পড়ে—

তাদের কাছ থেকে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে। আর এর মাঝের আয়াতগুলোতে রামাদান নিয়ে যে আয়াত রয়েছে সেটা হলো,

> **'আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, আমি কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার ওপরই ঈমান আনা, আশা করা যায় তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।' (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৮৬)**

আল-আউযাঈ (ﷺ) বলেছেন, একবার লোকজন বৃষ্টির জন্য সালাত (সালাতুল ইস্তিসকা) আদায় করতে সমবেত হলো এবং বিলাল ইবনু সা'দ সেখানে একটি বক্তব্য পেশ করলেন। সা'দ উঠে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা এবং মহিমা ঘোষণা করলেন, এরপর লোকেদের সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, "যারা এখানে জড়ো হয়েছ, তোমরা কি তোমাদের গুনাহর কথা স্বীকার করছ?"

সবাই জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "ও আল্লাহ! তারা যা বলেছে সে ব্যাপারে আপনি সাক্ষী।"

আল্লাহ বলেন,

> **"সৎ লোকের প্রতি কোনো প্রকার অভিযোগ নেই।" (সূরাহ আত-তাওবা: আয়াত ৯১)**

"আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমা কি তবে তাদের ছাড়া অন্য কারো জন্য হবে—যারা তাদের ভুল স্বীকার করে?"

"আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের ওপর রহম করুন।"

"আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের ওপর রহম করুন।"

"আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের ওপর রহম করুন।"

তিনি তাঁর হাত তুললেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত তিনি হাত নামালেন না।

যিনি অবিরাম বর্ষণসহ আকাশের দরজাগুলো খুলে দিতে পারেন, তিনি আপনাকে আপনার পছন্দমতো জীবনসঙ্গীও দিতে পারেন যদি আপনি তাঁর কাছে দু'আ করেন। যদি আপনি দু'আর মাধ্যমে চেয়ে নিতে জানেন। তিনি আপনার জীবনের হারানো শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন, যদি আপনি দু'আ করেন। আপনার দাম্পত্য জীবনের শান্তি হারিয়ে গেছে? এখনই আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। আপনার স্বামীর মনের উপর যতটা তার নিজের ক্ষমতা, মহান আল্লাহর ক্ষমতা কী তার মনের উপর তার থেকে বেশি নয়? আপনার স্ত্রীর মনের উপর আপনার স্ত্রীর চেয়ে মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ কী বেশি নয়?

'......জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান'। (সূরাহ আনফাল: আয়াত ২৪)

আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী ব্যাক্তিটি যে কেউ হতে পারে। এমনটা বলবেন না যে, "আমি তো অনেক গুনাহ করে ফেলেছি! আল্লাহ কি আমার দু'আ কবুল করবেন?" হ্যাঁ, আল্লাহ্ অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করবেন, তবে সেজন্য আপনাকে আপনার গুনাহ থেকে সরে আসতে হবে—সেই সাথে দু'আও করে যেতে হবে।

আতা আস সুলামী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল না। একদিন আমাদের নেতার আদেশ মতো আমরা সালাতুল ইস্তিসকা আদায় করতে গেলাম। যাওয়ার পথে সরু গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের সাথে আমাদের দেখা হলো। লোকটি আতা'কে চিনতে পারলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন এটাই কি কিয়ামাতের দিন? এটাই কি সেই দিন:

"সে কি জানে না যে কবরের ভেতর যা কিছু আছে যখন তা উত্থিত হবে?" (সূরাহ আদিয়াত: আয়াত ০৯)

মূলত সেদিন তিনি লোকজনের বিশাল সমাবেশ দেখতে পেয়েছিলেন যা তিনি আগে কখনও দেখেননি। আতা' বললেন, "না। আমরা বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে যাচ্ছি।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "দুনিয়ার মাঝে ডুবে থাকা হৃদয় নিয়ে, নাকি ঈমানদার হৃদয় নিয়ে?"

আতা' বললেন, "ইনশাআল্লাহ্ ঈমানদার হৃদয় নিয়ে।"

মসজিদে কেউ পৌঁছানোর আগে লোকটি আল্লাহর কাছে হাত তুললেন, আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন। আতা' বললেন, "এরপর আমাদের গন্তব্যে পৌঁছার আগেই বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল এবং বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল।"

সুতরাং আপনার হৃদয়ে যা আছে বলে ফেলুন, এই মাসে মনের ভেতর কোনো জড়তা পুষে রাখবেন না। এই বরকতময় সময়ে আল্লাহ্ নিশ্চয় আপনার দু'আ ফিরিয়ে দেবেন না।

এক লোক সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (ﷺ)-কে জোচ্চোর বলেছিল। সে বলেছিল তিনি এমন এক কাপুরুষ—যে জিহাদে অংশগ্রহণ করে না (মানে তিনি লোকজনকে জিহাদে পাঠাতেন, কিন্তু নিজে যেতেন না)। এবং তৃতীয় অভিযোগটা ছিলো তিনি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করেন না।

যদিও সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস একজন বড় মাপের সাহাবি ছিলেন, তবুও উমার (ﷺ) অভিযোগটিকে আমলে নিলেন এবং তিনি সেটা তদন্ত করলেন। সা'দ ইবনু

আবি ওয়াক্কাস তাঁর বিরুদ্ধে আনা এই জঘন্য মিথ্যা অভিযোগগুলো সহ্য করতে পারেননি। তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, "ও আল্লাহ! যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, যদি সে মিথ্যুক হয় এবং সে যদি এটা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে—তবে তুমি তাকে দীর্ঘ দারিদ্রের এক জীবন দাও এবং তাকে তুমি ফিতনাহর মুখে ঠেলে দাও।" এই হাদিসটির একজন রাবি (আবদুল মালিক ইবনু উমায়ের) বলেছেন, এরপর আমি যখন বৃদ্ধাবস্থায় লোকটিকে দেখেছি— তাকে অলিতে গলিতে মহিলাদের উত্যক্ত করতে এবং তাদের সাথে হারামে লিপ্ত থাকতে দেখেছি। যখন আমি তাকে তার এই অবস্থার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, সে উত্তর দিয়েছিল, "আমি একজন বৃদ্ধ যে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তার কারণ সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (ﷺ)-এর দু'আ আমাকে বিদ্ধ করেছে।"[২৮]

একবার বাগদাদের জণসাধারণ আল-মুতাসিমের কাছে গিয়েছিল অভিযোগ নিয়ে। মু'তাসিমের সেনাবাহিনীতে সে তুর্কী সৈন্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং তুর্কী সৈন্যেরা পুরো বাগদাদে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ছিল অনেক কঠোর প্রকৃতির এবং সাধারণ লোকজনকে প্রচুর নির্যাতন করত। বাগদাদের লোকজন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল-মুতাসিমের কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠাল। এই প্রতিনিধি ছিলেন একজন আলিম, ইমাম এবং শাইখ। যখন তিনি আল-মুতাসিমের কাছে গিয়ে বললেন, "আপনার সৈন্যদের দমন করুন, নয়তো আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" মুতাসিম সম্ভবত হেসেছিল এবং বলেছিল "তুমি আমার বিরুদ্ধে লড়তে চাও, অথচ আমার কাছে আশি হাজার সশস্ত্র সৈন্য আছে?" সে বলেছিল, "হ্যাঁ আমরা আপনার বিরুদ্ধে 'রাত্রি বেলার তীর' (তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহর কাছে দু'আ করে) দিয়ে লড়ব। আমাদের কাছে অন্য কোনো পথ নেই, এটাই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার এবং আমরা সেটা ব্যবহার করব।" যদিও আল-মুতাসিম একজন অত্যাচারী শাসক ছিল তবুও সে বলেছিল, "আমি এই ভয়ংকর তীরের মুখোমুখি হতে পারব না।" সে বাগদাদ থেকে (আজকে যা সামারা নামে পরিচিত) চলে গেল। মুতাসিম ছিল ঐসব জালিমদের মধ্যে অন্যতম যারা আহমাদ বিন হাম্বল (ﷺ)-কে অত্যাচার করেছিল। কিন্তু এত ক্ষমতা আর শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও মুতাসিম জানত, লোকেরা যখন তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখিয়েছে তার আর এমন কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই যা এই 'রাত্রি বেলার তীরের' পথ রোধ করতে পারবে। একজন শক্তিশালী জালিম বাদশাও বুঝত—আল্লাহর নিকট তার বান্দার দু'আ কত শক্তিশালী আর ধারালো এক অস্ত্র।

এই তীর অত্যাচার নির্যাতনের কত শত মেঘ আকাশ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, কত অত্যাচারীকে ধ্বংস করেছিল, এবং কত স্বেচ্ছাচারী শাসককে প্রতিহত করেছিল! এই

[২৮] বুখারি: ৭৫৫

মাস হলো আপনার সেই তীরে শাণ দেওয়ার মাস, এমন এক তীর—যা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

হাজ্জাজ কর্তৃক সাঈদ ইবনুল-মুসাইয়্যিবকে হত্যার খবর যখন হাসান আল-বাসরি (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছল, তিনি হাত তুললেন এবং হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করলেন। এই দু'আর ফল ছিল এই যে—হাজ্জাজ এর পরের দিনটি দেখার জন্য বেঁচে ছিল না।

সহিহ আল-জামিতে আনাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "মজলুমের দু'আকে ভয় করো, যদিও সে কাফির হয়। কারণ তার দু'আ এবং আল্লাহর মাঝে আর কোনো পর্দা থাকে না।" আর এটা হলো একজন কাফিরের ক্ষেত্রে, তাহলে কল্পনা করুন তো এমন একজন তাওহীদে বিশ্বাসীর কথা যার কপাল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নত হয়—তার দু'আর ফল কেমন হতে পারে!

আব্বাসী শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনু আঘলাব নামে আফ্রিকায় একজন নেতা ছিল। সে ছিলো একজন স্বৈরাচারী শাসক, অহংকারী ও খুব মন্দ স্বভাবের। তখনকার সময়ে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন হাফস ইবনু হুমাইদ। তিনি ইবনু আঘলাবের কাছে গেলেন এবং বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর, তোমার সৌন্দর্য এবং শক্তির ওপর একটু দয়া কর (সে তার শারীরিক শক্তি এবং ভালো চেহারার জন্য পরিচিত ছিল), অতিরিক্ত কর নেওয়া বন্ধ কর এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ চালাও।" এতে সে আরও বেশি দাম্ভিক হয়ে উঠল এবং কর আগের চেয়েও বাড়িয়ে দিল। হাফস ইবনু হুমাইদ লোকজনের কাছে ফিরে আসলেন এবং তাদের বললেন, "তার ব্যাপারে আমি হতাশ হয়ে গিয়েছি, কিন্তু আমি আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে হতাশ নই। আজকে ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত আমরা সবাই দু'আ করব। আজকে ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত নিজেদের জিহ্বার জড়তা দূর করে ফেল।" মানুষজন মসজিদে এবং তাদের নিজেদের বাড়িতে জড়ো হলো। সকলে ওযু করে সেদিন ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত দু'আ করল, "ও আল্লাহ! তুমি তার অত্যাচার বন্ধ করে দাও, তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও।"

হঠাৎ ইবনু আঘলাবের কানের নিচে টিউমার বা দাগের মতো হয়ে গেল এবং সে পরের পাঁচ দিনের মধ্যেই মারা গেল। এই পাঁচ দিনে তার গায়ের রঙ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে শরীর পঁচা গলা সাদা রঙ ধারণ করল। সে বেশ সুদর্শন এবং শক্তিশালী ছিল, কিন্তু আল্লাহ তার মৃত্যুর আগেই তার থেকে সেসব কেড়ে নিলেন।

যখন তালূত এবং জালূতের দুই বাহিনী পরস্পর সংঘর্ষের মুখোমুখি হলো, তারা কার দিকে ফিরেছিল?

'...হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ধৈর্য ধরার তাওফিক দান কর, দুশমনদের মোকাবেলায় আমাদের কদমগুলো দৃঢ় রাখো এবং কাফিরদের মোকাবেলায় তুমি

আমাদের সাহায্য কর। ' (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ২৫০)

তার ফলাফল কী ছিল?

"তাই তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পর্যুদস্ত করে দিল......।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ২৫১)

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (ﷺ) ৫৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং মুসলিম বিশ্ব তাঁর মৃত্যুর পর বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সন্তানেরা কিছু অংশ নিল এবং তাঁর ভাইয়েরা কিছু অংশ—সবাই নেতা হতে চাইছিল। মিশরের অংশ গিয়েছিল সালাহউদ্দীনের ছেলের কাছে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল জাহমিয়্যাহ (যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী অস্বীকার করেছিল এবং ক্বদরে বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পথভ্রষ্ট হয়েছিল) ফিরকার। তারা তাকে একদল হকপন্থী হাম্বলী আলিমদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করেছিল। এই আলিমরা ছিলেন সুন্নাহর অনুসারী এবং লোকজন তাদের দিকে ফিরছিল, আর জাহমিয়্যাহরা চাচ্ছিল লোকেরা তাদের দিকে আসুক। উলামাদের কাছে তাদের উৎখাত হবার খবর পৌঁছাল এবং আরও খবর গেল যে—তাদের এখনই চলে যেতে হবে। এই অবস্থায় দু'আ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না। সময়টা ছিল ৫৯৫ হিজরির মুহাররাম মাসের উনিশ তারিখ।

সালাহউদ্দীনের ছেলে অন্যান্য দিনের মতো শিকারের জন্য বের হয়ে গেল এবং যারা তাকে বিভ্রান্ত করেছিল তারা বেশ আনন্দিত হয়ে গিয়েছিল (অত্যাচারীরা সবসময় এমনই হয়)। তারা শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল এই মনে করে যে—সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি দল নিদ্রাহীন রজনীতে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করছিল। যখন সে মনের আনন্দে শিকার করছিল, হঠাৎই একটা নেকড়ে এসে তার ঘোড়াকে তাড়া করল এবং এতে করে ঘোড়াটি ভীত হয়ে পড়ল। এরপর ঘোড়াটি তাকে ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিল এবং সে সরাসরি নেকড়ের মুখে গিয়ে পড়ল। নেকড়েটি তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। যখন ঘটনাটি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল, সেই হকপন্থী হাম্বলী আলিমগণ পুরো শাম ও মিশরে ভীষণ শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করলেন।

'......তারা চক্রান্ত করছিল এবং আল্লাহও কৌশল করছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।' (সূরাহ আনফাল: আয়াত ৩০)

হাজার সৈন্যের চেয়েও মূল্যবান এক আঙুল

আল-হাফিয আব্দুল গনি আল-মাকদিসী ছিলেন হাদিসের একজন ইমাম। তিনি আমজনতা ও উলামা উভয়ের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং সকলে তাঁকে পছন্দও করত। তিনি ছিলেন সত্যবাদী আলিমদের একজন। তাঁর ছিল একটি কোমল হৃদয় আর আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বদা ক্রন্দনরত দুটি চোখ। তাঁর মতো হক আলিমদের বেশিরভাগ সময় শাসক শ্রেণী হিংসা আর ভয় করে থাকে। কারণ শাসকরা কোনো দিন হক আলিমদেরকে তাঁদের পথ থেকে টলাতে পারে না। শাসকগোষ্ঠী লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে পুতুল সদৃশ কিছু চাটুকার আর ভণ্ড আলিম তৈরি করে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য আর আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী কাজের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য। এরপরও হক আলিম খুঁজে পাওয়া যায়, যার হয়তো সারাদিন চলার মতো যথেষ্ট খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সাধারণ মানুষের অন্তরে তাঁর জন্য শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার অভাব থাকে না। ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো খুব বেশি মানুষ তাঁর পক্ষে থাকে না, তবে যারাই থাকে তারা বাতিলের অনুগত চাটুকারদের থেকে বেশি কার্যকরী।

৫৯৪ হিজরির জিলহজ্জ মাসের ২৪ তারিখ, দামাস্কাসের এক হালাকায় তিনি আকিদার উপর ক্লাস নিচ্ছিলেন। দুইজন লোক তাঁর ক্ষতি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। এরা ছিল আল-খতীব জিয়াউদ্দীন এবং আল কাযী ইবনু আল-জাক্কী, তারা শাসকের কাছে গিয়ে বলল যে, এই লোক অর্থাৎ আব্দুল গনি (রহ.) ভ্রান্ত। ফলে সেই শাসক আব্দুল গনি (রহ.) এবং অভিযোগকারীদের মধ্যে একটি বিতর্কের আয়োজন করল, বিতর্কে আব্দুল গনি (রহ.) জিতে গেলেন। এ ঘটনায় ঐ দুই আশ'আরি আরো রেগে গেল এবং তারা আবার শাসকের নিকটে গিয়ে তাকে প্ররোচিত করতে থাকল। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা থামল না যতক্ষণ না শাসক বিরক্ত হয়ে এই আদেশ দিল যে—“আবদুল গনী আল মাকদিসী—আপনি আমার দেশ ত্যাগ করুন।”

আব্দুল গনি (রহ.) চলে গেলেন, তবে যাবার আগে তিনি ওই দুই আশ'আরির উপর বদ-দু'আ করে গেলেন। আল কাযী ইবনু আয জাক্কী বিচারপতির দায়িত্বে ছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই সে বিচারপতি থেকে একজন পাগল লোকে পরিণত হলো—যে

হঠাৎ হঠাতই রাস্তাঘাটে আকস্মিক পাগলামি শুরু করত এবং দিন কয়েক পরেই সে মারা গেল। তার সেই সাথীরও একই পরিণতি হলো।

আল্লাহর কসম, এরকম ঘটনা প্রচুর আছে। তবে একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বলছি, যা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তখন আমি অল্পবয়সী কিশোর আর আমার বাবা এখানকার এক মসজিদে খুৎবা দিতেন। যুবক বয়সে এই মসজিদ তৈরির সময় তিনি সহায়তা করেছিলেন (যখন তিনি এদেশে প্রথম এসেছিলেন)। ১৯৮০ সালের দিকে খোমেনী এত বেশি জনপ্রিয় ছিল যে, তাকে ত্রাণকর্তার মতো মনে করা হতো। মানুষ ভাবত সে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে স্বাধীন করবে, ফিলিস্তিন মুক্ত করবে এবং আরও অনেক কিছু করবে। সুন্নাহর অনুসারীদের এমন একটি বাসস্থান খুঁজে পাওয়াও দুর্লভ ছিল যেখানে তার ছবি পাওয়া যেত না—আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সেসময় আমার বাবা পাকিস্তান থেকে একজন শাইখকে আমন্ত্রণ করেন, যার নাম ছিল ইহসান ইলাহি জহির। তিনি শিয়াদের মুখোশ খুলে দেয়ার মাধ্যমে সুন্নাহকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সম্ভবত শিয়ারাই তাঁকে আমাদের এখান থেকে যাওয়ার এক বছর পরে হত্যা করে ।

ইহসান ইলাহি জহির পাকিস্তানে যাওয়ার পর শিয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। কারণ শিয়ারা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তারা তাঁর ব্যাপারে খারাপ খারাপ কথা বলত। পরবর্তীতে মসজিদে সুন্নী দাবিদার একজন লোক একবার আম্মাজান আইশা (ﷺ)-কে নিয়ে মর্যাদাহানিকর মন্তব্য করল। ফলে আমার বাবা শিয়াদের প্রকৃত আকিদা প্রকাশ করার জন্য খুতবা দিলেন এবং আমার জানামতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটাই প্রথম ঘটনা, যখন শিয়াদের আকিদাকে কোনো মিম্বরে এভাবে উন্মোচিত করা হলো। আল্লাহ আমার বাবাকে আমলে পরিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন দান করুন। তিনি এটা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন, কারণ তখন সময়টা এমন ছিল যে—মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবে বলত, “আমি আগে সুন্নী ছিলাম, এখন আমি শিয়া।”

সেই খুতবায় আমার বাবা শিয়াদের সম্পর্কে যা বলেছেন, তাকে তখনকার এক নেতা ফিতনা হিসেবে আখ্যা দেয় এবং পরবর্তীতে সেই মসজিদ থেকেই আমার বাবাকে বহিষ্কার করে—যেটা আমার বাবাই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর ঐ নেতা সেই লোকেদেরই একজন ছিল—যাকে আমার বাবা মসজিদে নিয়ে এসেছিলেন। সে আরো ক্ষতি করতেই থাকল। একদিন যখন সে আমাদের এক মারাত্মক ক্ষতি করল, আমি আমার বাবাকে দু'আ করতে শুনলাম—আল্লাহ যেন তার চোখ অন্ধ করে দেন। ওই খুতবার কারণে এখনও আমার বাবার সেই মসজিদে কোনো খুতবা দেওয়ার অনুমতি নেই, অথচ ঐ মসজিদ আমার বাবাই নির্মাণ করেছিলেন।

এরপর সময় যেতে থাকল, আমরা সবাই যার যার মতো জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, আর একসময় ঐ লোকের কথাও ভুলে গেলাম।

পনেরো বছর পরে, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। আমি একটি কবরস্থানে ছিলাম, ওখানে আমার এক ছাত্রের মা'কে দাফন করা হচ্ছিল। আমি একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে কবরের বিষয়ে কথা বলছিলাম এবং সেখানে লোকদের ভিড় ছিল। এমন সময় কিছুদূর থেকে একজন অন্ধ লোক আসলো, একটি অল্পবয়স্ক ছেলে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল। কথা বলতে বলতে যখন তার উপর আমার চোখ পড়ল, আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম এবং রীতিমত ভাষা হারিয়ে ফেললাম। দাফন সম্পন্ন হবার পর আমি দ্রুত সেই লোকের কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিলাম। সে সালামের উত্তর দিয়ে আমার পরিচয় জানতে চাইল। আমি বললাম আমি শাইখ মূসার ছেলে এবং তিনি বললেন 'ওহ! আচ্ছা।' খুব সম্ভবত তার অতীত কৃতকর্মের কথা সে ভুলে গিয়েছিল। এরপর আরও কিছু হালকা কথাবার্তার পর সে চলে গেল, আমিও চলে আসলাম। আমি আমার বাবার কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, "আপনি জানেন আমি কাকে দেখেছি?" আমি আমার বাবাকে ঘটনাটা বললাম এবং তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। সেই লোকটির সাথে আমার দেখা হওয়ায় তিনি আসলে খুশি হয়েছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "সেই লোকটি যে অন্ধ হয়ে গেছে, তাতে কি আপনি অবাক হননি?" তিনি বললেন- "না, অবাক হবো কেন?" আমি বললাম আপনি এই লোকের বিরুদ্ধে একদিন বদ-দু'আ করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কখন?" পরবর্তীতে আমি তাঁকে বিস্তারিত মনে করিয়ে দিলাম এবং তিনি বললেন—"আল্লাহর কসম! তুমি ঠিক বলেছ।" তিনি স্মরণ করলেন সেই সময়কে—যখন সেই লোক আমাদের অনিষ্ট করেছিল এবং আরো কত কী করেছিল। অবশ্যই এরপর আমার বাবা তাকে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটা মুসলিম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন, যারা আমাদের ওই লোকের থেকেও বেশি ক্ষতি করেছিল। কিন্তু কথা হলো, অন্তর থেকে যে দু'আ বের হয়, তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায়। যদি আমার সঙ্গে কবরস্থানে তার দেখা না হতো, আমি হয়তো ভাবতাম সে যা করার তা করেছে, আমরা দু'আ করেছি, ব্যাস! কিন্তু দু'আ তীরের মতো আকাশে ভাসে—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই তীর লক্ষ্যভেদ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম না আসে। আর এই সময় কখন হবে, তা আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন না—সেটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

আপনার কি মনে হয় পৃথিবীতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে যা হচ্ছে, সবই ঘটনাক্রমে হচ্ছে? আল্লাহর কসম, সবকিছুর জন্য আন্তরিক দু'আ-ই যথেষ্ট। শুধুমাত্র সঠিক সময়ে কেউ আন্তরিকভাবে দু'আ করলে, কারো দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করলে সেটাই যেকোনো জাতির ধ্বংস ডেকে আনতে যথেষ্ট।

আশ-শাফি'ঈ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা দু'আ নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো, ফলে তোমাদের দু'আ বিফলে যায়, তোমরা জানো না দু'আয় কী আছে। শেষ রাতের দু'আ হলো এমন এক তীর—যা কখনোই লক্ষ্যচ্যুত হয় না।"

সিফাত আস-সাফওয়াহর দ্বিতীয় খণ্ড এবং সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা' এর ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত ঘটনা, কুতায়বাহ ইবনু মুসলিম আল বাহেলী এক দল সৈন্য নিয়ে খোরাসানে গিয়েছিলেন তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি হতচকিত হয়ে যান। কারণ তাঁর বিপক্ষদলীয় সেনাদল তাঁর সেনাদলের চেয়ে দশ গুণ বড়। এই অবস্থা ছিল খুবই ভীতিকর। তাই তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, "মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসী কোথায়? কোথায় মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসী?" ফলে সৈন্যরা ইবনু ওয়াসীকে খুঁজতে লাগল। একসময় তারা তাঁকে খুঁজে পেল এবং দেখল তিনি একটি বর্শায় হেলান দিয়ে আঙুল উঁচিয়ে রেখেছিলেন। একইসঙ্গে তিনি তাঁর সেই আঙুল আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এটা দেখে কুতায়বাহ বললেন "এখন আমরা অগ্রসর হতে পারি।" কুতায়বার আসলে এতটুকুই জানার ছিল যে, মুহাম্মদ ইবনু ওয়াসী দু'আ করেছে কি না। একারণে তিনি বার বার মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসীর খোঁজ করছিলেন। তিনি বললেন, "মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসীর আঙুল আমার কাছে এক হাজার শক্তিশালী সৈন্যের হাতে থাকা এক হাজার তরবারীর থেকেও অধিক প্রিয়। ওই ছোট আঙুলটি এক হাজার সৈন্যের থেকেও বেশি শক্তিশালী। হতে পারে ওই আঙুলটি রক্ত-শিরা আর হাড়ের তৈরি, কিন্তু যখন সেটা আল্লাহর সাথে দু'আয় সংযুক্ত হয়, তখন সেটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।" বিজয়ের পর কুতায়বা মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসীর কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, তিনি তখন আঙুল উঁচিয়ে কী করছিলেন। তিনি বললেন, "আমি সংযোগ স্থাপন করছিলাম।" তিনি অবশ্যই সংযোগ স্থাপন করছিলেন, তবে সেটা দুনিয়ার কোনো সংযোগ নয়—সেটা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর বান্দার মধ্যকার সংযোগ।

রামাদান হচ্ছে দু'আর মৌসুম। উম্মাহর জন্য বা নিজের জন্য, যার জন্যেই যে দু'আ করতে আপনার মন চায়—সেটা এখনই করে ফেলুন। আর আপনার ভাইদের মধ্যে যারা অত্যাচারিত এবং পীড়িত, দু'আ করার সময় তাদের কথা ভুলে যাবেন না। আর আদম সন্তানদের কাছে কিছু চাইবেন না। আদম সন্তান তো মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। তাঁর কাছেই চান—যিনি তাঁর দরজা কখনো আটকান না। আল্লাহর কাছে না চাইলে তিনি রেগে যান, আর মানুষ রাগ করে যখন তার কাছে কিছু চাওয়া হয়।

"আল্লাহ তো মহত্তম প্রকৃতির অধিকারী...।" (সূরাহ নাহল: আয়াত ৬০)

হারিয়ে যাওয়া ইবাদাতগুলো পুনরুজ্জীবিত করুন

আল্লাহ্‌র সাথে যে ব্যবসা করতে চায়, তার সবসময় ফিকির থাকবে কী করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। বান্দার ইবাদাত নিজেই আল্লাহর সাথে এক রকমের ব্যবসায়িক লেনদেন। কুরআনে এরকমটাই বলা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন,

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।" (সূরাহ ফাতির: আয়াত ২৯)

কুরআন তিলাওয়াত করা, সালাত পড়া, প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করা—এ সবকিছুই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে উপরের আয়াতে যে বলা হয়েছে "তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না" —এর মানে কী? আল্লাহ একে এমন ব্যবসায়িক মুনাফা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যা কখনো ধ্বংস হবে না, যা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। এতে কোনো লস নেই, বরং দুদিকেই লাভ।

এটা বেশ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বেশিরভাগ লোক কোনো এক ধরনের ইবাদাতে আটকে যায় আর এর বাইরে অন্য কোনো ইবাদাত করে না। ফলে সময়ের সাথে সাথে অনেক ইবাদাত একসময় অপরিচিত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে। এমন অপরিচিত হয়ে পড়া ইবাদাতের তালিকা বেশ লম্বা। তবে এর মধ্যে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো,

ফজরের আগে ইস্তিগফার

প্রথমটি হলো ফজরের (আযানের) আগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া (ইস্তিগফার করা)। এটি তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ থেকে ভিন্ন ধরনের ইবাদাত। আর ইবাদাত তো এটাই যে—বান্দা বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করবে। আল্লাহ বলেন,

"আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও

আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ” (সূরাহ আলে ইমরানঃ আয়াত ১৫-১৭)

আয়াতের শেষে আল্লাহ্ বলেন “এবং যারা রাতের শেষ ভাগে ইস্তিগফার করে।”

‘সাহার’ হলো রাতের শেষাংশ—ঠিক ফজরের আগের সময়। এজন্য সুহুরকে সুহুর বলা হয়—কারণ তা রাতের শেষে করা হয়। কিয়ামুল লাইল, কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির আযকারের পর আপনি হয়তো এখন পরিবারের সাথে সেহরি করার জন্য প্রস্তুত। এর মধ্যেই এসব থেকে একটু সরে গিয়ে ফজরের ঠিক আগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এর ফযিলত এত বেশি যে, আপনার উপর এই আয়াত প্রযোজ্য হবে— “এবং যারা রাতের শেষ ভাগে ইস্তিগফার করে।”

রামাদান হলো আরো কিছু নতুন ইবাদাত শুরু করা ও নিজের উন্নতি ঘটানোর এক ঈমানী থেরাপি। ধীরে ধীরে এটা শুরু করুন। ফজরের তিন বা পাঁচ মিনিট আগে ইস্তিগফারের জন্য বসে পড়ুন। আবার এই কথা শুনেই অতি উৎসাহী হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এ কাজ করতে যাবেন না। কারণ এটা শয়তানের একটা চাল হতে পারে। কেউ হয়তো একটা ইবাদাতের ফযিলত শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ল, শয়তান তখন তাকে এই কাজে দীর্ঘক্ষণ লাগিয়ে রেখে ইবাদাতের প্রতি তার সব শক্তি আর আগ্রহ শেষ করে ফেলে। ফলে সে এক রাত ইবাদাত করার পরেই সেই ইবাদাত ছেড়ে দেয়। ইবাদাত করা হলো নতুন গাড়ি কেনার মতো। দোকানদার আপনাকে বলে দেবে আস্তে আস্তে ইঞ্জিনের জড়তা কাটাতে। শুরুতেই সত্তর মাইল বেগে চালাতে শুরু করলে হবে না। আস্তে আস্তে শুরু করতে হবে। এক দিনে অনেক ইবাদাত করে পরদিন থেকে তা ছেড়ে দেওয়ার চাইতে নিয়মিত অল্প অল্প ইবাদাত করাই উত্তম।

সেহরির সময় অনেকেই হয়তো খাবার টেবিলে বসে অর্থহীন কথাবার্তা বলছে। এমন আলোচনা করছে যাতে বরং পাপের ভাগীদার হতে হয়। আপনি এসব আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ইস্তিগফারে ব্যস্ত হয়ে যান। সত্তর থেকে একশ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ুন—যেভাবে রাসূল (ﷺ) পড়তেন। অথবা অন্য যেকোনোভাবে ইস্তিগফার করুন। আর এটাই হবে আপনার জীবনে এক নতুন ইবাদাতের সূচনা।

যেকোনো সময়েই ইস্তিগফার করা যায়। কিন্তু এই সময়টার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। এটা করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারেন—যাদের প্রশংসা আল্লাহ কুরআনে করেছেন। ইনশাআল্লাহ এই আমলটির মাধ্যমে আপনি আল্লাহর ক্ষমা পেয়ে যাবেন।

আল্লাহ বলেছেন,

“তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল।” (সূরাহ নূহঃ আয়াত ১০)

যারা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আপনার যদি আর্থিক সমস্যা থাকে, যদি নিঃসন্তান দম্পতি হয়ে থাকেন, ইস্তিগফার হলো এ সবকিছুর ঔষধ—কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। আর এই ইস্তিগফারের উত্তম সময় হলো ফজরের আগে। আল্লাহ বলেন,

"আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।" (সূরাহ নূহ: আয়াত ১০-১২)

আপনি ক্ষমতা চান? সমাজে একটি ভালো পজিশনে যেতে চান বা চাকরিতে পদোন্নতি চান? ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন নিতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন? আল্লাহর কসম! ইস্তিগফার করুন আর ফলাফল দেখুন। আল্লাহ বলেন,

"আর হে আমার কওম! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দেবেন।" (সূরাহ হূদ: আয়াত ৫২)

আরও শক্তি প্রদান করে শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। এটা হতে পারে এমনকি চাকুরি, পদোন্নতি বা ইউনিভার্সিটি এডমিশনও।

জীবনকে উপভোগ করতে চান? তাহলে দেখুন আল্লাহ কী বলেছেন,

"আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন।" (সূরাহ হূদ: আয়াত ৩ এর প্রথমাংশ)

ইবনু কাসির (ﷺ) বলেন, এটি হলো দুনিয়ার জীবনে। আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ বলছেন,

"এবং অধিক আমলকারীকে বেশি করে দেবেন।" (সূরাহ হূদ: আয়াত ৩ এর বাকি অংশ)

এটি হলো আখিরাতের জীবন। আর এভাবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে আপনি উভয় জীবনেই সফলতা অর্জন করতে পারবেন।

আপনি গুনাহ থেকে বাঁচতে চান? গুনাহের শাস্তি থেকে দুনিয়া এবং আখিরাতে নিরাপদ থাকতে চান? আল্লাহ বলেন,

"তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।" (সূরাহ আনফাল: আয়াত ৩৩)

ইস্তিগফারের মাধ্যমে আপনার উপর আল্লাহর রহমত নেমে আসে। আল্লাহ বলেন,

> **"কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না যেন তোমাদেরকে রহমত করা হয়?" (সূরাহ নামল: আয়াত ৪৬)**

আল্লাহর রহমত আপনার সাথে থাকলে আপনার আর কী-ই বা প্রয়োজন? এখন বলুন এত এত পুরস্কাকারের জন্য এইটুকু কষ্ট কি করা যায় না? রামাদানের এই বরকতময় দিনেই তা শুরু করুন এবং ফজরের আগে ইস্তিগফারকে অভ্যাসে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প নিন। ফজরের একটু আগে ঘুম থেকে উঠে ইস্তিগফার করুন। জিহ্বা দিয়ে শুরু করুন আর খেয়াল রাখবেন হৃদয় যেন জিহ্বার সাথে তাল মিলিয়ে চলে। লেগে থাকুন এবং আল্লাহর কসম—আপনি পরিবর্তন টের পাবেন। এতে সন্দেহ করার মানে আপনি কুরআন নিয়ে সন্দেহ করছেন।

কিন্তু আল্লাহ কেন ভোরের ঠিক আগের সময়টাকেই বিশেষ গুরুত্ব দিলেন? আমরা জানি ইস্তিগফার যে কোনো সময়েই করা যায়। কিন্তু এই সময়ের বিশেষ গুরুত্ব কেন? কারণ এটি হলো দিনের শুরু। আপনার দরকার পরিচ্ছন্ন একটি শুরু, যাতে আল্লাহ আপনার দিনকে বারাকাহ দিয়ে ভরে দেন, এ থেকে বঞ্চিত না করেন। দিন শুরু করার মুহূর্তেই আপনি (ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে) পরিচ্ছন্ন আমলনামা নিয়ে শুরু করছেন, ফলে আল্লাহ আপনার সারা দিনে বারাকাহ দেবেন। আপনি দুনিয়াবি কাজের দিকে যাচ্ছেন, আল্লাহ চান আপনি যেন আপনার জীবনের আসল উদ্দেশ্য মাথায় রাখেন। তাই দিনের শুরুতেই ইস্তিগফার করুন। কারণ রাতের শেষ তৃতীয়াংশের এই পুরোটা সময়-ই বরকতময়।

তাফাক্কুর

দ্বিতীয় যে ইবাদাতটি আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি তা হলো তাফাক্কুর—গভীর চিন্তাভাবনা করা। আল্লাহর নামসমূহ, স্বত্বা, গুণাবলী ও ক্ষমতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ, আকাশ, জমিন, পাহাড়, দিন, রাত, বাতাস, কুরআনের আয়াত নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা। আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টিক্ষমতা নিয়ে ভাবা।

চিন্তা করা? হ্যাঁ, চিন্তা করা। হয়তো মনে হতে পারে এসব তো সুফীদের কাজ কারবার। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এমন কিছু না, কারণ এই ইবাদাতের কথা কুরআনেই আছে।

আল্লাহ বলেন,

> **"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য আছে নিদর্শন।" (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১৯০)**

আল্লাহ পরের আয়াতে বলছেন—যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। আল্লাহ বলছেন, "ইয়াতাফাক্কারুন।"

এই তাফাক্কুর মানে কী? তা হলো চিন্তা করা। তারা আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে। তারা যখন এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে—এই চিন্তা তাদের কোথায় নিয়ে যায়? আল্লাহ আয়াতের পরের অংশে বলেন,

> **"হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন!" (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১৯১)**

তারা যখন চিন্তাভাবনা করে, তখন তাওহীদ নিয়ে সঠিক উপসংহারে আসে। এটি তাদের মনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে। কুরআনে এরকম শত শত আয়াত আছে—যা চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলছেন,

> **"আর তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে, তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরাহ রা'দ: আয়াত ৩)**

পরের আয়াতেই আল্লাহ আরও বলছেন,

> **"আর জমিনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙুর-বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, এতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে।" (সূরাহ রা'দ: আয়াত ৪)**

শরীরের সাথে আত্মা যেভাবে চলে—এই ইবাদাতও আপনার অন্যান্য ইবাদাতের সাথে সবসময় পাশাপাশি চলবে। তাফাক্কুর দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু নয় বরং এটা হারিয়ে যাওয়া এক ইবাদাত। তাফাক্কুরের মাধ্যমে আমাদের বদ্ধ অন্তর উন্মুক্ত হয়। পাপের যে কালিমা দিয়ে অন্তর ঢেকে গিয়েছিল—তাফাক্কুরের মাধ্যমে তা ধুয়ে মুছে ক্বলব উজ্জ্বল হয়ে যায়। এই ইবাদাত কুরআনের অর্থ অনুধাবণ করার জন্য অন্তরকে উন্মুক্ত করে দেয় আর ঈমান বৃদ্ধি করে। এই ইবাদাত আপনার মাঝে আল্লাহর প্রতি ভরসা, ভয়, ভালোবাসা, আশা, নির্ভরতা ও ক্ষমাপ্রার্থনা বৃদ্ধি করবে। আপনার কঠিন অন্তঃকরণকে নরম করবে। যখন আপনি আল্লাহর ক্ষমতা নিয়ে ক্রমাগত চিন্তা করবেন—তা আপনাকে বিনয়ী করবে। যখন আপনি আল্লাহর দয়া ও ক্ষমাপরায়ণতা নিয়ে ভাববেন—তা আপনাকে আরো বেশি বেশি ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। সাবান যেভাবে ময়লা পরিষ্কার করে, তাফাক্কুরও আপনার ক্বলবের ময়লা দূর করে।

আপনি যা কিছু দেখেন—তার সবকিছু নিয়েই গভীর চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আবু সুলাইমান আদ-দারানি (﵀) বলেন, “আমি যখনই ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দেখেছি, তখনই তাতে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি।” যা কিছুই তিনি দেখতেন—তাতে আল্লাহর দয়া বা তার উপর আল্লাহর ক্ষমতা নিয়ে ভাবতেন। যখনই আকাশের দিকে তাকাবেন, ভাববেন স্তম্ভ ছাড়া এই আকাশকে কে ধরে রেখেছেন। আকাশের দিকে দেখুন, তারপর আপনার ঘরের দেয়ালের দিকে দেখুন। প্রতি মাসে কিছু না কিছু মেরামত করতে মিস্ত্রী ডাকা লাগে। অথচ আকাশের মতো এত বড় সৃষ্টিকে আল্লাহ বছরের পর বছর অটুট রেখেছেন। ঘর বা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর যখনই আকাশের দিকে তাকাবেন, চিন্তা করবেন—যে আল্লাহ এই আকাশকে বানালেন, তিনি আপনার এইমাত্র করা দু'আকে কবুল করতে সক্ষম। এটি আপনার হৃদয়কে আশা ভরসা দিয়ে ভরিয়ে তুলবে।

একটু সময় নিয়ে আখিরাতের দৃশ্য কল্পনা করুন। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (﵀) একবার সাহাল ইবনু আলী (﵀)-এর কাছে যান। তিনি সাহাল ইবনু আলীকে ভাবনায় মগ্ন দেখতে পান। আজ আপনি কাউকে ভাবনামগ্ন দেখলে তাকে সম্বিত ফিরে পেতে বলবেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক সাহালকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ভাবনা তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। সাহাল বললেন, “আমি পুলসিরাতের উপর ছিলাম।” সাহাল ভাবছিলেন জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত তিনি কী করে পার হবেন তা নিয়ে। মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযির এক হাদিসে আনাস (ﷺ) রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, “আখিরাতে আমি কোথায় আপনার সাথে দেখা করব, যাতে আপনার শাফাআত পেতে পারি?” রাসূল (ﷺ) বললেন, “তুমি আমাকে পুলসিরাতের ধারে দেখবে।” তিনি বললেন, “যদি সেখানে না পাই?” তিনি (ﷺ) জবাব দিলেন, “তাহলে মীযানের কাছে।” তিনি বললেন, “যদি সেখানেও না পাই?” তিনি (ﷺ) বললেন, “তাহলে হাউজে কাউসারের ধারে।”

আপনার কি মনে হয় আখিরাতের ব্যাপারে দীর্ঘ সময় যাবত গভীর চিন্তা ভাবনা না করলে এমন প্রশ্ন কেউ করতে পারে? আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ নিয়ে চিন্তা করুন। জান্নাতে আপনার প্রাসাদ আর আশেপাশের প্রতিবেশী কেমন হবে—তা নিয়ে ভাবুন। জান্নাতে আপনার বাড়ির সামনের আর পেছনের বাগান কেমন হবে, আপনার প্রাসাদের ছাদ কত বড় হবে, ভাবনাহীন এক জীবনে আপনার পরিবারের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার পর আপনার অনুভূতি কেমন হবে তা নিয়ে ভাবুন।

দুনিয়া নামক এই জেলখানার দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে এসব ভাবনা কাজে দেবে। এটি আপনার মনে প্রশান্তি এনে দেবে। আল্লাহর দিদার লাভের ব্যাপারে ভাবুন—এটি আপনার মাঝে তাঁর প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়ে দেবে, তাকওয়া বৃদ্ধি করবে। এটি শয়তানের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে—কারণ আপনি আল্লাহর সাথে দেখা করতে চান। জাহান্নাম নিয়ে ভাবুন, সেখানকার অধিবাসীদের

দুর্দশা নিয়ে ও তাদের শাস্তি নিয়ে ভাবুন। এটি আপনার অন্তর নরম করবে, অতীত পাপের জন্য অনুশোচনা তৈরি করবে, তাওবাহ করতে উৎসাহ যোগাবে, ঈমান ও তাকওয়ার সাথে নতুন জীবন গড়ার প্রত্যয় জাগাবে। এই ইবাদাত আপনার মাঝে আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন (নিশ্চয়তা) বৃদ্ধি করবে।

আধুনিক সভ্যতা থেকে বিচ্যুত আর অশিক্ষিত এক বেদুইন যখন তাফাক্কুর করছিল, তখন তাকে এই গভীর চিন্তাভাবনা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যার ব্যাপারে আজকের আধুনিক শিক্ষিত লোকদের কোনো ধারণাই হবে না।

উটের বিষ্ঠা দেখে বোঝা যায় এখানে উট ছিল, পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় এখান থেকে কেউ হেঁটে গিয়েছে। তারা ভরা বিশাল আকাশ আর উত্তাল সমুদ্র দেখে বোঝা যায় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব আছে। এই তাফাক্কুরের ফলেই ঐ বেদুইন আল্লাহর অস্তিত্ব অনুধাবন করেছিল।

তাবাত্তুল

তৃতীয় ও সর্বশেষ অবহেলিত বিষয় হলো দুনিয়াবি সব বিষয় থেকে নিজেকে পৃথক করে আল্লাহর দিকে যাওয়া। এই ইবাদাতের ব্যাপারেও কুরআনে বলা আছে। আল্লাহ বলছেন,

> **"আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।" (সূরাহ মুযযাম্মিল: আয়াত ৮)**

নিজেকে আল্লাহর জন্য পুরোপুরি সমর্পণ করে দেওয়া। মারইয়াম (ﷺ)-এর একটি ডাকনাম ছিল আল-বাতুল। এই নামটি এসেছে তাবাত্তুল থেকে। তিনি নিজেকে দুনিয়া থেকে পৃথক করে রেখেছিলেন, যাতে তিনি আল্লাহর ইবাদাত করতে পারেন। এই হলো তাবাত্তুল। এর অর্থ আবার এই না যে—আপনি কোনো গুহার ভেতরে গিয়ে সব কাজ ছেড়ে ছুড়ে বসে থাকবেন।

তিন রকমের তাবাত্তুল আছে। একটা হলো খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা যা করে। তারা দুনিয়াবি প্রয়োজনীয় সব কাজ ফেলে, বিয়ে না করে, দূরে কোনো গীর্জায় অবস্থান করে। এটা ইসলাম নয়। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন তার জন্য কোনটা উপযোগী। আর বিয়ে করা ইসলামের অংশ। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা যেভাবে গীর্জায় নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে, তাতে করে একনিষ্ঠ ইবাদাতকারী না—বরং শিশুকামী তৈরি হয়। তারা এই বিষয়টা এখন বুঝতে পারছে, যা ইসলাম আমাদের চৌদ্দশ বছর আগেই শিখিয়ে দিয়েছে। তারা এখন তাদের পদ্ধতি পাল্টাতে চাচ্ছে অথচ ইসলাম আমাদের আগেই তা বলে দিয়েছে। কারণ আমাদের জীবনবিধান আসে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছ থেকে—যিনি আমাদের চাহিদা ও প্রয়োজন বোঝেন।

দ্বিতীয় প্রকারের তাবাত্তুল হলো—দিনের একটা নির্দিষ্ট অংশ পৃথক করে নেয়া বা রাতের এক তৃতীয়াংশকে নির্দিষ্ট করে নিয়ে আল্লাহর কাছে একান্তে ইবাদাত করা।

দুনিয়াকে পেছনে ফেলে আল্লাহর জন্য সময় ব্যয় করুন। পাঁচ মিনিট, বিশ মিনিট, যা-ই হোক না কেন। ইবাদাত, সালাত, যিকির, দু'আ, কুরআন তিলাওয়াত করা—ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া হলো তাবাত্তুল। আর দিন ও রাতের মধ্যে তাবাত্তুলের উপযুক্ত সময় হলো রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ।

তৃতীয় প্রকারের তাবাত্তুল হলো মনকে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়া—যে নিয়ামত উম্মাহর খুব কম মানুষই পেয়ে থাকে। শারিরীকভাবে তারা আপনাদের মাঝে উপস্থিত আছে, কিন্তু তাঁর মন ঘোরাফেরা করছে আসমানী বিষয়াদির ভাবনায়। এমন মানুষরা আপনার সাথে কথা বলার সময় আপনার মনে হবে তাদের পূর্ণ মনোযোগ তার কথার দিকে, কিন্তু আসলে মনে মনে সে ভাবছে—যে কথাগুলো আমি বলছি তা কি হালাল না হারাম? এটা কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে নাকি অসন্তুষ্ট করবে? বাহ্যিকভাবে তাদেরকে দেখে কোনো পার্থিব কষ্টের কারণে দুঃখী মনে হতে পারে। কিন্তু অন্তরে তারা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে গ্রহণ করে নিয়ে খুশি ও সন্তুষ্ট আছে। মোটকথা হলো, তিনি হলেন এমন ব্যক্তি যিনি শারীরিকভাবে আপনার সাথে আছেন, কিন্তু আত্মিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গভীর চিন্তায় বিভোর। তিনি একই সাথে উপস্থিত ও অনুপস্থিত। এটি ইহসানের স্তরসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যেন আমাদেরকেও এই স্তরে উন্নীত হওয়ার তাওফীক দেন।

কুরআনকে বন্ধু বানান

কুরআন এবং রামাদানের মাঝে এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **“রামাদান মাসো হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী।” (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৮৫)**

আল্লাহ্ তাআলা এই রামাদানের একটি বিশেষ রাত সম্পর্কে বলেছেন,

> **“আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে (অর্থাৎ শবে ক্বদরে)।” (সূরাহ্ দুখান: আয়াত ৩)**

> **“নিশ্চয় আমি একে (কুরআনকে) নাযিল করেছি শবে কদরে।” (সূরাহ্ ক্বদর: আয়াত ১)**

এই দুই আয়াতের মধ্যে কি অসঙ্গতি আছে? দুই আয়াতের একটিতে বলা হচ্ছে কুরআন নাযিল হয়েছে এক মর্যাদাপূর্ণ রাত—শবে ক্বদরে। আরেক আয়াতে বলা হচ্ছে তা নাযিল হয়েছে রামাদান মাসে। পশ্চিমের ওরিয়েন্টালিস্টরা দাবি করে এটা কুরআনের একটি অসঙ্গতি। কিন্তু সুনান নাসাঈ এবং আল-হাকিম এ দুটো কিতাবে আমরা দেখতে পাই, ইবনু আব্বাস (ﷺ) এবং ইবনু জারির (ﷺ)-এর দুটো পৃথক বর্ণনা আছে, সেখানে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়েছে শবে ক্বদরে। এরপর একে সপ্তম আসমান থেকে মানুষের সবচেয়ে কাছে প্রথম আসমানে আনা হয় এবং নবুওয়াতের ২৩ বছর ধরে তা নবীজি (ﷺ)-এর উপর নাযিল করা হয়।

মানুষ যতটুকু ভাবে—কুরআন এবং রামাদান মাসের মধ্যে সম্পর্ক আসলে তার চাইতেও গভীর। জিবরীল (عليه السلام) নবীজি (ﷺ)-এর কাছে আসেন এবং তাঁর হাত ধরে তাকে বলেন, ‘ইক্বরা! ইক্বরা!’ এই ঘটনায় নবীজি (ﷺ) মারাত্মক ভয় পেয়েছিলেন। ইবনু ইসহাক, আবু সুলায়মান আদ-দামিশকী, ইবনুল জাওযির মতে, এই ঘটনাটি রামাদান মাসে ঘটেছিল। কুরআন ও রামাদানের সম্পর্কের গভীরতা আমরা আরো বেশি উপলব্ধি করতে পারব যখন আমরা দেখি—এই রামাদানেই নবী করীম (ﷺ) প্রতিদিন জিবরীল (عليه السلام)-কে কুরআন পড়ে শোনাতেন। জীবনের শেষ বছরে রামাদানে তিনি দুবার করে কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন। অর্থাৎ কুরআনকে রিভিউ করা হতো রামাদানে। রিভিউ চলাকালীন সময়ে কখনো জিবরীল (عليه السلام) তিলাওয়াত করতেন—আর নবীজি (ﷺ) শুনতেন। আবার কখনো উল্টোটা হতো।

কারো কারো মতে, সেসময় জিবরীল (ﷺ) নবীজি (ﷺ)-কে কুরআনের কোন আয়াতগুলো কার্যকর থাকবে আর কোনগুলো রহিত হয়ে গেছে—সেগুলো জানাতেন। সম্ভবত এই সময়টাতেই নবীজি (ﷺ) কুরআনের তাফসীরও শিখতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নবীর কাছে সর্বোত্তম কিতাব প্রেরণ করেছিলেন সর্বোত্তম মাসের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ রাত অর্থাৎ শবে ক্বদরে। এ ঘটনাগুলো নির্দেশ করে যে—রামাদান মাস এবং কুরআনের মাঝে সম্পর্ক কতটা গভীর!

“রামাদান মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছিল কুরআন”—এ ধরনের একটা আয়াত এবং আয়াতে প্রকাশিত অভিব্যক্তিই বলে দেয় যে—রামাদান মাসে কুরআনের এক অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী আলিমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এই কারণেই রামাদান মাসে তাঁরা কুরআনের জন্য তাঁদের অন্যান্য সব কাজ ছেড়ে দিতেন। তাঁদের অনেকে এমনকি হাদিসের দরস দেওয়া বাদ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন। সেসব মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলার আগে আসুন জেনে নিই রামাদান ছাড়া অন্যান্য সাধারণ সময়ে তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করতেন। এরপর আমরা দেখব রামাদান মাসে তাঁরা কিভাবে সময় কাটাতেন।

একবার আবু বকর ইবনু আয়্যাশ (ﷺ) তাঁর বাসার একটি ঘরের দিকে ইশারা করে তাঁর পরিবারকে বলেছিলেন, “আমি ষাট বছর যাবৎ প্রতিদিন এই ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করেছি।” ষাট বছর যাবৎ প্রতিদিন তিনি সেখানে কুরআন খতম দিয়েছেন। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাঁর বোন কাঁদতে শুরু করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কেন কাঁদছ?” তিনি তাঁর বোনকে তখন বললেন, “তুমি ঘরের ঐ কোণটা দেখছ? আমি সেখানে আঠারো হাজার বার কুরআন খতম করেছি।” আয-যাহাবি ইবনু আয়্যাশের সম্পর্কে বলেছেন, “আবু বকর আয়্যাশ (ﷺ) চল্লিশ বছর যাবত প্রতিদিন একবার করে কুরআন খতম করতেন।” সে হিসেবে ইবনু আয়্যাশ প্রায় চৌদ্দ হাজার বার কুরআন খতম দিয়েছেন। অবশ্য অবস্থা ও প্রেক্ষাপটভেদে এ বিষয়ে একাধিক বর্ণনা আছে।

আয-যাহাবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, নবীজি (ﷺ)-এর সুন্নাহ হলো তিন দিনের কমে কুরআন খতম না করা। আর নিঃসন্দেহে নবীজির সুন্নাহ অনুসরণ করাই উত্তম। কিছু হাদিস আছে যেখানে তিন দিনের কমে কুরআন খতম করার বিষয়টিকে অপছন্দ এবং অনুৎসাহিত করা হয়েছে। একটি বর্ণনায় আছে সাত দিনের কথা। এর কারণ হলো, তিন দিনের কমে কুরআন খতম দিলে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না। তবে তিন দিনের কমে খতম করার বিষয়টি অপছন্দ করতেন এমন সালাফও যেমন ছিলেন, তেমনি অনেক সালাফ ছিলেন যারা এটা অপছন্দ করতেন না। এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনা আছে। সালাফদের কেউ কেউ একই সময়ে কুরআনকে বিভিন্নভাবে খতম দিতেন। বিষয়টা বেশ অবাক করা। যেমন—এক ধরনের খতমে তাঁরা কুরআন খুব দ্রুত পড়তেন, যেন তাঁরা বেশি সাওয়াব পেতে পারেন।

কারণ এক অক্ষরের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব পাওয়া যাবে। এই ধরনের খতমে তাঁরা তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতেন। আবার তাঁরা অন্যভাবে কুরআন খতম দিতেন, সে খতমে তাঁরা আস্তে আস্তে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যাতে কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা এবং পর্যালোচনা করা যায়। এভাবে খতম দিতে তাঁদের কয়েক সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছরও লেগে যেত। তাঁদের কেউ কেউ তৃতীয় আরেক ধরনের কুরআন খতম দিতেন। সে পদ্ধতিতে তাঁরা কুরআন পড়ে পড়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। এই ধরনের খতমে প্রথম দুই খতম থেকে আরও বেশি সময় লাগত।

আমরা কোনো ফিকহি বিতর্কে যেতে চাচ্ছি না, কারণ দুঃখজনকভাবে আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি যে—উম্মতের অনেক মুসলিম আছে যারা তাদের সারা জীবনেও কুরআন একবার শেষ করতে পারে না। আজকে উম্মতের এগিয়ে থাকা লোক তারা, যারা এক রামাদানের পর আরেক রামাদান আসার আগে কুরআনের উপর ধুলা জমতে দেয়নি—এমনিভাবে কুরআনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী প্রতি দুই দিনে একবার কুরআন খতম দিতেন, অর্থাৎ প্রতিদিন তিনি কুরআনের অর্ধেক তিলাওয়াত করতেন। রামাদান মাসে নয়—এটা ছিল তাঁদের সাধারণ দিনের আমল।

কীভাবে একজন মুসলিম কুরআন তিলাওয়াত করা ছেড়ে দিতে পারে, যখন সেই কুরআনেই আল্লাহ বলছেন—রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে অভিযোগ করছেন,

> **“হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে (তারা এটা না শুনে, না তার কোনো হুকুম মানে)।” (সূরাহ আল-ফুরকান: আয়াত ৩০)**

নবীজি (ﷺ) তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এবং সাক্ষ্য দিচ্ছেন—যারা আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলতেন, “কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দেয়া কুরআনকে পরিত্যাগ করারই নামান্তর।” এটা এতটাই মারাত্মক এবং ভয়ংকর বিষয় যে, হাশরের ময়দানে আপনাকে আল্লাহ তাআলার সামনে আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে আর আপনার বিরুদ্ধে নবীজি বাদী হয়ে সাক্ষ্য দেবেন, আপনার দিকে আঙ্গুল তাক করে বলবেন, “হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে।”

যারা কুরআনের ভাষা আরবি জানেন না, তাদের না জানাটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মুসলিম হিসেবে কুরআনের ভাষা সবার জন্য জানা জরুরি। এ বিষয়ে আপনারা মুহসিন খান এবং আল-হিলালী রচিত “The Noble Quran” এর শুরুতে কিছু কথাবার্তা পাবেন। তাঁদেরও আগে ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে কিছু বলে গেছেন। তাঁরা আরবি ভাষা জানাকে মুসলিম পরিচয়ের অংশ মনে করেন।

আমরা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু আরবী ভাষা জানাটা জরুরি। আবার যারা আরবি জানেন না, তবে শেখার চেষ্টা করছেন—তাঁদের জন্যেও কুরআনকে নিজেদের ভাষায় পড়া ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। নিজের ভাষায় কুরআন পড়লে প্রতি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকী হয়তো পাবেন না, তবে ইনশাআল্লাহ কিছু না কিছু তো পাবেন!

আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী হতে কে না লাভবান হতে চায়? কে এমন ঔষধ চায় না—যা হৃদয়, আত্মা এবং শরীরের জন্য প্রতিকারক? কুরআন হলো সমস্ত সন্দেহ এবং কামনা বাসনার প্রতিকারক। কুরআন হলো দুশ্চিন্তা, হতাশা এবং মানসিক চাপের ঔষধ।

যখন কাউকে বলা হয় আপনার সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করুন—পরের দিনই সে বলে বসে, "আমি এখনো হতাশ, আমার মনে এখনো সন্দেহ।" যখন একজন ডাক্তার কোনো ঔষধ দেয়, ধরা যাক মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, তখন ডাক্তার এ কথা বলে দেয় যে, ঔষধটা তিন-চার সপ্তাহ ধরে সেবন করুন, এরপর আপনি এর ফলাফল পাবেন এবং ঔষধ নেওয়া বন্ধ করবেন না। ঠিক একই বিষয়টা কুরআনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কুরআন থেকে ফল পেতে হলে, কুরআনের সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নিরবিচ্ছিন্নভাবে অধ্যবসায়ের সাথে তিলাওয়াত করে যাওয়া।

একটি দু'আর দিকে লক্ষ করুন—যেটা নবীজি (ﷺ) আমাদের শিখিয়েছেন যাবতীয় দুশ্চিন্তা, হতাশা, মানসিক চাপ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، ابْنُ عَبْدِكَ ، ابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ،

وَنُورَ صَدْرِي ، وَجَلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي

"হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনারই এক বান্দার পুত্র এবং আপনার এক বাঁদীর পুত্র। আমার কপাল (নিয়ন্ত্রণ) আপনার হাতে; আমার উপর আপনার নির্দেশ কার্যকর; আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়পূর্ণ। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনার প্রতিটি নামের উসীলায়; যে নাম আপনি নিজের জন্য নিজে রেখেছেন অথবা আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টজীবের কাউকেও শিখিয়েছেন অথবা নিজ গায়েবী জ্ঞানে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে

রেখেছেন—আপনি কুরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার দুঃখের অপসারণকারী এবং দুশ্চিন্তা দূরকারী।" [২৯]

নবীজি (ﷺ) বলতেন, যে কেউ এই দু'আ করবে, তার দুশ্চিন্তা, দুঃখ এবং হতাশা চলে যাবে। সে এসব থেকে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহ-তাআলা এসবকে সুখ-সমৃদ্ধি এবং প্রশান্তি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।

মানুষকে যখন এই দু'আ পড়তে বলা হয়, তখন তারা কিছুদিন পর এসে বলে, "শাইখ, আপনার প্রেসক্রিপশনে তো কাজ হচ্ছে না।" এধরণের কথা প্রায়ই অনেকে বলে। যখন জিজ্ঞেস করি, "ভাই, সর্বশেষ কবে আপনি কুরআন তিলাওয়াত করেছেন বলুন তো?" তখন তারা উত্তর দেয়, "শাইখ, আপনি তো আমাকে কেবল এই দু'আটা পড়তে বলেছেন, কুরআনের কথা তো কিছু বলেননি!" যখন বলি, "আমাকে বলুন, শেষ কবে আপনি কুরআন তেলাওয়াত করেছেন?" তারা বলে, এই তো গত রামাদানে, বা কয়েক বছর আগে বা অনেক দিন আগে, অথবা আমার মনে নেই।

লক্ষ করুন, দু'আটির একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন হলো,

أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي

"কুরআনকে আমার হৃদয়ের মণি এবং আলোকবর্তিকা বানান।"

এই দু'আর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর কাছে চাচ্ছেন যাতে তিনি আপনার চিন্তা, আপনার সমস্যা এবং আপনার দুঃখ দূর করে দেন কুরআনকে আপনার হৃদয়ের জ্যোতি বানানোর মাধ্যমে—আপনার পথনির্দেশক বানানোর মাধ্যমে। আপনার কুরআনের উপর যদি ধূলো জমে যায়, তাহলে এই দু'আ কীভাবে কাজ করবে? আপনি যদি কুরআন না পড়েন, তাহলে কীভাবে কুরআনের মাধ্যমে আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হবে? এভাবে কখনোই কাজ হবে না, এটা নিশ্চিত থাকুন। এই দু'আর সাথে কুরআন তিলাওয়াতও আবশ্যক। এই দুটো মিলেই একটা ঔষধের মতো কাজ করে।

একজন কারাবন্দী যাকে দীর্ঘদিন একা একটি কামরায় রাখা হয়েছিল। জেলখানার সাইকিয়াট্রিস্ট সেখানে নিয়মিত বন্দীদের পরীক্ষা করত। সপ্তাহে একবার কি দু-বার চিকিৎসক সেখানে তার ডিউটি পালনের জন্য আসত। জেলখানার বেশিরভাগ বন্দীই ছিল মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। কারা কর্তৃপক্ষের লোকেরা যখন সে মানুষটির সেলের পাশ দিয়ে যেত, চিকিৎসক তাঁকে জিজ্ঞেস করত তার কিছু লাগবে কি না। লোকটি কোনো উত্তর দিতেন না বা মাঝে মাঝে বলতেন কিছু লাগবে না। চিকিৎসক এটা ভেবে অবাক হতো যে, এই মানুষটি সপ্তাহের ৭ দিনের প্রতিদিনই ২৪ ঘণ্টা ধরে

---

[২৯] মুসনাদে আহমাদ: ৩৭১২

নির্জন সেলে কাটায়, তারপরেও সে এত হাসিখুশি আর সন্তুষ্টচিত্তে থাকে কী করে! চিকিৎসক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকে কেন এত নিশ্চিন্ত আর সুখী মনে হয়? তুমি তো কখনোই কিছু চাওনা!" সে বন্দীটি চিকিৎসককে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আমার সাথে থাকে"—এই বলে তিনি তাঁর পাশ থেকে কুরআন বের করে চিকিৎসককে দেখালেন।

কেউ যদি বুঝতে পারে কুরআন কী জিনিস, তাহলে তার আর কিছুই প্রয়োজন নেই। আপনি কি রবের সাথে কথা বলতে চান? কুরআনের মাধ্যমে আপনি মহান রবের সাথে কথা বলতে পারবেন। আপনি যদি কুরআনের অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে চান, তাহলে কুরআনকে আপনার বন্ধু বানান। এই কুরআন আপনার সব ধরনের রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করবে—মানসিক কিংবা অন্য যেকোনো কিছু। এই কুরআন আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে—যেটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করুন, যদি আপনি কুরআনকে বুঝতে চান। দুজন বন্ধু নিজেদের গোপন কথা একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করে না, যদি না তারা খুব ভালোভাবে পরিচিত হয়। এরপর একসময় কাছাকাছি আসে, একে অপরকে উপহার দেওয়া শুরু করে এবং ধীরে ধীরে নিজেদের ব্যক্তিগত কথা শেয়ার করে, দুঃখকষ্টের সময়ে একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়। একইভাবে আপনি কুরআনকে বন্ধু বানানো শুরু করুন, তবে কুরআনের অলৌকিক প্রভাব দেখতে পাবেন। আল্লাহর কসম, এমন কেউ নেই, যে কুরআনের চেয়ে ভালো বন্ধু হতে পারবে। যদি আপনি নিঃসঙ্গতা বোধ করেন, কুরআনের কাছে যান। যদি আপনার মন খারাপ থাকে, কুরআন খুলুন। যদি আপনি হতাশা বোধ করেন, কুরআন শুনুন এবং পড়ুন। এটা সবকিছুর জন্য সাহায্যকারী। যদি আপনার মন ভালো থাকে, কুরআন পড়ুন আল্লাহকে শুকরিয়া জানানোর জন্য।

> **"যদি তুমি আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, আমি আমার নিয়ামতকে বৃদ্ধি করে দিবো।" (সূরাহ ইবরাহীম: আয়াত ৭)**

যে বন্ধুত্ব আপনাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে দিতে পারে, সে বন্ধুত্ব থেকে আপনি এর চেয়ে বেশি আর কী চান? তিলাওয়াত করুন, কুরআন আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে, এই কুরআন আপনাকে সর্বোচ্চ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে।

ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) এ ব্যাপারে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, "কুরআন যার উপকারে আসে না, আল্লাহ তাআলাও যেন তার উপকার না করেন! কুরআন যার জন্য যথেষ্ট হয় না, তার জন্য আর কিছুই যেন যথেষ্ট না হয়!"[৩০]

এখনো সময় আছে। দৃঢ় প্রত্যয়ে উঠে দাঁড়ান, শপথ করুন এবং এই মহান কিতাবের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করুন। আল্লাহর কসম! আপনার ফোনের কন্টাক্ট লিস্টে আল্লাহর

---

[৩০] যাদুল মাআদ, ৪/৩২২

কালামের টেক্সট এবং অডিও থেকে আর কোনো ভালো কন্টাক্ট হতে পারে না। আপনার যখন কারো সাথে কথা বলা দরকার, মোবাইলের কন্ট্যাক্ট লিস্টে নাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সেখানে কুরআনকে রাখুন, কুরআনের সাথে কথা বলুন, কুরআনের কথা শুনুন, তিলাওয়াত করুন।

আয-যুহরি বলতেন, "রামাদান মাস হলো তিলাওয়াতের মাস এবং গরীবদের খাওয়ানোর মাস, এই দুই জিনিস ছাড়া তৃতীয় আর কিছু নেই।" এটা সেই মাস, যে মাসে ইমাম শাফি'ঈ (ﷺ) কুরআন ষাট বার খতম দিতেন। যখন রামাদান মাস আসতো, ইমাম আহমাদ (ﷺ) মসজিদে বসে পড়তেন এবং একনাগাড়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। লোকেরা বলত, আমরা শুধু দেখতাম যে তিনি মসজিদের বাইরে ওযু করতেন, আবার কুরআন তিলাওয়াতে ফিরে যেতেন আর সালাত আদায় করতেন। আবুল কাসিম ইবনু আসাকিরের ছাত্ররা তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, তিনি তার জীবনের শেষ দশ দিনের প্রতিদিন একবার করে কুরআন খতম করতেন এবং এটা ছিল তাঁর সালাতের বাইরের তিলাওয়াত। ইমাম মালিক (ﷺ) রামাদান মাসে তাঁর অন্যান্য সব হাদিসের ক্লাস বাদ দিয়ে দিতেন কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য। রামাদান মাসে কুরআন ছিল তাঁদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার এক বিশেষ সুযোগ। তাঁরা মনে করতেন এটা এমন কিছু যা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে নিয়ে যেতে পারে, হাদিসের দারস থেকেও বেশি নৈকট্য এনে দেবে কুরআন! তাঁরা কুরআনের এই আয়াতের অর্থ জানতেন এবং কদর করতেন,

> **"রামাদান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৮৫)**

এ কথা মনে রাখা জরুরি যে, আমরা যাদের উদাহরণ পেশ করেছি সেগুলো অধিকাংশ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হবে না। এ ধরনের আমল করা অসম্ভব নয়, কিন্তু আসলে অনেকেই তা করতে পারবে না। এরপরেও আমরা উম্মাহর সেরা মানুষগুলোর কথা উল্লেখ করি, যাতে তাঁদের আমলের সামান্য অংশও যদি কেউ করতে পারে—তাহলে আল্লাহ চাইলে সে সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। দ্বীনের বিষয়ে আমরা সবসময় তাঁদের দিকেই তাকাই—যাদের অবস্থান আমাদের ওপরে, আর দুনিয়াবি বিষয়ে তাদের দিকে তাকাই—যাদের অবস্থান আমাদের নিচে। এমনটা যেন না হয় যে—এসব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জযবার বশে আপনি বলে বসলেন, "আল্লাহর কসম! ইমাম শাফি'ঈ (ﷺ) যা করেছেন, আমি আজকে রাতে তা-ই করব, কুরআন দুইবার খতম দেব।" আপনি ঝোঁকের বশে বিশাল টার্গেট সেট করে মাঠে নামলেন আর দু'দিন পরে কুরআন খতম করা বা প্রতিদিন তিলাওয়াত করাই ছেড়ে দিলেন—এটা কাম্য নয়।

বুখারিতে বর্ণিত হাদিসটির দিকে লক্ষ করুন,

> "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম সে আমল, যা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা খুব অল্প হয়।"[৩১]

যতটুকু আপনি পারবেন, ততটুকু দিয়েই শুরু করুন। হতে পারে সেটা মাত্র কয়েকটি আয়াত, এক পাতা, হয়তোবা এক পারা অথবা কয়েক পারা—কিন্তু ততটুকুই করুন যতটুকু আপনি কেবল রামাদানেই না—রামাদানের বাইরেও করতে পারবেন। এক পর্যায়ে আপনি দেখবেন কুরআনের প্রতি এক ধরনের আসক্তি কাজ করছে, নিজ থেকেই আপনি কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ বাড়াতে পারবেন। রামাদানের দিনগুলো কাজে লাগান। দুনিয়াটা অল্পদিনের, কিছুদিন পরেই মানুষজন আমাদের নাম উল্লেখ করে বলবে যে, "আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।" আমরা এও জানি না আমরা পরের রামাদান পর্যন্ত আদৌ বেঁচে থাকব কি থাকব না। কুরআনকে বন্ধু বানান এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে সংযোগ স্থাপনের এই রশি—কুরআনকে আঁকড়ে ধরুন। আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযাত কুরআনকে আমাদের সবার হৃদয়ের আলো এবং আনন্দের উৎস বানিয়ে দিন এবং কুরআনকে আমাদের জান্নাতুল ফিরদাউস প্রাপ্তির উসিলা হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।

---

[৩১] সহিহ্ বুখারি: ৬৪৬৪

কুরআনের শক্তি এবং প্রভাব

রামাদানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেন,

> **"রামাদান মাসই হলো সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।" (সূরাহ বাকারা: আয়াত ১৮৫)**

সেই কুরআনকেই আজ মুসলিমরা অবহেলা আর অলসতার ধূলোয় মলিন করে ফেলে রেখেছে, অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)-এর সময়ে অবিশ্বাসী কুরাইশরা পর্যন্ত কুরআনকে ভয় করত! কুরআন তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করে দেবে এটা তারা ভালোভাবেই অনুভব করতে পেরেছিল, আর তাই তারা ভয় পেত আল্লাহর এই কিতাব না জানি কখন তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করে দেয়! যদিও তারা রাসূল (ﷺ)-এর দাওয়াতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, কিন্তু কুরআনের অলৌকিক প্রভাব নিয়ে তারা নিজেরাই সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। তারা আশঙ্কা করত যে, কুরআন তাদেরকে পরিবর্তন করে ফেলবে। এমনকি তারা এই ভেবেই বিচলিত থাকত যে, কুরআন তিলাওয়াত শুনলেই হয়তো তাদের অন্তর প্রভাবিত হয়ে পড়বে। এর কারণ হচ্ছে আরবি ভাষার উপর তাদের দখল ছিল এবং সেজন্যই অবিশ্বাসী কুরাইশদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হলে কুরআনের অর্থ সরাসরি তাদের অন্তরে প্রভাব ফেলত। এরপরও তারা ঈমান আনেনি, বস্তুত এরাই ছিল সত্যিকারের অবিশ্বাসী—যারা সত্যকে সত্য হিসেবে জেনেও অস্বীকার করেছিল।

অন্যদিকে কুরআন বিশ্বাসীদের অন্তর এমনভাবে প্রভাবিত করত যে, এতে অনেক সময়ই তারা অচেতন হয়ে পড়ত—এমনকি কেউ কেউ মারাও গেছে। আস-সালাবি (রহ.) ছিলেন হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর একজন আলিম। কুরআনের অর্থ শুনে মারা গিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের ঘটনা নিয়ে তিনি একটা বই-ই সংকলন করেছিলেন। হয়তো উনারা কোনো একটি আয়াত পড়লেন, এটা তাদের অন্তরকে এমনভাবে আলোড়িত করল যে—এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উনারা মারাই গেলেন। যদিও এই বইয়ের কিছু কিছু ঘটনা অতিরঞ্জিত, কিন্তু কিছু সত্য ঘটনাও সেখানে আছে, আর এটা মোটেই বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু নয়। কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারে, কুরআন এত শক্তিশালী যে এটি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে?

কিন্তু বাস্তবে কুরআন তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী—এটা পর্বতকে ধূলোয় লুটিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা রাখে।

আল্লাহ বলেন,

"যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরাহ হাশর: আয়াত ২১)

কিন্তু কেন এই কুরআন আমাদেরকে আন্দোলিত করে না?

কারণ আমাদের অন্তরগুলো আজ পাথর কিংবা পর্বতের চেয়েও বেশি কঠিন হয়ে গেছে। ফলে কুরআনের আলো আমাদের অন্তর ভেদ করতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন,

"অতঃপর তার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মতো অথবা তদপেক্ষাও কঠিন।" (সূরাহ্ বাক্বারা: আয়াত ৭৪)

আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন, কিন্তু উনার চুল পাকেনি। কুরাইশদের নির্যাতন, চোখের সামনে একে একে সন্তানদের মৃত্যু, প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু, উনার আশ্রয়দাতা চাচার মৃত্যু—এর কোনোকিছুতেই তিনি ভেঙে পড়েননি। এগুলোর কোনো কিছু তাঁকে এতটা প্রভাবিত করেনি যে উনার চুল পাকবে। কিন্তু কুরআনের কিছু সূরাহ্ আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-কে এত বেশি নাড়া দিয়েছিল যে—উনার চুল পর্যন্ত পেকে গিয়েছিল।

"হুদ এবং তার সম্প্রদায় আমাকে ধূসর করেছে। ..."

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই—এটাই ঘটে যখন আপনি কুরআনের অর্থ বুঝবেন। কুরআনের আয়াত শুনে কুরাইশদের দাম্ভিক আল্লাহদ্রোহী নেতারা পর্যন্ত স্থির হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ত। সহিহ্ বুখারিতে বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, "রাসূল (ﷺ) সূরাহ্ নাজম তিলাওয়াত করে সিজদায় অবনত হলেন এবং মুসলিমরা উনার পিছনে সিজদা করল, জিনেরা উনার পিছনে সিজদা করল এবং মুশরিকরাও উনার পিছনে সিজদা করল।" জ্বী হ্যাঁ, মুশরিকরা পর্যন্ত সেজদা করেছে।

এটা ছিল রাসূল (ﷺ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পঞ্চম বছরের পর যখন আমাদের প্রিয় রাসূল (ﷺ) এবং কুরাইশদের মধ্যকার বিরোধিতা আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছিল। এটা ছিল সেই সময়—যখন আবু জেহেল আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-কে হুমকি দিয়ে বলেছিল যে, আমি যদি তোমাকে আর কখনো কাবা ঘরে সিজদারত দেখি—তবে আমি তোমার ঘাড়ের উপর পা দিয়ে মাড়াব। নাউযুবিল্লাহ।

একদিন রাসূল (ﷺ) কাবায় প্রবেশ করলেন। আল্লাহর রাসূল যখন সালাত আদায় করছিলেন তখন সেখানে মুশরিকরাও সমবেত ছিল। তিনি তিলাওয়াতে নিজের কণ্ঠস্বর উঁচু করলেন, বরকতময় কণ্ঠে সুন্দরভাবে রাসূল (ﷺ)-এর কণ্ঠস্বর থেকে বের হয়ে আসছিল আল্লাহ্‌র কিতাবের বাণী। একবার চিন্তা করুন আল্লাহর বাণী কত চমৎকার, সম্মানিত, আর তা যদি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-এর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়—তবে তার সৌন্দর্য কেমন হতে পারে! আপনি যখন ইন্টারনেটে একজন ছোট্ট শিশু অথবা কোনো বিখ্যাত ক্বারীর তিলাওয়াত শুনেন—তা আপনার হৃদয় প্রশান্ত করে। এই তিলাওয়াত আপনার বন্ধ করতে ইচ্ছে করে না এবং আপনি এটা শুনতে থাকেন একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার এবং বারবার। সেই শিশুটি অথবা সেই বিখ্যাত ক্বারী গত চৌদ্দ শতাব্দীর অনেকগুলো মানুষের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে এই কুরআন পেয়েছে। সুতরাং এটা ভেবে দেখুন যে, কত সুন্দর হতে পারে এই কুরআন সেই প্রথম মানুষের কণ্ঠে—যার কাছে আল্লাহ এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন! চিন্তা করুন, যে রাসূল (ﷺ) স্বয়ং জিবরীল (عليه السلام)-এর কাছ থেকে শুনেছেন তাঁর নিজের কুরআন তিলাওয়াত কতটা সুন্দর আর অন্তর প্রশান্তকারী হতে পারে! তিনি তিলাওয়াত করছিলেন,

> **"নক্ষত্রের কসম, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।" (সূরাহ আন-নাজম: আয়াত ১-৩)**

তিনি তিলাওয়াত করতে করতে সূরাহ নাজমের শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন,

> **"তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং হাসছ, ক্রন্দন করছ না? তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ, অতএব আল্লাহকে সেজদা কর এবং তাঁর ইবাদাত কর।" (সেজদাহ) (সূরাহ আন-নাজম: আয়াত ৫৯-৬২)**

তিলাওয়াত শেষ করে রাসূল (ﷺ) সিজদায় গেলেন এবং এই তিলাওয়াত কুরাইশদের এভাবে প্রভাবিত করেছিল যে—তারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাদের পদযুগল যেন নড়ছিল না, এবং তারাও সিজদায় পড়ে গেল। তারা এমনকি নিজেদের পা'কেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি—যখন তারা কুরআন শুনছিল। কুরআন শুনে মুহূর্তের মধ্যেই এই উম্মাহর ফিরআউনদের অন্তরের অবিশ্বাস এবং অহমিকা চূর্ণ হয়ে গেল। যারা হুমকি দিয়েছিল যে, রাসূল (ﷺ)-কে আর কখনো কাবায় সিজদা দিতে দেখলে তারা রাসূল (ﷺ)-এর ঘাড় মাড়িয়ে দেবে—তারাই কিনা রাসূলের সাথে সেই কাবা ঘরেই রাসূল (ﷺ)-এর পিছনে সিজদাবনত হয়ে গেল! কে এমনটা ভেবেছিল?

যেসব সাহাবিগণ আবিসিনিয়ায় (হাবশাহ) হিজরত করেছিলেন, তাঁরা এই ঘটনা শুনে মক্কায় ফিরে এলেন। তাঁরা শুধু এতটুকুই শুনেছিল যে, কুরাইশরা সিজদা করেছে।

আর বিশ্বাসীগণ ছাড়া কেউ কি সিজদা করতে পারে? সুতরাং সাহাবিরা ভাবলেন যে, কুরআনের প্রভাব তাদেরকে কুফর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

যখন তারা সিজদা থেকে মাথা উঠাল, তাদের অন্তর থেকে কুরআনের প্রভাব ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকল, কারণ তারা আর কুরআনের তিলাওয়াত শুনছিল না। পুনরায় তাদের অন্তর অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হতে শুরু করল। তারা বলছিল, আমরা এটা কী করলাম? আমরা মুহাম্মাদের সাথে তার রবের কাছে সিজদা করলাম? এটাই কুরআনের শক্তি, কুরআনের প্রভাব, কুরআনের অনুপম সৌন্দর্য। কুরআন তাদের অন্তরকে কেন নাড়া দিয়েছিল? তাহলে এই কুরআন আমাদেরকে নাড়া দেয় না কেন? কারণ তারা ছিল আরবি ভাষার পথিকৃৎ। তারা ছিল আরবি ভাষার উপর বাকপটুতার শীর্ষে এবং যখন তারা কুরআনের তিলাওয়াত শুনেছিল, তাদের সবাই কোনোরকম সন্দেহ ছাড়াই বুঝেছিল যে—কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মুজিযা এবং এটা আল্লাহর কাছ থেকেই অবতীর্ণ।

সুতরাং কুরআনের কাছে ফিরে আসুন এবং কুরআনের আলোতে আপনার অন্তরটাকে আলোকিত করুন। এর মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিন। নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষে পরিণত করে নিন। কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং বুঝুন। কুরআন পড়ার সময় শুধুমাত্র চোখ বুলিয়েই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ করবেন না। কুরআন বোঝার চেষ্টা করুন এবং এটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। আপনার জন্য একটি উঁচুমানের তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর ইবনু কাসিরের অনুবাদ এখন সহজলভ্য এবং আমি বিশ্বাস করি এটাই আমাদের সময়ের অনুবাদ জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্জন।

আমরা অনেক সময় কুরআনের একটা আয়াতে কিংবা হাদিসের অনুবাদ পড়ে, কিংবা অনেক সময় আক্ষরিক আরবি পড়েই মানুষজনকে তার মনগড়া ব্যাখ্যা বোঝাতে শুরু করি। এখন যদি আমরা দশজন বাকপটু ব্যক্তিকে একত্রিত করি, তাহলে দেখতে পাবো তাদের প্রত্যেকের কাছেই কুরআনের একটি আয়াতের আলাদা আলাদা মনগড়া ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব অজ্ঞ ব্যক্তিদের চটকদার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। আমরা বরং ইবনু কাসির খুলে দেখব সেখানে এই আয়াতের কী ব্যাখ্যা আছে। তেমনিভাবে কে কীভাবে হাদিসের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে সেদিকেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করব না, আমরা বরং বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী কিংবা মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ শারহে আন নববী খুলে দেখব সেখানে কী আছে! এবং সেটাই আমাদের কাছে শিরোধার্য। অনেকে হাদিসের অনুবাদ পড়েই সেই হাদিস বুঝে গেছেন বলে মনে করেন, অথচ এমন হতে পারে হাদিসটি সহিহ সনদেই বর্ণিত কিন্তু সেটি রহিত হয়ে গেছে। সালাফদের সঠিক ব্যাখ্যা না জেনেই নিজে নিজে পণ্ডিত হয়ে যাওয়ার এই রোগ নিজের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি অন্যদের জন্যেও।

রাসূল (ﷺ) কুরআন তিলাওয়াতের পুরস্কার বিশদাকারে বর্ণনা করেছেন। আমরা জানি যে, সেই পুরস্কার হচ্ছে প্রতি হরফের জন্য কমপক্ষে দশ নেকী।

কিন্তু দেখুন রাসূল (ﷺ) কীভাবে বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, “যদি তুমি কুরআন পড় তবে একটি ভাল কাজের সাওয়াব পাবে, সেই সওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে দশ গুণ। 'আলিফ' একটি বর্ণ, 'লাম' একটি বর্ণ এবং 'মীম' একটি বর্ণ (এর অর্থ এই তিনটি মিলে একটি বর্ণ নয়), প্রত্যেকটির জন্য তুমি দশটি করে নেকী পাবে এবং সেই তিনটির জন্য পাবে ত্রিশ নেকী।”

দেখুন কীভাবে তিনি এর বাখ্যা করেছেন এবং সাওয়াবের পরিমাণ দেখিয়েছেন। হিসেব করে দেখা গেছে যে, আপনি যদি পুরো কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ সূরাহ ফাতিহা থেকে শুরু করে সূরাহ নাস পর্যন্ত পড়ে শেষ করেন তাহলে আপনি প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন এবং দুইশ হাজার সাওয়াব পাবেন। আপনি কি এটা কখনো ভেবেছেন? এটা সাধারণ দিনের হিসেব, কিন্তু এটিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিন—এই তিলাওয়াত যদি রামাদান মাসে হয়, তবে পরিমাণ আরও অনেক অনেক বেশি। সাধারণ দিনে যখন আপনি পুরো কুরআন পড়বেন, তখন ত্রিশ মিলিয়ন এবং দুইশ হাজার সাওয়াব আপনার নামে লেখা হবে এবং তা আপনার ত্রিশ মিলিয়ন দুইশ হাজার পাপকে ধুয়ে মুছে একদম পরিষ্কার করে দেবে।

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, “আমি কুরআন পড়তে জানি না। আমি এটা রামাদান মাসে শেষ করতে পারি না, এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?” কোনো আয়াত বা কোনো হাদিসেই এটা বলা হয়নি যে, কুরআন কভার টু কভার পড়ে শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, জিবরীল (عليه السلام) রামাদান মাসে রাসূল (ﷺ)-কে পুরো কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন এবং সালফগণও পুরো কুরআন পড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু কুরআনের যেকোনো অংশ পড়ুন, আর এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ছোট সূরাহগুলো দিয়ে শুরু করুন। ছোট সূরাহগুলো কি গণনা করেছেন? সেগুলো কি কুরআনের অংশ নয়? ছোট সূরাহগুলো কে না জানে? সূরাহ ফাতিহা কে না জানে? সেগুলো বারবার পড়ুন। সূরাহ ইখলাস কে না জানে? একটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত, কালদুম ইবনু আল হাদম সূরাহ ইখলাস পড়তে ভীষণ ভালবাসতেন এবং এটা এতবার পড়তেন যে—আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে বললেন, তাকে বলো যে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।” আপনি গাড়িতে, বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে অথবা অফিসে এটা তিলাওয়াত করুন, তাহলে এর প্রতি আপনার ভালোবাসার দরুন আল্লাহও আপনাকে ভালবাসবেন।

প্রথমত, আল্লাহ আপনাকে ভালবাসবেন। দ্বিতীয়ত, যখন আপনি এই সূরাহ তিলাওয়াত করবেন আপনি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ার সমান সাওয়াব পাবেন। এটা তিনবার পড়ুন এবং আপনি পুরো কুরআন তিলাওয়াতের সমান সাওয়াব পাবেন। তৃতীয়ত, সূরাহ ইখলাসে সাতচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে। তাই যদি আপনি এটাকে দশ দিয়ে গুণ দেন, তবে আপনি চারশত সত্তর সাওয়াব পাবেন একটি সাধারণ দিনে।

এবং রামাদানে এই সাওয়াব বেড়ে আরও কতগুণ হবে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ আপনাকে ভালবাসবেন, আপনি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ার সাওয়াব পাবেন, চারশ সত্তর নেকী পাবেন এবং রামাদান মাসে আরও অনেক বেশি সাওয়াব পাবেন। আর কী চাই!

এভাবে চিন্তা করলেই আপনি কুরআনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বুঝতে সক্ষম হবেন। হয়তো এটাই হতে পারে আপনার সেই কাজ যা বিচার দিবসে আপনার ভাল কাজের পাল্লা ভারী করবে। আল্লাহ বলেন,

"আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব..." (সূরাহ আম্বিয়া: আয়াত ৪৭)

সরিষার দানা পরিমাণ কোন পুণ্য যেটি হয়তো এত ছোট যে, এই দুনিয়ার কোনো পাল্লা এর ওজন করতে পারে না। ব্যাপক গবেষণা হয় এমন সব ল্যাবের উন্নতমানের অনেক লক্ষ ডলারের স্কেল আছে, তা যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন—সেটাও এই ছোট্ট সরিষার বীজের সমান পুণ্যকে পরিমাপ করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ যখন কিয়ামাতের পাল্লা দিয়ে ওজন করবেন, তখন এই নগণ্য পরিমাণ ভালো কাজটিরও ওজন করা হবে। যে কাজটিকে হয়তো আপনি গোণাতেই ধরেননি, সেদিন আল্লাহর হিসেবে সেটাও গণনায় ধরা হবে।

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (সূরাহ যিলযাল: আয়াত ৭-৮)

কিন্তু ব্যাপারটা নিছক সাওয়াবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়—যা একজন বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। কেউ এই জীবনে কুরআন পড়েছে এবং হাশরের মাঠে তার পাপের পরিমাণ হয়তো তার পুণ্যকে অতিক্রম করেছে, তখন কুরআন তার মুক্তির জন্য শাফাআত করবে। হয়তো ভাবছেন কুরআন কথা বলবে কী করে। হ্যাঁ, কুরআন সেদিন আপনার পক্ষ হয়ে কথা বলবে।

যিনি এই দুনিয়ায় আপনাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই পরকালে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও কথা বলার শক্তি দান করবেন। যিনি এই দুনিয়ায় মানুষকে হাঁটার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই বিচার দিবসে মানুষকে তাদের মাথার উপর ভর করে হাঁটার শক্তি দেবেন।

"আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, মুক এবং বধির অবস্থায়.." (সূরাহ ইসরা: আয়াত ৯৭)

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, “দুনিয়াতে যে কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য মধ্যস্থতা করবে।” যারা হয়তো বিচার দিবসে আটকে যাবে, সবচেয়ে কঠিন বিপদে। আপনার সবচেয়ে প্রিয়জন আপনার মা-বাবা—তাঁরাও আপনাকে সেই অবস্থা থেকে বের করে আনতে পারবে না। কিন্তু সাওম এবং কুরআন সেদিন আপনাকে সাহায্য করবে, আপনার মুক্তির জন্য ছুটে আসবে। এটা আমাদের মতো গুনাহগারদের জন্য—যারা হয়তো তাদের যথাসাধ্য তিলাওয়াত করছে কিন্তু বিচার দিবসে তাদের পাপ তাদের পুণ্যকে ঢেকে ফেলবে। মুসনাদে আহমাদ, আত-তাবারানি এবং আল হাকিম থেকে একটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন, “কিয়ামতের দিন সাওম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে পানাহার এবং কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছিলাম, তাই তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন।” কুরআন আপনার কাছে ছুটে এসে বলবে “হে আল্লাহ, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম তাই তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন।” রাসূল (ﷺ) হাদিসের শেষে বলেন, তখন তাদের সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

সহিহ মুসলিমে আবু উমামাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেন, “দীপ্তিমান দুইটি সূরাহ (আল বাক্বারা এবং আলে ইমরান) পড়, কিয়ামতের দিন এগুলো দুটি মেঘরূপে আবির্ভূত হবে। তারা কিয়ামাতের দিন দুটি ছায়ার মতো উদয় হবে, আবির্ভূত হবে পাখির দুইটি ঝাঁকের মতো।” মুসলিমের বাইরে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, উজ্জ্বল আলোর মতো—যারা তার সঙ্গীদের জন্য সুপারিশ করবে।

এর পরেও কীভাবে আপনি কুরআনকে পরিত্যাগ করতে পারেন?

> **“এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে (এই কুরআনে বিশ্বাস না করা অথবা এ অনুযায়ী কাজ না করা ইত্যাদি), তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” (সূরাহ ত্ব-হা: আয়াত ১২৪)**

কুরআন থেকে যেকোনো প্রকারে দূরে সরে যাওয়া এই আয়াতের অধীনে পড়ে। সেটা কুরআন না পড়া কিংবা সে অনুযায়ী আমল না করা—যা-ই হোক না কেন। আপনি কি জানেন ضَنكًا মানে কী? আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه), আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) এবং আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) বলেন, এই আয়াতে ضَنكًا অর্থ—কবর তাকে চারপাশ থেকে চাপ দেবে। কিছু আলিম বলেন এটার অর্থ—সমস্যায় ভরা, উদ্বিগ্নতা সংকুল এবং হতাশাপূর্ণ জীবন।

কুরআন শোনা থেকেও কখনো নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। এতেও বিপুল পুরস্কার এবং উপকারিতা আছে। হয়তো সেটা তিলাওয়াতের মতো নয়, কিন্তু শোনাতেও বিশাল পুরস্কার এবং উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ যেন আমার বাবাকে পুণ্যময় দীর্ঘ

জীবন দান করেন, ওয়াল্লাহি আমার শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা দিনও আমি দেখিনি যেদিন উনার কুরআন না শুনে কেটেছে। সত্তর দশকের সেইসব বড় রেকর্ড থেকে, ভিনাইল রেকর্ডে, সাধারণ টেপ রেকর্ডে, সিডি থেকে এবং এখন উনার আইপ্যাডে—সব সময়ই তিনি সময় পেলেই কুরআনের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন। যখন তিনি কুরআন শুনেন না অথবা এটা শিক্ষা দেন না, তখন উনার অবস্থা হয় ডাঙায় উঠে আসা মাছের মতো। মাছ পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, আর আমার বাবা কুরআন ছাড়া স্থির থাকতে পারেন না।

আল্লাহ যেন আপনাদের অন্তর, কবর এবং ঘরগুলোকে কুরআনের উজ্জ্বলতায় ভরে দেন এবং এটাকে আপনাদের জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার এবং হাশরের মাঠে সুপারিশ করার অনুমতি দেন।

এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সাওয়াব

সহিহ আল বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ইবনু আব্বাস (ﷺ) বলেন, নবীজি (ﷺ) ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। রামাদান মাসেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে দানশীল মানুষ, যে মাসে জিবরীল (ﷺ) তাঁর সাথে কুরআন পড়তে আসতেন আর একে অন্যের সাথে মিলিয়ে নিতেন। ইবনু আব্বাসের ভাষায়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ছিলেন বহমান বাতাসের চাইতেও উদার।

কেন ইবনু আব্বাস (ﷺ) নবীজি (ﷺ)-এর উদারতাকে বহমান বাতাসের সাথে তুলনা করলেন? এর কারণ প্রথমত, তিনি দান করার ব্যাপারে এতটুকু বিলম্ব করতেন না—বাতাসের গতিতে দান করতেন। দ্বিতীয়ত, দান করার ব্যাপারে তিনি কখনো বৈষম্য করেননি। বাতাস যেমন সকলকে ছুঁয়ে যায়, ঠিক তেমনই ছিল নবীজি (ﷺ)-এর উদার হাত—তাঁর দানশীলতাও সকলকে ছুঁয়ে যেত।

ইমাম শাফি'ঈ (ﷺ) বলেছেন, "আমি চাই মানুষ যেন রামাদানে উদারহস্তে দান খয়রাত করে, এটাই নবীজি (ﷺ)-এর দেখানো পথ।" দেখা যায় রামাদানে অনেকেই সালাত আর ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর সাদাকার বিষয়টি পাত্তা দেয় না। সালাফরা বলতেন, রাদামান মানেই হলো কুরআন ও দান সাদাকার মাস, আর কিছু না। অর্থাৎ রামাদান মাসে অন্য কিছুর সাওয়াব এগুলোর সমান নয়।

আল্লাহর চোখে দানের পরিমাণ মুখ্য না, বরং দান করছেন কি না সেটাই আসল বিষয়। অনেকে কম পরিমাণ সাদাকা করতে পারে, সেটা সমস্যা না। কারণ, আল্লাহর চোখে এক টাকা দশ লক্ষ টাকার সমান হতে পারে। সুনানে নাসাঈতে বলা আছে, "এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সাওয়াব।"[৩২]

এক টাকা আপনাকে লক্ষ টাকার চেয়ে দামি সাওয়াব এনে দিতে পারে। কখন? যদি আপনার শুধু দুই টাকা থাকে আর সেখান থেকে এক টাকা দান করেন, তাহলে আপনি আপনার অর্ধেক সম্পদ দান করে দিলেন।

---

[৩২] সুনানে নাসাঈ: ২৫২৭

আর যে লোকটা লাখপতি, সে যদি আপনার সমান সাওয়াব পেতে চায়, তাহলে তাকে লক্ষ টাকা দান করতে হবে, কারণ তার সম্পত্তির অর্ধেক করলেও কয়েক লাখ টাকা হয়।

দান করার সময় আপনাকে নম্র হতে হবে। আপনার এটা ভেবে সম্মানিত বোধ করা উচিত যে, আপনাকে দান করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে। আপনার মুগ্ধ হওয়া উচিত এই ভেবে যে, আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এবং আপনি আল্লাহর জন্যই দিচ্ছেন। আর আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত এই কারণে যে, কেউ একজন তা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সাদাকার মাধ্যমে আপনি আসলে নিজেই নিজের উপকার করছেন।

> **"আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ২৭২)**

আপনি যদি গরীব সেই ভিক্ষুককে দান না করেন, আল্লাহ ঠিকই তার জন্য কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা করেই দেবেন। এই ভেবে সম্মানিত বোধ করুন যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন তাকে দান করার সুযোগ দিয়ে। তাই বেশি বেশি দান করুন, যাকে দান করছেন তাকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ এর মাধ্যমে আপনি অন্য কারো না, বরং নিজের উপকার করছেন।

কোনো ভালো আমলকে ছোট করে দেখবেন না। ইবনু উমার (ﷺ) সাদাকা করার জন্য তাঁর সাথে চিনি রাখতেন। সে যুগের চিনিকে তুলনা করা যেতে পারে আজকের যুগের ক্যান্ডির সাথে। মানুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করত, "আপনি চিনি কেন সাদাকা হিসেবে দান করছেন?" তিনি বলতেন, "কারণ আমি চিনি পছন্দ করি আর আল্লাহ বলেছেন,

> **"তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাসো। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ৯২)**

একবার উমার (ﷺ) একটা আঙ্গুর দান করলেন। মানুষজন বলতে লাগল, "মাত্র একটা আঙ্গুর! এটা না তৃষ্ণা মেটায়, না পেট ভরায়।" উমার (ﷺ) তখন কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

> **"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে।" (সূরাহ যিলযাল: আয়াত ৭)**

কিয়ামাতের দিনে আল্লাহ যখন মীযানে আমল পরিমাপ করবেন, তখন আল্লাহ এমন জিনিসও হিসেব করবেন যেটার ওজন শস্য দানার সমান। উমার (ﷺ) তাদেরকে বললেন, "এই আঙ্গুরের ওজন তো শস্য দানা থেকেও বেশি!"

যখন দান করবেন, নম্রতার সাথে দান করবেন এবং গোপনীয়তা বজায় রাখবেন। কারো যেন এমনটা মনে না হয়, আপনি দান করছেন বলে আপনার অবস্থান তাদের

ওপরে। মনে রাখবেন, যে সম্পদ আপনার আছে তা আসলে আপনার না। কখনোই ভাববেন না এগুলো আপনার নিজের সম্পদ। কুরআনে এমন অনেক আয়াত আপনি খুঁজে পাবেন, যেখানে আল্লাহ এই সম্পদকে তাঁর নিজের সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার কিছু আয়াতে এ সম্পদগুলোকে আমাদের বলেছেন। এখানে কোনো বৈপরীত্য নেই। সব সম্পদের মালিক আসলে আল্লাহ তাআলা, কিন্তু পরীক্ষা করার জন্য আমাকে আপনাকে এই সম্পদ দেওয়া হয়েছে। এজন্য সম্পদ আপনার, তবে তা শুধু পরীক্ষা করার জন্য—এছাড়া আর কিছুই না।

দুনিয়াদার লোকদের মতো বলবেন না, আমি গরিব, আমার টাকা নেই। ভেবে দেখুন, আপনি আসলে একজন লাখপতি, কোটিপতি—যদি আপনার পকেটে একটা ফুটো পয়সা না থাকে—তবুও। কীভাবে? আপনার শরীরে যে হৃৎপিণ্ড আছে, সেটা প্রতিস্থাপন করতে প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ টাকা। আপনার শরীরের যে কিডনি আছে,সেটা প্রতিস্থাপনের খরচও কয়েক লাখ টাকা। আপনার চোখ, আপনার কান প্রতিস্থাপন করতে প্রয়োজন লাখ লাখ টাকা। এই দামি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে চলছেন ফিরছেন, কেন আপনি নিজেকে গরিব মনে করবেন—আপনি তো অবশ্যই একজন কোটিপতি!

এক লোক ছিল কোটিপতি, একটা দুর্ঘটনার পর তার সমস্যা দেখা দেয়। সে যখন মলমূত্র ত্যাগ করত, সেগুলো তার শরীরের পাশে একটা প্লাস্টিকের থলেতে জমা হতো। তাকেই সেগুলো পরিষ্কার করতে হতো বাথরুমে গিয়ে। তার এই অসুস্থতা সারানোর জন্য অনেক অপারেশন করা হয়, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। সে বলত, “আল্লাহর কসম! এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমাকে যদি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয় বা ধার করতে হয়, আমি তা-ই করব।” ভেবে দেখুন, সে লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বা ধার নিতে চাচ্ছে শুধুমাত্র যেন সে টয়লেটে বসতে পারে। কাজেই নিজের দাম নির্ধারণ করতে ব্যাংক ব্যালেন্সের পরিমাণ দেখার দরকার নেই। আয়নায় নিজেকে দেখুন, আসলেই আপনি একজন কোটিপতি। কসম আল্লাহর, আপনার হৃদয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ থাকলেই আপনি কোটিপতি।

কাজেই মুক্তহস্তে দান করুন। এই রামাদানে আল্লাহ আপনাকে যা সম্পদ দিয়েছেন, সেখান থেকে সাদাকা করুন। তিরমিযির একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শপথ করে বলেছেন, “আল্লাহর কসম। সাদাকা করলে সম্পদ কমে না।”[৩৩]

সহিহ মুসলিমে একই হাদিস এসেছে শপথ ছাড়া। দান করলে সম্পদ কমে না। আমরা কি আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ)-এর কথায় বিশ্বাস করি?

---

[৩৩] তিরমিযি: ২৩২৫

আপনার যদি এই ব্যাপারে দ্বিধা কাজ করে, তাহলে বুঝতে হবে নবীজি (ﷺ)-এর ওপর আপনার ঈমান প্রশ্নবিদ্ধ।

সাদাকার করার কারণে যে পবিত্রতা অর্জিত হয়, সাদাকার প্রতিদান হিসেবে সেটাই যথেষ্ট।

> **"তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারো এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ কর, নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।" (সূরাহ আত তাওবা: আয়াত ১০৩)**

আপনার সাদাকা আপনার সম্পদ, স্বাস্থ্য, ঈমান আর আমলকে বিশুদ্ধ করে। আপনার যদি ৫০০ টাকা থাকে আর তা থেকে ১০০ টাকা দান করে দেন, তাহলে আল্লাহ সাক্ষী আছেন—আপনার সম্পদ কমে যাবে না। অনেকে হয়তো ভাবতে পারে, এটা কীভাবে সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, আল্লাহর কসম, আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই কথাই বলেছেন যে, দান করলে সম্পদ কমবে না। আর আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি, নিজেদের চাইতেও বেশি বিশ্বাস করি।

মানুষ চায় নিজের টাকাকে চোখের সামনে দেখতে। হোক সেটা নগদ, ব্যাংকের চেক কিংবা ব্যাংক একাউন্টে, আর এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে পারে না, তার এমন সম্পদও থাকতে পারে যা হয়তো সে চোখে দেখে না। দান সাদাকার মাধ্যমে হতে পারে আল্লাহ আপনাকে আসন্ন কোনো রোগ থেকে বাঁচাবেন—হয়তো সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা। হতে পারত আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে, ঔষধ কিনতে হয়েছে, কাজ থেকে ছুটি নিতে হয়েছে, ডাক্তার দেখাতে হয়েছে—যন্ত্রণার কথা বাদই দিলাম। কিন্তু আপনি আন্তরিক নিয়তে একশো টাকা সাদাকা করলেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে সেসব থেকে রক্ষা করলেন।

> **"তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন।" (সূরাহ সাবা: আয়াত ৩৯)**

আল্লাহ তাআলা বলেছেন যখন কেউ দান করবে, তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেনই। আপনি যদি ১০০ টাকা দান করেন, আল্লাহর শপথ, আপনার টাকা কমবে না। এই টাকা দান না করলে হয়তো গাড়ি জোরে চালানোর কারণে আপনাকে জরিমানা দিতে হতো, কিন্তু দান করার মাধ্যমে সেই টাকা ভালো কাজে ব্যয় হলো। আপনার স্ত্রী বা বাচ্চা অসুস্থ হতে পারত অথবা কোনো বিপদ আসতে পারত, কিন্তু আপনার আন্তরিক সাদাকার কারণে আল্লাহ আপনাকে এসব থেকে রক্ষা করবেন। দান করলে যে সম্পদে ঘাটতি হয় না, সেটা নিয়ে নিশ্চিত থাকুন। কেননা নবীজি (ﷺ) যখন বলেছেন সম্পদ কমবে না, তখন তা কমবেই না। যখন আল্লাহ বলেছেন প্রতিদান দেবেন, তার মানে তিনি অবশ্যই দেবেন। আল্লাহ হচ্ছেন আল কারীম—সুমহান দাতা।

তিনি যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই প্রতিজ্ঞা অবশ্যই রক্ষা করবেন। রামাদানের সাওয়াবপূর্ণ এই দিনগুলোতে সবচেয়ে ভালো দান হলো সেই পরিবারগুলোতে দান করা—যাদের কোনো না কোনো সদস্য জেলে বন্দী। আমাদের একটা ভয়াবহ সমস্যা আক্রান্ত করেছে তা হলো, আমাদের কোনো মুসলিম ভাই জেলে যাচ্ছেন আর তার পরিবারের কথা বাকিরা ভুলে যাচ্ছে—অবজ্ঞা করছে। কিছুদিন আগে এক বোন ফোন দিয়েছিলেন। তাঁর নাম উম্ম সালিম—একজন পর্দানশীন নওমুসলিম, তাঁর দুটো সন্তান আছে। তার মাঝে এক সন্তানের আবার বিশেষ যত্ন আর তত্ত্বাবধান দরকার। তাঁর স্বামী এখনো জেলে এবং আল্লাহর কসম, আমি এখনো জানি না কী কারণে তিনি জেলে। এটা আসলে এমন একটা বিষয় হয়ে গেছে যে, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। একজন নওমুসলিম বোন যার কোনো আশ্রয় নেই, সন্তানদের মুখে তুলে দেবার মতো কোনো খাবার নেই, এটা দুঃখজনক। আমি মানুষের কাছে তাঁর জন্যে দুইবার অর্থ সংগ্রহ করতে বলি এবং আমি ব্যাপক সাড়া পাই, বিশেষ করে আমার টুইটারে পোস্ট করার পর। আল্লাহ্ তাদের পুরস্কৃত করুন, আমি সেটা কখনোই ভুলব না।

অভাবের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয়েছিল স্থানীয় একটি মসজিদে। কর্তৃপক্ষ তাকে সাফ জানিয়ে দিল—আমরা তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। তারপরও তিনি তদবির চালিয়ে যান। এরপর মসজিদ থেকে অফিসিয়ালি জানিয়ে দেওয়া হয়—আমরা তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। সেই বোন শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করলেন, ঠিক আছে আমাকে ইমামের সাথে কথা বলতে দিন। ইমামের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলেন, ইমামকে সেই বোন জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কাকে ভয় পাচ্ছেন? মিডিয়া নাকি এফবিআই? ইমাম উত্তর দিলেন, আমরা মিডিয়া নিয়ে ভয় পাচ্ছি না, সমস্যা হচ্ছে এফবিআই। তখন সেই বোন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে অন্তত এফবিআইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন আমাকে সাহায্য করাটা কোনো সমস্যা কি না। যদি তারা বলে এটা করা যাবে না, তাহলে আমার জন্য আপনাদের কিছুই করতে হবে না, আমি সেটা মেনে নেব। ইমাম মুখের উপর সেই বোনকে না করে দিল।

যারা প্রয়োজনের সময়ে মুসলিমদের প্রতি ঠিক এই ইমামের মতো বিমুখ হয়ে যায়, হে মহান হালিম, আপনি তাদের প্রতি যেন বিমুখ হয়ে যান—যখন আপনাকে তাদের প্রবলভাবে প্রয়োজন।

আমরা মুসলিম দেশের স্বৈরশাসকদের নিয়ে অনেক কথা বলি। কিন্তু আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে, যারা এইসব স্বৈরশাসকদের চাইতেও কঠোর হস্তে মসজিদ পরিচালনা করে।

এরা যা করে তা মুবারক, আবদুল্লাহ আর গাদ্দাফি[৩৪] একত্রে হয়েও করতে পারবে না। এই উম্মাহর প্রয়োজন তাদের চিন্তাচেতনাকে তাওহীদের আলোকে পুনরুজ্জীবিত করা। এই ধরনের সংকীর্ণ মানসিকতা পরিত্যাগ করে তাওহীদের আলোকে চিন্তা করা উম্মাহর শেখা প্রয়োজন।

যদি এই মহিলা তাঁর খ্রিষ্টান পরিবার অথবা চার্চে ফিরে যেতেন, তাদের কাছে সাহায্য চাইতেন, তাহলে তারা তাঁকে ফিরিয়ে দিত না, তাঁকে খাবার আর থাকার জায়গা দিত—এটা নিশ্চিত। খ্রিস্টানদের একটি ফিরকা আছে যাদের বলা হয় জিহোভার সাক্ষীরা (জিহোভা'স উইটনেস), তাদের কাছে গেলে তারা আরো বেশি দিত, কিন্তু এই উম্মাহ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে—যা খুবই দুঃখজনক। যদি এই মহিলা পেটের দায়ে আবার খ্রিষ্টান হয়ে যান বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে আল্লাহর সামনে আমরা কী নিয়ে দাঁড়াব? তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের ক্ষুধা পেটে ঘুমাতে যাওয়ার জন্যে কে দায়ী থাকবে?

এই মহিলার ঘটনাটি একটি উদাহরণ মাত্র, কিন্তু সত্যি বলতে অনেক মসজিদেই এরকমটা হচ্ছে বা হয়ে আসছে। এমন অনেক বোন আছেন যাদের স্বামী জেলে বন্দী। আপনি এদের স্বামীদের মতাদর্শের সাথে একমত না হতে পারেন, কিন্তু আমরা বিষয়টা এভাবেই দেখব যে—আপনারা আমাদের বোনগুলোকে, তাদের অভাবী পরিবারগুলোকে পরিত্যাগ করেছেন।

এই ধরনের কাজে সাহায্য করতে গিয়ে যে ভয় আসে, তা আসে শয়তান আর শয়তানি নফস থেকে। আল্লাহ বলেছেন,

> **“এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকে ভয় কর।” (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১৭৫)**

শয়তান তার বন্ধু আর সাহায্যকারীদের ব্যাপারে মানুষের মনে এভাবেই ভয় সৃষ্টি করে। রামাদান মাসে শয়তান বন্দী থাকে সত্যি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক শয়তান মসজিদেই ঘোরাফেরা করে।

এই রমাদানে যাকাত দেওয়ার সবচেয়ে ভালো খাত হচ্ছে এমন একটি পরিবারকে খুঁজে বের করা, যেখানে কারো স্বামী জেলখানায় আছে। যে মহিলার স্বামী জেলখানায় আছে, তাকে বিধবার মতোই বলা চলে। আপনি নিজ উদ্যোগে নিজের এলাকা এবং

---

[৩৪] মিশরের স্বৈরশাসক হুসনি মুবারক, সৌদি বাদশা আব্দুল্লাহ, লিবিয়ার স্বৈরশাসক গাদ্দাফি। এর মধ্যে আব্দুল্লাহ বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছে, আর গাদ্দাফিকে হত্যা করা হয়। হুসনি মুবারক ক্ষমতা হারানোর পর দুর্নীতির দায়ে সাজা পেলেও আরেক স্বৈরশাসক সিসির আমলে মুক্তি পায়।—সাজিদ ইসলাম

আশেপাশে এমন পরিবার খুঁজে বের করতে চেষ্টা করুন এবং সরাসরি তাদের হাতে সাহায্য পৌঁছে দিন। তাদের কাছে গিয়ে নিজে হাতে যাকাত তুলে দিয়ে আপনি এমন এক শান্তি পাবেন, যা আর কিছুতেই পাবেন না। তাদের কাছে যান, সাদাকা দিন এবং বলুন এটা তার খাবারের জন্য, ঘরভাড়ার জন্য। আল্লাহর শপথ, এই ধরনের সাদাকার মিষ্টতা আপনি পরকালের আগে এই দুনিয়ার জীবনেই উপভোগ করবেন। কারাবন্দী ও তাদের পরিবারদের সাহায্য করার বিষয়টি বেশিরভাগ মানুষের অগোচরে থেকে যায়। বিষয়গুলো অজনপ্রিয় এবং অবহেলিত হয়ে গেছে।

আমাদের উচিত এই বিষয়গুলোতে সচেতনতা তৈরি করা। এই দায়িত্বগুলো পালন করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-এর মতে বন্দীদের মুক্তি নিশ্চিত করা সবচেয়ে উত্তম কর্তব্যের একটি। এই জামানায় যদি আমরা বলি, সবচেয়ে উত্তম সাদাকা হলো আপনার যাকাতের অংশ কারাবন্দী ও তাদের পরিবারদের দেওয়া—তাতে অত্যুক্তি হবে না।

আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেশির ভাগ মানুষ কারাগারে যাইনি, কখনো যেন যেতে না হয়। আমরা জানি না কারাগার কেমন। অনেকে মনে করেন কারাগারে কোনো খরচ নেই—এই ধারণাটা ভুল। কারাগারেও খরচাপাতি আছে। কারাগারে যে খাবার দেওয়া হয়, সেগুলো সত্যি বলতে খাওয়ার মতো নয়। কোনো কারাবন্দীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হলে সে প্রয়োজনীয় কিছু খেয়ে নিতে পারে। যে খাওয়া সেখানে দেওয়া হয়, সেগুলো আপনি খেতে পারবেন না—কেউই খেতে পারে না।

কারাবন্দীদের সাথে আপনার মতাদর্শগত পার্থক্যের কথা ভুলে যান। যারা বন্দী তাদের খাওয়ানো আমাদের অবশ্য কর্তব্য, মতপার্থক্য যা-ই থাকুক। নবীজি (ﷺ) সেইসব বন্দীদের সবচেয়ে ভালো খাবার খাওয়ানোর আদেশ দেন, যারা তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল। সাহাবিরা তাঁর আদেশ পালন করেছিলেন, তাঁদের কাছে থাকা সবচেয়ে ভালো খাবার সেই বন্দীদের দিয়েছিলেন—যা তাঁরা নিয়মিত খেতেন সেগুলো থেকেও ভালো খাবার।

আমি কারাগারে এমন অনেকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা মাদক, খুন কিংবা অন্যান্য অপরাধের জন্যে কারাবন্দী হয়েছিল। পরে তারা ইসলামের দিকে আগ্রহী হয়ে পড়ে। যখন আমি আবিষ্কার করলাম তারা আসলে খুব ভালো মানুষ হয়ে গেছে, তখন তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে আপনারা আপনাদের ঈমানকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন? তারা বলল, শাইখ আমরা ভুল করেছি, এই জীবন নষ্ট করেছি আর সম্ভবত আমরা এখানেই মারা যাব। তাই আমরা চাই এখান থেকেই যেন জান্নাতুল ফিরদাউসে যেতে পারি। আল্লাহর শপথ, একজন আঙুল উঁচিয়ে বলেছিল, আমি এইখান থেকে সরাসরি জান্নাতুল ফিরদাউসে যেতে চাই।

ভেবে দেখুন, আপনি একটু হেঁটে গেলেই হাতের কাছে ফ্রিজ পাচ্ছেন, বাসার কাছে বাজারে যেতে পারছেন, আর আপনার ভাই চার দেওয়ালের আড়ালে ক্ষুধা পেটে ঘুমাচ্ছে।

"তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।" (সূরাহ আল ইনসান: আয়াত ৮)

আল্লাহ্‌ সেইসব বান্দার প্রশংসা করছেন, যারা খাবারের প্রতি ভালোবাসা ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহকে ভালোবেসে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাবার প্রদান করে। এই তিনটি খাতের কথা আল্লাহ্‌ সুনির্দিষ্ট করে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এই সূরাহ নাযিল হয়েছিল মক্কায়। আমরা জানি, মক্কায় তখন কোনো মুসলিম বন্দী ছিল না। কিছু আলিমের মতে, এটা দিয়ে অমুসলিম বন্দীদের বোঝানো হয়েছে। যদি আল্লাহ্‌ তাআলা সেইসব লোকদের ভালো খাওয়া নিশ্চিত করতে বলেন, যারা মুসলিমদের হত্যা ও ধ্বংস করতে এসে বন্দী হয়েছে, তাহলে চিন্তা করে দেখুন যেসব ঈমানদার বন্দী অবস্থায় আছে—তাদের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কেমন হওয়া উচিত?

কারাবন্দীদের একটি তালিকা তৈরি করুন। জনপ্রতি দশ, বিশ, পঞ্চাশ টাকা করে দিন। এটা খুব বড় সংখ্যা নয়, কিন্তু দেয়ালের ওপারে এটাও অনেক। যে অমুসলিম আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে, সে ক্ষুধা পেটে ঘুমিয়ে যাবে এটা আমরা সহ্য করতে পারি না, সেক্ষেত্রে কালিমা পড়া একজন মুসলিমের জন্য এমন বাস্তবতা আমরা কীভাবে মেনে নিতে পারি?

এই ধরনের সাদাকার সৌন্দর্য হচ্ছে গোপনীয়তা। যখন আমি মদীনায় পড়ালেখা করতাম, সেখানে এক ছাত্র ছিল। আমার সাথে তার খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। তার পরিবার খুব ধনী ছিল না, তবে প্রতিমাসেই কিছু টাকা ছেলের জন্যে পাঠাত। আমরা একসাথে সুপারমার্কেটে যেতাম। সেই এলাকায় পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর বেচাবিক্রি হতো। যেমন- আপনি হয়তো সেখানে পুরো মাসের বাজার করবেন এবং তারা সেটা লেখে রাখবে, মাসের শেষে আপনি যাবেন এবং সেই টাকা পরিশোধ করে আসবেন। আমার সেই বন্ধুকে যে অর্থ তার পরিবার দিতো, তা সে কখনোই নিজের জন্য খরচ না করে একপাশে সরিয়ে রাখত। সে ঐ সুপারমার্কেটে গিয়ে জিজ্ঞেস করত, "এমন কোনো পরিবার কি আছে যারা টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে?" একবার দোকানি জবাব দিল, "হ্যাঁ, একজন বিধবা আছে যার কয়েকটি সন্তান আছে, কিন্তু কয়েক মাস যাবত সে টাকা পরিশোধ করতে পারছে না।" তখন আমার বন্ধু সেই জমানো টাকা থেকে তা পরিশোধ করে দিল। কেউই কিছু জানত না, আমার বন্ধু দোকানিকে বলে দিয়েছিল যেন কাউকে এই টাকা পরিশোধের কথা বলা না হয়। বিধবা শুধু এতটুকু জানবে, কেউ একজন তার হয়ে টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। কিছুদিন পর আমরা সেখানে যাই এবং দোকানি আমাদের জানাল, ঐ বিধবা টাকা

পরিশোধ করতে এসেছিল এবং তাকে বলা হয়েছে কেউ একজন তার হয়ে সব টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। এই কথা শুনে সেখানে দাঁড়িয়ে সে বারবার কাঁদছিল এবং যে তার টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে তার জন্যে দু'আ করছিল।

সহিহ মুসলিমে আছে, একবার এক ব্যক্তি গলার দড়িসহ একটি উট সাদাকা করেছিল। নবীজি (ﷺ) বললেন, "তুমি গলায় দড়িবাঁধা এমন ৭০০ উট পাবে জান্নাতে।"

যখন আপনি সাদাকা করার সময় কৃপণতা করবেন, তখন আসলে আপনি নিজের উপরই কৃপণতা করছেন। এই সাদাকা তো আপনার নিজের জন্যেই।

> **"যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপাকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ২৭২)**

যখন আপনি পিছপা হন এবং অপরকে সাদাকা করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করেন, আপনি আসলে নিজের সাথেই কৃপণতা করছেন, কেননা আল্লাহ বলেছেন, "এটা তোমাদের নিজের জন্যই।"

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে নবীজি (ﷺ) বলেন, "যে একজন এতিম অথবা একজন বিধবার যত্ন নেয় সে হচ্ছে একজন মুজাহিদের সমান অথবা ঐ ইবাদাতকারীর সমান, যে সারা রাত ইবাদাত করে এবং সারা দিন সাওম পালন করে।" একজন বিধবা ও একজন নারী যার স্বামী জেলে আছেন, তাদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? আল্লাহ একজন পতিতাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র একটি কুকুরকে পানি পান করানোয়। তাহলে কল্পনা করুন যদি আপনি একজন ক্ষুধার্ত কয়েদীকে, একটি ক্ষুধার্ত পরিবারকে খাওয়ান অথবা তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন—তবে সেই প্রতিদান কত বিশাল হতে পারে!

সাওমের মিষ্টতা

রামাদান অর্ধেকটা যেতে না যেতেই কেউ কেউ সাওম পালনের আনন্দ এবং উৎসাহ দুটোই হারিয়ে ফেলে। আবার অনেকের মধ্যে সাওম পালনের আনন্দ বা উৎসাহ শুরু থেকেই থাকে না। আল্লাহর অল্প সংখ্যক বান্দারাই প্রবল আনন্দ আর উৎসাহের সাথে রামাদান শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই মহান ইবাদাতে তাঁদের পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। আল্লাহ আমাদের এই অল্প সংখ্যকদের মাঝে শামিল করুন।

সাওম বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এর মধ্যে আমরা সেই সাওম-ই রাখতে চাই যে সাওমের সাথে মনের আনন্দ জড়িত, যেনতেনভাবে সাওম পালনে আমরা আগ্রহী নই। সাওম পালনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই, চোখের শীতলতা অর্জন করতে চাই, পাশাপাশি আমরা সাওম পালন করছি এটা ভেবে তৃপ্তি পেতে চাই। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

> **"হে বিশ্বাসীরা! সাওম তোমাদের ওপর ফরয করা হলো যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর,যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (সূরাহ বাকারা: আয়াত ১৮৩)**

"হে বিশ্বাসীরা! সাওম তোমাদের ওপর ফরয করা হলো।"—কিন্তু কেন ফরয করা হলো? তাকওয়া অর্জনের জন্য।

আয়াতটির কোথাও কিন্তু সাওম পালনের মাঝে মনের আনন্দ এবং চোখের শীতলতা খোঁজার ব্যাপারে সরাসরি কোনো নির্দেশনা দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ আল্লাহ্র অল্প কিছু সৌভাগ্যবান বান্দা ব্যতীত বেশিরভাগই সালাত কিংবা সাওমের এই গুপ্ত আনন্দ অনুভূতির সন্ধান পায় না। আমরা সেই অল্প কিছু বান্দার অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সালাতের ব্যাপারে বলতে গিয়ে সালাতের উদ্দেশ্যের ব্যাপারেও বলেছেন। তিনি বলেন,

> **"নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে আল-ফাহশা (সব ধরনের কাবীরা গুনাহ) এবং আল-মুনকার (কুফর, শির্ক এবং অন্যান্য শয়তানী কর্মকাণ্ড) থেকে।" (সূরাহ আল-আনকাবুত: আয়াত ৪৫)**

সালাত ফাহশা তথা কাবীরা গুনাহ এবং মুনকার তথা কুফর ও শির্ক থেকে দূরে রাখে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সালাত তাঁর চোখের শীতলতা এবং অন্তরের প্রশান্তি।[৩৫]

আল্লাহ কুরআনে তাকওয়া অর্জনকে সাওমের এবং গুনাহ ও কুফর থেকে দূরে থাকাকে সালাতের উদ্দেশ্য বলেছেন। আর তাই আমরা যদি তাকওয়া অর্জন এবং ফাহশা কাজ থেকে বিরত থাকতে চাই, তবে সেটা সাওম পালন এবং সালাত আদায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। এগুলো অর্জনের বাইরেও অন্য স্তর আছে, যা আসলে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্য। আবার এই উপরের স্তরের মধ্যেও অন্য কিছু অভ্যন্তরীণ স্তর আছে, এই সকল স্তরের সংখ্যা অনেক এবং এসকল স্তরে উন্নীত হতে হলে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে ইবাদাত করে যেতে হবে। আর এই স্তরগুলো যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা হতে পারবে, তাদের জন্যই বরাদ্দ।

এটা অনেকটা আমাদের ঈমানের মতো। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে আপনার ঈমানেরও এমন কিছু স্তর আছে। এই স্তর বিন্যাসের শুরুটা হয় ইসলাম দিয়ে, এর উপরে আছে ঈমান, আর এসবের উপরে তৃতীয় স্তরে আছে ইহসান। আর সাওমের উপরের স্তর হলো সাওমকে উপভোগ করতে পারা এবং এর মাঝে আনন্দ খুঁজে পাওয়া। শুধু বিশেষ বিশেষ বান্দাই এই অনুভূতি উপভোগ করতে পারেন। এই অনুভূতি তখনই বাস্তব হয়ে ধরা দেয়, যদি সাওম পালন করার সময় সাওম পালনকারী ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন যে—আল্লাহ্ তাঁকে দেখছেন। যেভাবে আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন,

"ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা, যেন আপনি তাঁকে দেখছেন।"[৩৬]

রাসূল (ﷺ) তাইফে গেলেন। এটা ছিল এমন এক পাহাড় যাতে চড়া বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। যখন তিনি পর্বতচূড়ায় পৌঁছলেন, তাইফবাসী পাহাড়ের নিচে পর্যন্ত তাঁকে প্রস্তরবর্ষণ করতে থাকল। তাঁর শরীর জুড়ে রক্ত ঝরছিল, তিনি ক্লান্ত ছিলেন, হৃদয় গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিল—তবুও সেই কঠিন সময়ে তিনি বলেছিলেন,

"ও আল্লাহ! আপনি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে যা হয়েছে তা কিছুই না!"[৩৭]

তিনি যা বলেছেন তা যেন ছিল বরফশীতল পানির মতন যা কিনা অসম্ভব পিপাসার্ত মানুষের পিপাসা মেটাতে সক্ষম। সুবহানআল্লাহ! কত সুন্দর উক্তি!

---

[৩৫] মুসনাদে আহমাদ: ১২২৯৩

[৩৬] সহিহ বুখারি: ৫০, সহিহ মুসলিম: ১০২

[৩৭] মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ৯৮৫১

আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের মাধ্যমে নবীকে যে উজ্জ্বল আলো দিয়েছেন, সে আলোর উজ্জ্বলতা যেন এই উক্তি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে! এখন অনেকেই হয়তো বলবে, এর মানে কি এই যে—ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও কেউ আনন্দে থাকতে পারে? হ্যাঁ, যদি ক্ষুধার্ত থাকাটা শুধু আল্লাহর জন্য হয়, তবে সে অবস্থাতেও আনন্দ আছে।

কেউ কেউ কেবল খাওয়ার মাঝেই আনন্দ খুঁজে পায়। এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য, যে ব্যাপারে কাফিরদের আর চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে মিল আছে।

> **"...যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ প্রাণির মতো ভক্ষণ করে...।" (সূরাহ মুহাম্মাদ: আয়াত ১২)**

তাদের জীবনটাই খাওয়া-দাওয়াকে কেন্দ্র করে আর তাদের জন্য এটাই সব, আর একজন মুমিনের কাছে কখনও কখনও ক্ষুধার্ত থাকাটা ক্ষুধা নিবারণের চেয়েও অধিক আনন্দের। অল্প কিছু বান্দার পক্ষেই এটা অনুধাবন করা সম্ভব। সাওমের মধ্যে যে আনন্দ, মাধুর্য, স্নিগ্ধতা, উপভোগ্য ব্যাপার, উত্তেজনা এবং অপূর্ব সুবাস—আপনি তা কেবল তখনই বুঝতে পারবেন, যখন আপনি অনুভব করতে পারবেন যে—আপনি তো সাওম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই পালন করছেন।

অনেক হাদিসে কুদসী আছে যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—সাওম কেবল তাঁরই জন্য। আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে, আপনার এই ত্যাগটুকু শুধু আল্লাহর জন্য, আর এটাই হলো ঈমান ও ইহতিসাবের প্রকৃত অর্থ। মক্কার তপ্ত রোদে বেলাল (ﷺ) -এর উপর চাবুকের আঘাত করা হচ্ছিল এবং এমন পাথরের চাপ দেওয়া হচ্ছিল যা মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই তীব্র কষ্টের পরিস্থিতিও বিলাল (ﷺ)-এর জন্য কষ্টকর হতে পারেনি, কারণ বিলাল (ﷺ) জানতেন যে—এই সবকিছু তিনি আল্লাহর জন্যই করছেন।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যায়। ধরুন, একজন তার স্ত্রীর জন্য গিফট কিনতে মার্কেটে গেল। সে এক মার্কেট থেকে আরেক মার্কেটে দৌড়াচ্ছে—হোক বাইরে বৃষ্টি, তুষারপাত অথবা প্রচণ্ড গরম। সে চেষ্টা করছে যেন সবচেয়ে ভালো দামে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা তার স্ত্রীকে উপহার দিতে পারে—এমন কিছু যা তার স্ত্রীর সাথে মানানসই হবে। সে উপহারটি র‍্যাপিং করাল এবং তার স্ত্রীকে দিল।

তারপর সেই স্বামী যখন তার স্ত্রীকে খুশি মনে উপহারটি খুলতে দেখে, তার আনন্দের সীমা থাকে না। স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসার কারণেই সে তাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে, আর এটা করতে পেরে শেষ পর্যন্ত তার কোনো কষ্টের কথাই মনে থাকে না। শপিং এ যাওয়ার কষ্ট, এক মার্কেট থেকে আরেক মার্কেটে ঘোরার কষ্ট, সেই গিফটের মূল্য যোগানোর জন্য তার হয়তো সপ্তাহ, মাস কিংবা বছরের পর বছর কষ্ট করতে হয়— নিমেষেই সব কষ্টের কথা সে ভুলে যায়।

এমন কী ছিল—যা তার সমস্ত কষ্টকে ভুলিয়ে দিল? শুধু তার প্রিয় মানুষটির হাসিমাখা মুখটা দেখে কেন সে এত কষ্টের কথা ভুলে গেল? এর কারণ— প্রিয় মানুষটির জন্য তার অকৃত্রিম ভালোবাসা।

আমার মায়ের একটা উদাহরণ দিই। আল্লাহ আমার এবং আপনাদের মায়েদের জন্য জান্নাতে প্রাসাদ বানিয়ে দিন। তিনি সারা দিন তাঁর বরকতময় পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রান্না-বান্না করতেন (বিশেষ করে রামাদানের দিনগুলোতে), সবচেয়ে ভালো এবং মজার খাবারগুলো তিনি বানাতেন। প্রায় সময় এটা হতো পরিবারের জন্য আর কখনও কখনও আমাদের বাসায় আসা শত শত মেহমানের জন্য।

প্রতিদিনের মতো তিনি ফজরের আগে জেগে উঠতেন কিয়ামুল লাইলের জন্য। এরপর আবার সারাটা দিন দাঁড়িয়ে থাকতেন রান্না ঘরে। আল্লাহ তাঁর এই সীমাহীন ত্যাগের জন্য তাঁকে ফিরদাউস আল-আ'লা নসীব করুন।

মাগরিবের পর আমরা আসতাম আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রম দিয়ে বানানো তাঁর রান্নাগুলো পনের মিনিটেই সাবাড় করে ফেলতাম। যখন তিনি তাঁর স্বামী, তাঁর কন্যা, পুত্র, নাতি-নাতনী এবং মেহমানদের খেতে দেখতেন, তখন তিনি খুব খুশি হতেন। কখনও তাঁকে বলতে শুনিনি যে, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব রেঁধেছি—কখনও না। তিনি বৃদ্ধা হতে লাগলেন এবং তাঁর তীব্র কোমর ব্যাথা সত্ত্বেও তিনি কখনও অভিযোগ করেননি—বলেননি যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে—বরং তিনি হাসিমুখে আমাদের প্লেটে আরও খাবার তুলে দিতেন। এসবের জন্য তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবেন এটাই ছিল সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা, আর ছিল আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা।

এই উদাহরণগুলো হয়তো আমাদেরকে সাওম উপভোগ করার ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করবে। যখন আপনি আপনার জিহ্বা এবং পাকস্থলীকে তাদের চাহিদা মতো উপকরণ দেবেন, তখন তারা শান্ত হবে। আর যখন আপনি আপনার হৃদয় এবং আত্মাকে তাদের খোরাক দেবেন, তখন তারাও প্রশান্ত হবে। সাওম উপভোগ করতে হলে তাই আপনাকে আপনার হৃদয় ও মনের চাহিদা পূরণ করতে হবে।

কীভাবে? নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি কেন সাওম রাখছেন। যদি মনকে বলেন, ওজন কমাতে সাওম রাখছেন—তাহলে কাজ হবে না। যদি বলেন, আমাকে সাওম রাখতেই হবে কারণ এটা আল্লাহর আদেশ—তবে এটাই হবে উপযুক্ত কারণ। শুধু এই কারণেই সাওম পালন করাটা আপনার জন্য ইবাদাত হবে, আর এই ইবাদাতের লক্ষ্য—আল্লাহ্ যেন আপনার সাওম কবুল করেন। কিন্তু আমরা শুধু আদেশ মানার স্তর থেকে আরও উপরের স্তরে যেতে চাই। যদি আপনি সাওম পালন করাটা উপভোগ করতে চান, তবে আপনাকে এটা হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে যে—আপনি শুধু আল্লাহর জন্যই সাওম রাখছেন। আল্লাহ চান যে আপনি তাঁর জন্য সাওম রাখুন।

তাই সাওম পালন করার ফলে আপনার হৃদয়ে এই অনুভূতিটুকু জায়গা করে নিবে যে, আপনি সেই কাজটিই করছেন যা আল্লাহকে খুশি করে। যদি আপনি কাউকে ভালবাসেন আপনি তা-ই করেন—যা তারা ভালোবাসে এবং তা-ই তাদেরকে দেন—যা তারা আপনার কাছ থেকে পেতে চায়। এটাই সত্যিকারের ভালোবাসা আর এটাই হলো সর্বোচ্চ চূড়া।

তাহলে কি আল্লাহ আমাদের কষ্ট দিতে চান?

আসলে আল্লাহ চান আপনি যেন সুখে থাকেন। রামাদানে আপনি যা কিছু অর্জন করেন—তাকওয়া, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভয়, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা আর নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া—এ সবকিছু অর্জন করতে গিয়ে রামাদানে আপনার খুব সামান্যই কষ্ট হয়। কারণ রামাদানে আসলে খাবার সময়কে শুধু একটু পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। কীভাবে এটা কষ্টের হতে পারে, যখন এই মাসটাই কিনা অসংখ্য মুসলিমের প্রিয় একটি মাস? তারা সবসময় বলে—রামাদানটা বেশ তাড়াতাড়িই চলে গেল। তারা বলে আমরা আমাদের খাবার সময়কে পিছিয়ে দেব, রাত জেগে সালাত আদায় করব কিন্তু আমরা পরবর্তী রামাদান আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

তাওহীদকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন সাওম পালনের মাধ্যমে, সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। আমরা সবকিছু করি আল্লাহর জন্য, দানও করি আল্লাহর জন্য। শুধু আমাদের খাবার আর পানীয় ত্যাগ না, বরং আমাদের জীবন, সম্পদ এবং মর্যাদাও শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই। যখন আপনি এমনটা করতে পারবেন, তখনই সেই কাঙ্ক্ষিত অনুভূতিটি নিজের মাঝে খুঁজে পাবেন; কারণ এর মাধ্যমে আপনার আত্মা তার আসল খোরাক পেয়ে গেছে। আপনি কাউকে যত বেশি ভালোবাসেন, ততই আপনার মাঝে তাকে খুশি করার প্রেরণা জাগে, আপনি সবসময় সময়-সুযোগ খুঁজতে থাকেন তাকে খুশি করার জন্য। রামাদানের বাইরের দিনগুলোতে এই শুষ্ক ঠোঁট এবং অভুক্ত পাকস্থলী বিরক্তিকর লাগে, এমনকি কখনও কখনও যন্ত্রণাদায়কও মনে হয়। কিন্তু যখন এই একই বিষয়গুলো রামাদানে ঘটে, তখন তার হৃদয় আনন্দে ছেয়ে যায়, যেমনটা নবীজি (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল তাইফে, তিনি যেমন আল্লাহকে বলেছিলেন,

“যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও, তবে আমি আর কিছুরই পরোয়া করি না।”

কারণ এই ত্যাগ তো আল্লাহরই জন্য।

পাকস্থলীতে কিছুই নেই, কিন্তু তা অপূর্ণ থাকার কষ্টের অনুভূতি দূর হয়ে যায় এটা জেনে যে, আল্লাহ দেখছেন, এবং তিনি জানেন যে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই তাঁর বান্দা প্রবৃত্তিকে দমন করেছে। যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে অন্য কোনো উপায়ে তার পেট ভরাতে চাইবে না।

সে কষ্ট স্বীকার করবে, তাও আবার বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে তার সাওম কবুল হওয়ার জন্য এই দু'আ করে যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। কারণ আল্লাহ যদি তার সাওম কবুল করে নেন, তবে এই ক্ষুধা-তৃষ্ণা এসব কোনো ব্যাপারই না। ঠোঁটগুলো শুষ্ক, গলা তৃষ্ণার্ত, কিন্তু আপনার হৃদয় ভাবাবেগে পূর্ণ এটা জেনে এবং সেই দিনটির অপেক্ষায় থেকে—যেদিন আপনার সাক্ষাৎ হবে বিশ্বচরাচরের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে।

আর এটাই এই হাদিসটার অর্থ, "যে সাওম রাখে সে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যাবে, যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।"[৩৮]

হাশরের দিনে কিছু কিছু লোক তাদের ঘামে নিমজ্জিত থাকবে যার যার গুনাহ অনুযায়ী। কারও কারও চেহারা অন্ধকার হয়ে থাকবে।

> **"সেদিন (হাশরের দিন) কিছু চেহারা হবে শুভ্র আর কিছু চেহারা হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।" (সূরাহ আলে-ইমরান: আয়াত ১০৬)**

কেউ কেউ তাদের মুখের ওপর ভর দিয়ে হাঁটবে।

> **"...এবং আমি তাদের হাশরের দিন একত্রিত করব, তাদের মুখের ওপর, অন্ধ, বোবা এবং বধির।" (সূরাহ ইসরা: আয়াত ৯৭)**

কেউ কেউ হবে অন্ধ, যদিও তারা দুনিয়ার জীবনে দেখতে পেত।

> **"...এবং আমরা তাকে হাশরের দিনে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (সূরাহ ত্ব-হা: আয়াত ১২৪)**

আর সাওম পালনকারীরা? আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তারা থাকবে আনন্দে উদ্বেলিত।

মানুষের অন্তর যখন ভয় এবং আতঙ্কে কম্পমান, সাওম পালনকারীরা তখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে থাকবে, এই মহা আকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাতের জন্য তারা আর অপেক্ষা করতে চাইবে না।

যারা কখনও ইহসান মানে কী তা অনুভব করেনি, তারা এসব শুনে হাত দিয়ে মাথা চাপড়াতে পারে আর বলতে পারে তোমরা পাগল। সাওম রাখতে হবে তাই রাখব, কিন্তু তা উপভোগ করব কী করে! সবাই এসব বুঝবে না, কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা একদিকে আর আনন্দ-আহ্লাদ আরেক দিকে। আপনি দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিসকে এক করার চেষ্টা করছেন। এটা যেন চুম্বকের দুই উত্তর মেরু আর দুই দক্ষিণ মেরুকে লাগানোর চেষ্টা—যেটা কখনও হবার নয়।

---

[৩৮] সহিহ মুসলিম: ২৭৬৩

ইবাদাতের মাঝে আনন্দ অনেকটা অলৌকিক কিছুর মতো। সবাই এটা বুঝতে সক্ষম হবে না। শুধু আল্লাহ্‌র কিছু সৌভাগ্যবান বান্দারাই এই অলৌকিকতার স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম। যাদের আল্লাহ ইহসান দান করেছেন তারাই এর মর্ম বুঝবে, অনুধাবন করবে এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে। আপনার নিয়ত, লক্ষ্য ও প্রেরণা হবে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে—তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁকেই সন্তুষ্ট করা। আপনার লক্ষ্যই এখানে আপনার হাতিয়ার। তাই দৃঢ়তার সাথে সাওমের জন্য অগ্রসর হোন, ঠিকই আপনি সাওমের মাঝে আনন্দ আর প্রশান্তি খুঁজে পাবেন।

এই পৃথিবীতে কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করার মাধ্যমেই আমরা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাব ইনশাআল্লাহ। এই বিষয়টাই ভাবুন, দেখবেন আপনার সাওম কষ্ট থেকে আনন্দে রূপ নিবে। কল্পনা করুন যে, এই দুনিয়ার কষ্টগুলো আপনাকে ফিরদাউসের উপরের স্তরে নিয়ে যাবে। আমরা সর্বোচ্চটাই প্রত্যাশা করব এবং আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনও দুনিয়া নয়। আপনি পৃথিবীতে যে ত্যাগই স্বীকার করুন না কেন, তা আখিরাতে আপনি যা পেতে যাচ্ছেন তার তুলনায় কিছুই নয়। জান্নাত অনেক দামি, এটা মোটেও সস্তা কিছু নয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর পুরস্কার অত্যন্ত দামি।[৩৯]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবার পর আরো কিছু বিষয় আছে যা আপনাকে সাওম উপভোগ করতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, আপনি একটা বদ্ধ রুমে আছেন, ক্ষুধায় আপনার পেট ডাকাডাকি করছে আর আপনার সামনে আছে এক গ্লাস পানি। চিন্তা করুন, তীব্র গরমের দিনে সাওম পালন করছেন, আপনি একাকী আছেন আর খাবার এবং পানি আপনার থেকে মাত্র এক হাত দূরে। সব আপনার কাছে থাকা সত্ত্বেও, আপনি একা হবার পরও যখন ঐ খাবার কিংবা পানি ছুঁয়েও দেখবেন না, তখন আপনাকে এই ভাবনাটাই আনন্দ দেবে যে—আপনি আপনার নাফসের ওপর অনেক শক্তিশালী হয়েছেন এবং আরো জানবেন যে—আপনার দু'আর শক্তি এখন কিছুটা জোরদার হবে। কারণ এখন আপনি আপনার দু'আয় আপনার এই আমলকে ওয়াসীলা হিসেবে তুলে ধরতে পারবেন।

আপনি দু'আয় বলতে পারবেন, ও আল্লাহ! আমি একা ছিলাম, তৃষ্ণার্ত ছিলাম, কেউ জানত না, কেউ আমাকে আটকাতও না। আমি রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্টটায় থামতে পারতাম, কেউ আমাকে দেখতও না, জানতও না। ও আল্লাহ! কখনও কখনও আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম এবং গুনাহেও জড়িয়ে পড়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দাও। ও আল্লাহ! আমার এক হাত দূরত্বেই পানি আর বরফ ছিল, শুধু তোমার জন্য আমি ওগুলো এড়িয়ে গিয়েছি। তাই আমাকে চাকরিটা পাইয়ে দাও, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার তাওফিক দাও, আমার অসুস্থতা দূর করে দাও, অথবা আপনার আর যে

---

[৩৯] তিরমিযি: ২৪৫০

চাওয়াই থাকুক—তার জন্য দু'আ করুন। হাশরের দিনে মানুষ ভীষণ আতঙ্কে থাকবে। জাহান্নামকে সামনে নিয়ে আসা হবে, এবং কিছু লোককে সেখানে সরাসরি নিক্ষেপ করা হবে।

"এবং সামনে নিয়ে আসা হবে জাহান্নামকে...।" (সূরাহ আল-ফাজরঃ আয়াত ২৩)

রাসূল (ﷺ) চিৎকার করে বলবেন 'ইয়া রব্বি সাল্লিম সাল্লিম' আর হাজির হবে জাহান্নাম। সহিহ মুসলিমে ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "হাশরের দিনে জাহান্নামকে আনা হবে সত্তর হাজার দড়িতে বেঁধে এবং প্রতিটা দড়ি টানবে সত্তর হাজার ফেরেশতা।"

এমন সময় আপনারা শুনবেন ফেরেশতারা বলছে, আব্দুল্লাহ, সলিহ, জামাল, অমুক, তমুক—তুমি জাহান্নাম থেকে সত্তর হাজার বছর দূরে এবং আরও সত্তর হাজার বছর দূরে এবং আরও সত্তর হাজার বছর দূরে। আপনি কি জানেন কোন কাজের কারণে জাহান্নাম থেকে আপনি সত্তর হাজার বছর দূরে সরে যাচ্ছেন? এ হলো রামাদানের বাইরের দিনগুলোতে আপনার রাখা সাওমগুলো। রামাদানের সাওমের ক্ষেত্রে এই হিসেব আরও বেশি হয়। অন্যান্য বর্ণনায় বলা হয়েছে সেটা আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের সমান। অর্থাৎ সত্তর বছর গুণ ত্রিশ মোট একুশশো বছর হবে জাহান্নাম এবং আপনার দূরত্ব, আর এটা শুধু একটা রামাদানের জন্য, অন্যান্য নফল সিয়াম বাদ দিয়েই। আপনার এবং জাহান্নামের দুরত্ব হবে হাজার হাজার বছরের। আপনি আসলেই এসবের উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ এবং তাফাক্কুর করার পরও যদি আপনার হৃদয় পুলকিত না হয়, আপনি সাওম উপভোগ না করেন—তবে দুর্ভাগ্য আপনার জন্য!

এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন, তাহলে আপনার ক্ষুধা আর তৃষ্ণাকে আপনি উপভোগ করা শুরু করবেন। জান্নাতের সামনে লোকেদের ভিড় থেকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রবেশ করতে বলা হবে এবং আপনাকে বলা হবে আর-রাইয়ান নামক গেইট দিয়ে প্রবেশ করতে। যদি এটা জেনেও আপনি অনুপ্রাণিত না হন, তবে আর কীসে আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে!

আর-রাইয়ান মানে যা তৃষ্ণা মেটায় এবং সন্তুষ্ট করে। আপনি আল্লাহর জন্য অনেক কিছুই পরিত্যাগ করেছেন, এখন আল্লাহ আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন—এটাই হলো আর-রাইয়ানের অর্থ। যখন আপনি বসে বসে এই বিষয়ে তাফাক্কুর করেন, আপনি গভীরভাবে অনুভব করুন এবং কল্পনা করুন যেন তা হচ্ছে এখনই, তখন তা আপনার ইবাদাতে প্রশান্তি নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

যখন জান্নাতে লোকেরা লেভেল এক, দুই, তিন পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাচ্ছে আর আপনি উপরে উঠছেন আর উঠছেন, কেবল আপনার সাওমের কারণে।

যখন আপনি এটা নিয়ে তাফাক্কুর করবেন, কল্পনা করবেন, হিসেব কষবেন—তখন আপনার হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে যাবে—সাওমে পালন তখন আপনার মনে শীতলতা নিয়ে আসবে।

ভুলে যাওয়া ইতিহাস: আন্দালুস বিজয়

রামাদান যদিও প্রধানত ইবাদাতের মাস হিসাবে গণ্য, তবে এর বাইরেও এই মহিমান্বিত মাসে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বিজয় অর্জনের পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণ বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'বদরের বিজয়'—যেটাকে কুরআনে হক বাতিলের 'চূড়ান্ত ফয়সালার দিন' হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

> **"চূড়ান্ত ফয়সালার (হক ও বাতিলের মধ্যকার) দিন, যেদিন মুখোমুখি হয়েছিল উভয় সেনাদল (মুসলিম ও কাফের)।" (সূরাহ আনফাল: আয়াত ৪১)**

রামাদানে বদর যুদ্ধে বিজয় দানের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ্ ইসলামকে মহিমান্বিত ও সুদৃঢ় নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত করেছেন। মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ফাতহে মক্কাও অর্জিত হয়েছিল এই মাসেই।

> **"নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।" (সূরাহ ফাতহ: আয়াত ১)**

রাসূল (ﷺ) ও সাহাবিদের পরবর্তী যুগে ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ছিল 'আইন জালুতের যুদ্ধ'। এই বিজয়ও অর্জিত হয়েছিল বরকতপূর্ণ রামাদানে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকের সমাজের অনেক মুসলিমই, বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মের অনেকেই হয়তো তাৎপর্যপূর্ণ এ বিজয়ের কথা জানে না, আর জানে না বলে তারা এ বিজয়ে গর্ববোধও করে না।

এ ঘটনার সূত্রপাত হয় মূলত উসমান ইবনু আফফান (رضي الله عنه) যখন কনস্ট্যান্টিনোপোল বিজয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন, যদিও সে যাত্রায় তিনি সফল হতে পারেননি। আত-তাবারি, ইবনু কাসির এবং আল-হুময়ারীর মতো ইতিহাসবিদদের মতে উসমান ইবনু আফফান (رضي الله عنه) যখন কনস্ট্যান্টিনোপোল প্রবেশে ব্যর্থ হন, তিনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সেখানে প্রবেশের উপায় বলে দিয়ে যান। পানি পথের মাধ্যমে সেখানে প্রবেশের পরামর্শ দেন তিনি। কনস্ট্যান্টিনোপোল বিজয় ছিল তৎকালীন বহু মুসলিম নেতাদের প্রধান লক্ষ্য, আর এক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করতে পারা ছিল মহা সম্মানের।

উসমান ইবনু আফফান (ﷺ) বলেছিলেন, "স্পেন (তৎকালীন আন্দালুস) বিজয়ী ব্যক্তি কনস্ট্যান্টিনোপোল বিজয়ের মর্যাদা ও মহাপুরস্কারের ভাগীদার।" প্রশ্ন হতে পারে তিনি এ কথা কেন বললেন? কারণ স্পেন ছিল মূলত কনস্ট্যান্টিনোপোলের প্রবেশদ্বার।

যখন মুসললিমরা মরক্কো হয়ে উত্তর আফ্রিকা পৌঁছে—মূসা ইবনু নুসাইর ছিলেন সেখানকার তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)-এর শাসনামলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন মুসলিম ইতিহাসের মহান বীরদের একজন। তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন, যার জন্য তাঁকে হয় মরুভূমির পথে না হয় আন্দালুসের দিকে যেতে হতো। তিনি আন্দালুসকেই বেছে নেন, কারণ তিনি সেখানকার মানুষদের স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। সেইসাথে সেখানকার মানুষের জন্য কিছু করার তাড়নাও তাঁর ছিল, আর একজন মুসলিম মূলত ভূখণ্ডের জন্য নয়, বরং মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবানের জন্যই যুদ্ধ করে। এই লক্ষ্যেই তিনি আন্দালুস বিজয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন, যদিও তিনি ভালোমতোই জানতেন কাজটা মোটেই সহজ নয়।

অভিযানকে ঘিরে ছিল বহু প্রতিবন্ধকতা আর জটিলতা। প্রথম প্রতিবন্ধকতাটা ছিল ১৩ কিলোমিটার পানিপথ পাড়ি দেওয়া, কারণ সেসময় তাঁর বাহিনীর কোনো জাহাজও ছিল না। এছাড়া ক্রুসেডারদের আক্রমণের আশংকা তো ছিলই। শত্রু সীমানায় পৌঁছানোর পূর্বে ক্রুসেডারদের অধীনে থাকা কিছু ছোট ছোট দ্বীপ অতিক্রম করতে হতো এবং শঙ্কা ছিল পিছন থেকে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার। ব্যাপক সংখ্যক ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত সেনাবাহিনীও তাঁর ছিল না, অধিকন্তু আন্দালুসের বিস্তীর্ণ ভৌগলিক বিষয়ে তিনি ভালোভাবে জানতেনও না। এত কিছুর পরেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত হতে পিছুপা হননি বরং যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা তাঁকে আরও বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তোলে। একপর্যায়ে তিনি জাহাজ তৈরি শুরু করেন। এই জাহাজ তৈরির কৌশল তিনি মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (ﷺ)-এর প্রতিবেশী থাকার সময় তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলেন। তাছাড়া তাঁর বাবাও মুআবিয়া (ﷺ)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই জাহাজ তৈরির কাজ শুরু হয় হিজরতের ৮৮ বছর পর, ৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে।

মূসা ইবনু নুসাইরের জীবনীতে আলোকপাত করলে দেখা যায় তাঁর প্রস্তুতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল মুসলিমদের, বিশেষ করে নও-মুসলিমদেরকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। কাঠামোগত পদ্ধতিতে ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে বিজয়ের পথ সুগম হয়। কিন্তু দ্বীনি শিক্ষা ছাড়াও অনেককেই আবেগতাড়িত করা সম্ভব, যে বিষয়ে তাঁর ভালো দখল ছিল। নুরুদ্দীন যাংকী (ﷺ)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁরা মানুষদের তৈরি করেছেন শিক্ষা ও হালাকার মাধ্যমে। সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (ﷺ) একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেই সেনাবাহিনী নিয়ে ক্রুসেডারদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েননি, বরং দীর্ঘ সময় নিয়ে তিনি নিজের সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন—তাদেরকে ধর্ম-কর্ম, তাজবীদ, উসুল, ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষা দানের মাধ্যমে প্রস্তুত করেছিলেন আল্লাহ্র সৈনিক হিসেবে।

মূসা ইবনু নুসাইর অনারব বার্বার আমাজিঘদের জন্য নিবিড় ইসলাম শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম শিক্ষায় শিক্ষিত করে আল্লাহ্র দ্বীনকে হৃদয়ের গভীরে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন। বার্বার আমাজিঘদের পরিবর্তন সাধন ছিল মূলত খুবই দুঃসাধ্য কাজ, কারণ তারা ছিল খুবই কঠোর প্রকৃতির। তবুও আল্লাহর রহমত ও হালাকার নানান কৌশলে সফলতা আসে, যার প্রভাব পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘ ১৩০ বছরে ধরে আলজেরিয়া শাসনের সময় ফ্রান্স ইসলাম ধর্মকে সেখান থেকে মিটিয়ে দেবার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সেই অপচেষ্টা এমন হিতে বিপরীত ফল বয়ে আনে যে, পূর্বের যেকোনো যুগের তুলনায় সেই সময়ে এমনকি পরবর্তী সময়েও সেখানকার মুসলিমরা ইসলামের প্রতি আরও বেশি অনুরাগী হয়।

মূসা ইবনু নুসাইর কাঠামোগত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে আকিদা, তাওহীদ, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে বার্বারদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছিলেন। জ্বালাময়ী খুতবা দিয়ে জনসাধারণের আবেগ আন্দোলিত করার মাধ্যমে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করা মূসা ইবনু নুসাইরের জন্য কঠিন কিছু ছিল না। এ কাজে তিনি হয়তো সহজে সফলতা অর্জনও করতে পারতেন, কিন্তু তাতে চূড়ান্ত ফলাফল কেমন হতো? তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবলমাত্র খুতবার মাধ্যমে সাময়িক একটা সময় জনগণকে উজ্জীবিত রাখা গেলেও সময়ের সাথে সাথে সেই আবেগে ভাটা পড়বে, এক সময় আবেগ হারিয়ে যাবে। আবেগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে অবশ্যই তার আগে কাঠামোগত জ্ঞানার্জন জরুরি। মাত্র ৫ বছর আগেও যে বর্বর জাতি ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ত, মূসা ইবনু নুসাইরের মেহনতে তারাই এখন ইসলামেরই সৈনিক, যারা জীবন বাজি রেখে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যময় বিজয় অর্জনে সদা প্রস্তুত।

মূসা ইবনু নুসাইর তারিক বিন যিয়াদ নামের একজন বীর মুজাহিদকে সেনাপতি হিসাবে বেছে নেন। এই মহান মুজাহিদ হিজরতের ১০২ বছর পর ইন্তেকাল করেন। তারিক বিন যিয়াদ অনারব বার্বার আমাজিঘ গোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও মূসা ইবনু নুসাইর তাঁকে সকল আরবদের উপর প্রাধান্য দেন, কারণ আরব-অনারব জাত বিচার তাঁর কাছে ছিল তুচ্ছ, নগণ্য। জাতি-বর্ণ-গোত্র ইত্যাদি বিভক্তির ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলাল্লাহ'-তে বিশ্বাসী তাওহীদবাদী।

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদার অধিকারী, যে সর্বাধিক পরহেযগার।" (সূরাহ আল হুজরাত: আয়াত ১৩)

তারিক বিন যিয়াদ শুধু অনারবই ছিলেন না, তিনি ধর্মান্তরিতও ছিলেন। তিনি মূসা ইবনু নুসাইরের কাছে ইসলাম কবুল করেন এবং তাঁর কাছেই ইসলামের সকল স্তরের জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন—লালিত পালিত হতে থাকেন। একজন বীর মুজাহিদ মাত্রই আরেকজন বীর মুজাহিদ তৈরি করে, আর একজন কাপুরুষ থেকে আরেকজন কাপুরুষই তৈরি হয়। এটাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম—কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকতে পারে যা 'ব্যতিক্রম' হিসাবেই গণ্য। অনুরূপভাবে, বিভ্রান্ত নৈতিকতাহীন পশ্চিমা সমাজ তাদের মতোই বা তাদের চেয়েও অধিকতর বিভ্রান্ত প্রজন্ম সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে কাফিরদের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া আমাদের আলিমরা তাদের মতোই বিক্রি হয়ে যাওয়া জঘন্য কাপুরুষ প্রজন্ম তৈরি করে যাচ্ছে।

বলা যায়, মূসা ইবনু নুসাইরের নিবিড় তত্ত্বাবধায়নে তারিক বিন যিয়াদ সময়ের অন্যতম একজন আলিমে পরিণত হন, যিনি কিনা ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত অনারব এবং আজাদকৃত দাস। তিনি যে একজন আলিম ছিলেন এটা কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং ইতিহাসের আলোকেই এ কথা স্পষ্ট যে—তিনি অল্প বয়সেই কুরআন মুখস্থ করেন ও ফিকহ শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন। তারিক বিন যিয়াদ হিজরতের ৯২ বছর পর রামাদান মাসে ১২ হাজার সৈন্য (কারো কারো মতে ১৮ হাজার, কিন্তু সঠিক মত হলো ১২ হাজার) নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দালুসের মাটিতে পা রাখতে সক্ষম হন। সেখানে পৌঁছানোর পরপরই তিনি হৃদয় কাঁপানো দীর্ঘ এক ভাষণ দেন, যা আজও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি শুরু করেন-

"হে আমার ভাইয়েরা, আমাদের পিছনে পানি, সামনে শত্রু—এখান থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নেই আমাদের। সুতরাং সর্বাবস্থায় আমরা অবশ্যই ধৈর্যের সাথে আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকব।"

সাম্প্রতিক কিছু ইতিহাসের বইতে উল্লেখ করা হয় যে, সেখানে পৌঁছে তারিক বিন যিয়াদ জাহাজ পুড়িয়ে দেন যেন পিছু হটার কোনো সুযোগই না থাকে, এবং যাতে তাঁরা অধিকতর দৃঢ় থাকতে পারেন। এটা কাল্পনিক কথা, কারণ আন্দালুসের উপর প্রথমদিকের লেখা ইতিহাসের কিতাবাদিতে কোথাও এরকম কিছুর উল্লেখ নেই। প্রথমদিকের ইতিহাসের বইতে আন্দালুস বিজয়ের ব্যাপারে অনেক বিস্তারিত বর্ণনা থাকলেও জাহাজ পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। আসলেই এরকম কিছু ঘটে থাকলে এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা অবশ্যই ইতিহাসের প্রাচীন কিতাবাদিতে থাকত।

তারিক বিন যিয়াদ অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, আর সর্বশেষ যুদ্ধটি ছিল হিজরতের ৯২ বছর পরে ২৮শে রামাদানে। তাঁর পুরো বাহিনীর মধ্যে ৯ হাজার ছিল বার্বার আমাজিঘ আর বাকি সবাই আরব। এদের সকলের মরণপণ যুদ্ধে এবং ৩ হাজার শহীদের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দালুস ভূমি বিজিত হয়।

যুদ্ধের মাঝপথে আন্দালুস অধিবাসীদের সাথে তারিকের কিছু চুক্তি স্বাক্ষর হয়, যার একটিও তিনি কখনোই ভঙ্গ করেননি—যুদ্ধের সময়েও না। এমনকি যাদের সাথে এই যুদ্ধ হচ্ছিল, তাদের সাথেও তিনি কোনো চুক্তি ভঙ্গ করেননি। মূলত সাত বছরের অধিক সময় ধরে ক্রুসেডাররা ইহুদিদের সম্পদ আত্মসাৎ সহ সকল দমন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিল, তাদের জোর করে খ্রিষ্টান বানাতে চাচ্ছিল—যা এই জয়ের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং ইহুদিদের কাছে তারিক বিন যিয়াদ একজন বীর, তাদের স্বাধীনতা দানকারী। অজ্ঞরা যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম ও ন্যায় বিচারের মাপকাঠি জানত ও বুঝত, তবে তারাই প্রথম ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হতো।

আপনারা জেনে অবাক হবেন যে, আন্দালুস বিজয়ের আট শত বছর পরে যখন মুসলিম শাসনের পতন হলো, তখনও মুসলিমরা ইহুদিদের সাথে কত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেছে। মুসলিম শাসনামলে আন্দালুসের ইহুদিদের যে যিম্মা মুসলিমদের উপর ছিল, মুসলিম শাসনের পরেও সে সকল ইহুদির জান মাল রক্ষার জন্য এমন কিছুই বাকি ছিল না—যা মুসলিমরা করেনি। তাই মুসলিমরা সকল ভূমিতেই মূলত মুক্তির দূত হিসাবেই গমন করে, কারণ ইসলামের প্রধান নীতিই হলো মানবতার কল্যাণ সাধন—এই দায়িত্বভার স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর আরোপিত।

> **"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাহ, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে।" (সূরাহ আলে-ইমরান: আয়াত ১১০)**

মুসলিম শাসনামলে কখনোই কাউকে জোরপূর্বক কালিমা পড়তে বাধ্য করা হয়নি। আর কেনই বা বাধ্য করবে? এটা আমাদের বিশ্বাসের অংশ যে, ইসলাম কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। আর জোরপূর্বক কাউকে কালিমা পড়ানোও অর্থহীন। আল্লাহ বলেছেন,

> **"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ২৫৬)**

এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, মুসলিমরা কখনোই কাউকে ইসলামের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করেনি। বরং আমরা দেখেছি যখনই পশ্চিমা কোনো দেশ অন্য কোনো মুসলিম দেশ আক্রমণ করে, তখন আধুনিকতা এবং গণতন্ত্রের সাথে খাপ খাওয়ানোর দোহাই দিয়ে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আইনের পরিবর্তন করে। তারা লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে তাদের বিশ্বাসকে মুসলিমদের ভিতর অনুপ্রবেশ করানোর ফন্দি আঁটে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে মুসলিমদের মাঝে কুফরি আইন ব্যবস্থা এবং বিশ্বাসের প্রসার ঘটানোর। এই পশ্চিমা দেশগুলোই নিজের বিশ্বাস অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

হিজরতের ৯২ বছর পরেও বহু যুদ্ধ চলমান ছিল। ৯৩ ও ৯৪ তম বছরে সংঘটিত যুদ্ধও রামাদান মাসেই সংঘটিত হয়। সেই সময়ে খলিফা আল ওয়ালিদ ইবনু আব্দুল মালিক মৃত্যুশয্যায় থাকার কারণে একপর্যায়ে সহকারী খলিফা সুলায়মান ইবনু আব্দুল মালিক তারিক বিন যিয়াদ ও মূসা ইবনু নুসাইরকে যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত করার আদেশ দেন। খলিফার উদ্দেশ্য ছিল যে, তারিক বিন যিয়াদ এবং মূসা ইবন নুসাইরের বিজয় তার মৃত্যুর পর হলে এই বিজয়ের সাথে তার নাম জুড়ে যাবে, কিন্তু তারিক এবং মূসা সে আদেশ অমান্য করে তাঁদের বিজয়যাত্রা অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে সুলায়মান যখন খলিফা হন, তিনি তাঁদের সাথে খুবই বৈরী আচরণ করেন। অনেকেই বলেন কিছু কাল পরেই মূসা ইবনু নুসাইরের সাথে খলিফার মীমাংসা হয় এবং খলিফা তাঁকে হজ্জেও নিয়ে যান। কিন্তু তারিক বিন যিয়াদ এই বিজয়ের পর থেকে নিভৃতে জীবনযাপন করতে থাকেন।

তারিক দামাস্কাসে ফিরে আসেন এবং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে থাকেন। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা হলো, তিনি যে কেবল নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন তা নয়, তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল একাকী এক মসজিদের সামনে, এবং এর আগে তাঁকে ভিক্ষা করতেও দেখা যায়। অথচ তিনি আন্দালুসের গভর্নর হবার মতো যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। যেভাবে আমর ইবনু আস (ﷺ) মিশর বিজয়ের পর সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হন, তারিক বিন যিয়াদও আন্দালুসের গভর্নর হবার যোগ্য দাবিদার ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত ধর্মভীরু আল্লাহওয়ালা, যার কারণে তিনি নিজেকে জনসমাগমের মধ্যমণি হওয়া থেকে বিরত রেখে একাকিত্বের জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

আন্দালুস বিজয়ের পর বিশ্বের দৃশ্যপটে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ইবনু খালদুন, ইবনু রুশদ, ইবনু হাযমের মতো জগৎবিখ্যাত জ্ঞানীরা এই সময়ে বিশ্বকে আলোকিত করেছিলেন। এছাড়াও গণিতশাস্ত্র, ভূ-তত্ত্ব, মহাকাশ তত্ত্ব, প্রকৌশলীবিদ্যা সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল স্তরে মুসলিমদের অবদান উল্লেখযোগ্য। স্পেন থেকে শুরু হয়ে পুরো ইউরোপে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। একজন অমুসলিম ফরাসী লেখক বলেছিলেন, মুসলিমরা গোটা অঞ্চলটাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। তিনি তাঁর লেখায় অনেকগুলো ঘটনা বর্ণনা করেন। এক উদাহরণে তিনি বর্ণনা করেন, ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় মহিলারা (তাদেরকে 'সাক্বালিবাহ' Saqaalibah (صقالبة) বলা হতো) বিধবা হলে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের নামে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজ হাত মুখ কাটত। কেউ কেউ আত্মহত্যাও করত। এরপর লোকে স্বামী-স্ত্রীকে একসাথে আগুনে পুড়িয়ে মাটি চাপা দিত। কিন্তু বিধবাদের সাথে মুসলিমদের ইনসাফপূর্ণ আচরণ দেখে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসে। ইসলাম এসেছে মূলত যুগ যুগ ধরে চলে আসা সমাজের নানা অবিচার-অনাচার আর নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা থেকে মানুষদের মুক্ত করে স্বাধীন স্বাভাবিক জীবন দান করতে, মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলতে।

সেই ফরাসী লেখক তার বর্ণনায় আরও লেখেছিলেন, এমন এক অঞ্চল ছিল যেখানে মানুষ বছরে মাত্র এক বা দুবার গোসল করত। এটা ছিল ঐ অঞ্চলের বিশ্বাস বা সংস্কৃতির অংশ। তারা মুসলিমদের নিয়মিত গোসল ও দৈনিক পাঁচবার ওযু করতে দেখে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনে। মুসলিমদের কাছ থেকেই তারা আচার-আচরণ সহ সুস্থ জীবন যাপনের নিয়ম শিখে। মুসলিমরাই প্রথমে রাস্তার ধারে লাইটের প্রচলন করে, আন্দালুসের প্রধান সড়কগুলো সুন্দর সুন্দর ফুল ও নানাবিধ গাছ দিয়ে সাজায় মুসলিমরাই। সমাজ তথা গোটা ইউরোপ সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত হয় আব্দুর রহমান আন-নাসিরের শাসনামলে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং শক্তিমান নেতা, সবার উপর তাঁর একটা প্রভাব ছিল। ১৯৬১ সালে তাঁর এক হাজারতম মৃত্যু বার্ষিকীতে অমুসলিমরা তাঁর আমলে অর্জিত উন্নয়নের কথা স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আজকের অনেক মুসলিমই জানে না কে ছিলেন এই মহান বীর। দুঃখজনক যে, আমরা মুসলিম উম্মাহর গৌরবজ্জ্বল অতীতের কথা ভুলে গেছি, আর অতীত ভুলে যাওয়ার কারণেই পরাজিত আর আত্মসমর্পণের নিচু মানসিকতাসম্পন্ন এক কাপুরুষ মুসলিম জাতির উত্থান হয়েছে।

কর্ডোভায় অর্ধ মিলিয়ন পুস্তক সম্বলিত একটি লাইব্রেরী ছিল। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে কোনো কপি মেশিন বা প্রিন্টার ছিল না। এটা সেসময়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী হিসেবে বিবেচিত হতো। যদি তা না-ও হয়, তাহলে সম্ভাব্য সর্বাধিক বড় অপর লাইব্রেরী ছিল বাগদাদে মুসলিম মালিকানাধীন। এটিই সেই লাইব্রেরী, যেখানে তাতাররা আক্রমণ করে সমস্ত বই দজলা সাগরে নিক্ষেপ করেছিল। বইয়ের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, বইয়ের কালির জন্য পানির রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। সমৃদ্ধশালী অপর বৃহদাকার লাইব্রেরীটি ছিল 'দারুল হিকমাহ' নামে কায়রোতে। এ তিনটিই ছিল সে সময়ের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী, এর মধ্যে দারুল হিকমাহ ইতিহাসের সাথে সাথে হারিয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডাররা আন্দালুসে প্রবেশ করে প্রথম যে কাজটি করে তা হলো—গ্রন্থাগারসমূহের সকল বই পোড়ানো। আন্দালুস দখলের পর ইসলামবিদ্বেষী একজন বিশপের নেতৃত্বে কর্ডোভার এক গণচত্বরে ৮০ হাজার বই পোড়ানো হয়। এরপর হিজরি ৬৪৬ সালে তারা মুসলিমদের অন্য সকল বইও পুড়িয়ে দেয়। তাদের ধারণা ছিল যে, মুসলিমদের বইগুলো পুড়িয়ে দিলেই তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা, বিশেষভাবে শরিয়াহ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ইসলামিক শিক্ষা থেকে দূরে রাখা যাবে। কিন্তু তারা মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে আসলে খুব কমই জানত। দ্বীন ইসলাম তো শুধু কাগজ আর কালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের দ্বীন তো সব সময়েই আমাদের অন্তরে জীবিত ছিল, আছে এবং থাকবে।

সময়ের সাথে সাথে মুসলিমদের সার্বিক অবক্ষয় হতে থাকে। তারা আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। যে মুসলিমরা এক সময় হাদিস-কুরআন মুখস্থ আর জ্ঞানের চর্চা ও প্রতিযোগিতা করত, তারা আজ নারীকেন্দ্রীক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মসজিদ ও হালাকাগুলোর পরিবর্তে ক্লাব-পানশালাগুলো আজ মুখরিত। এভাবে এমন এক প্রজন্মের সৃষ্টি হয়, যাদের মধ্যে তাওহীদ, আল ওয়ালা আল বারা, ফিকহ, বিজ্ঞানভিত্তিক ইসলাম চর্চার অভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে যেভাবে বিভক্ত—আন্দালুসের মুসলিম সাম্রাজ্যও বাইশ জন শাসকের অধীনে বিভক্ত হয়ে যায়।

ইবনু আল আহমার নামক একজন রাজা ছিল যে তার অপর মুসলিম ভাই ইবনু হুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অমুসলিম সৈন্য ভাড়া করেছিল। পক্ষান্তরে ইবনু হুদ সেই অমুসলিমদেরকে ইবনু আল আহমারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজ পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য নিজের অধীনে থাকা ৩০টি কেল্লা উপঢৌকন দেয়। স্পেনের সর্বশেষ মুসলিম রাজা ছিল আবু আব্দুল্লাহ আস-সগীর। একবার মালাকা অঞ্চলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য একদল মুসলিম সৈন্য এগিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় আবু আব্দুল্লাহ আস-সগীর তাদের পথ রোধ করে দেয় যার ফলস্বরূপ সেখানকার মুসলিম বাহিনী পরাজয় বরণ করে এবং ক্রুসেডাররা একটি মসজিদকে চার্চে পরিবর্তন করে ফেলে। ক্রুসেডারদের এ বিজয়ে আবু আব্দুল্লাহ আস সগীর তাদেরকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে ক্রুসেডারদের আস্থাভাজন হতে চেয়েছিল, যেন তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়। এভাবেই লোভের মাধ্যমে মূলত মানুষের অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ হয়। আল্লাহ বলেন,

> **"সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, 'আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে।" (সূরাহ মায়েদা: আয়াত ৫২)**

আবু আব্দুল্লাহ আস-সগীর তার মুসলিম ভাইদের বাদ দিয়ে কাফেরদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। এতে সে সাময়িক সফলতা হয়তো অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সম্মান খুঁজে বেড়ায় তার শেষ পরিণতি চরম আপমান ছাড়া আর কিছু নয়। যতদিন তাদের স্বার্থ ছিল ততদিন ক্রুসেডাররা তার প্রতি উদার ছিল, কিন্তু স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে উপযুক্ত সময়ে তাকে হটিয়ে তারা পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা দখল করে। আবু আব্দুল্লাহ আস সগীর স্পেনের সর্বশেষ রাজা হিসেবে তার অধীনে থাকা শেষ দূর্গ গ্রানাডা ক্রুসেডারদের কাছে ছেড়ে দেয়। সব কিছু হারিয়ে সে যখন কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গেল, তখন তার মা বিখ্যাত সেই উক্তিটি করেন,

"তোমার জন্য মেয়েদের মতো কাঁদাই শোভা পায়, কারণ তুমি একজন পুরুষের মতো তোমার সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারোনি।"

ফিলিস্তিনের মতোই আন্দালুসও অধিকৃত অঞ্চল। আন্দালুসের বিখ্যাত কবি আবুল বাকা আর রুন্দি আন্দালুসের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সৌন্দর্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক চর্চা ইত্যাদি সার্বিক বিষয় তুলে ধরে দীর্ঘ এক কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতায় আরও জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে ক্রুসেডারদের নির্বিচার মুসলিম হত্যাকাণ্ড, মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাসঘাতকতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুবতীদের ধর্ষিত হওয়ার করুণ কাহিনী। কবিতার শেষ চরণে তিনি লেখেন,

"যদি কোনো অন্তরে ন্যূনতম ইসলাম বা বিশ্বাসও থেকে থাকে, তবে তা এসব দেখে কান্নায় বিগলিত হবে।"

আর এভাবেই আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে আঁকড়ে ধরার কারণে হিজরতের ৯২তম বছরের রামাদানে যে বিজয় অর্জিত হয়েছিল, সেই রজ্জু ছেড়ে দেবার কারণেই আরেক রামাদানে মুসলিমরা পরাজিত হয়।

রামাদানের শেষ দশ দিন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুমে জান্নাত আমাদের জন্য নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে চলেছে প্রতিনিয়ত। আর-রাহমান আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইযযাত প্রতি মুহূর্তে আমাদের উপর তাঁর রহমত আর করুণাধারা বর্ষণ করছেন। আল্লাহর এই রহমত পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যেন কোনো নেতিবাচক চিন্তা কাজ না করে, বরং যাবতীয় অলসতা ঝেড়ে ফেলে আমাদেরকে আল্লাহর রহমতের আশায় নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার অশেষ রহমত এই যে, তিনি রামাদানের শেষ দশদিন আমাদের জন্য সব থেকে উত্তম দিন বানিয়েছেন। এই শেষ দশদিন হলো এমন কিছু সময়, যখন নিজেদের আত্মার সমৃদ্ধি এবং পরিচর্যার জন্য বেশি জোর দিতে হবে। নিজেদের শরীরের আরামটুকু থেকে কিছু অংশ আত্মিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করাটা আমাদের জন্য খুব জরুরি।

সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে আইশা (ﷺ) বলেছেন, রামাদানের শেষ দশদিনে রাসূল (ﷺ) তাঁর সকল স্ত্রীদের রাতের বেলায় ডেকে তুলতেন। নবীজি (ﷺ) কিন্তু স্ত্রীদের রান্না-বান্না অথবা নিজের কোনো ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য ডেকে তুলতেন না। রামাদানের শেষ দশদিন তিনি নিজেও সারা রাত ইবাদাত করতেন এবং তাঁর স্ত্রীরাও সারা রাত ইবাদাতে কাটাতেন। সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে "নবীজি রামাদানের শেষ দশদিন বছরের অন্য যেকোনো সময় থেকে বেশি ইবাদাত করতেন।" সহিহ বুখারিতে আছে আইশা (ﷺ) বলেছেন, "রামাদানের শেষ দশদিন শুরু হবার সাথে সাথে নবীজি (ﷺ) কোমর বেঁধে ইবাদাতে নেমে পড়তেন এবং উনার নিজের পরিবারবর্গকেও সারারাত জেগে ইবাদাত করতে বলতেন।" কোমর বেঁধে ইবাদাতে নেমে পড়া বলতে আসলে অত্যন্ত আগ্রহ, উদ্দীপনা আর উৎসাহ নিয়ে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করা বুঝানো হচ্ছে।

অনেক আলিম বলেছেন, কোমর বেঁধে নেমে পড়া কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হলো, রামাদানের শেষ দশ দিন স্ত্রীদের সাথে নবীজি (ﷺ)-এর কোনো সম্পর্ক থাকত না। আসলে শেষ দশদিন তিনি ইবাদাতে এতটাই মশগুল এবং ব্যস্ত থাকতেন যে—উনার স্ত্রীদের কাছে যাবার সময়টুকু পর্যন্ত পেতেন না। এটা সুফিয়ান আস-সাওরি (ﷺ)-এর মত এবং উনার এই মতটাই অধিক উত্তম। কারণ অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ﷺ) রামাদানের শেষ দশ দিন তাঁর বিছানাপত্র গুছিয়ে নিতেন এবং ইবাদাতে এত বেশি মশগুল হয়ে যেতেন যে, তাঁর স্ত্রীদের সাথে

কোনোরকম সম্পর্কই থাকত না। স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো অবশ্যই হারাম কিছু নয়, কিন্তু নবীজি রামাদানের শেষ দশ দিন এত বেশি ইবাদাত করতেন যে, স্ত্রীদের সাথে পর্যন্ত তখন উনার সম্পর্ক থাকত না।

ইবনু রজব (رحمه الله) বলেন, "নবীজি (ﷺ) রামাদানের প্রথম বিশদিন স্ত্রীদের সাথে ইসলামে অনুমোদিত সবকিছুই করতেন, আর শেষ দশ রাতে উনি এতটাই ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন যে পরিবারের সাথেও তাঁর সম্পর্ক থাকত না।" চিন্তা করুন, এই যদি হয় আমাদের রাসূল (ﷺ)-এর ইবাদাতের দৃষ্টান্ত, যিনি আল্লাহ্ তাআলার আযাবের ভয়ে সবসময় ভীত থাকতেন, যার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, এবং যিনি ছিলেন আল্লাহর সব থেকে কাছের এবং পছন্দের মানুষ —তাহলে আমাদের কী করা উচিত—যেখানে আমাদের গুনাহ্ মাফ হবে কি না আমরা তা-ই জানি না? আমরা যদি নবীজি (ﷺ)-কে আমাদের সাধ্যমতো অনুসরণ না করি, তবে সেটা তো আমাদের নিজেদের সাথেই প্রতারণা করা হবে। অন্তত রামাদানের শেষ দশ দিন আমাদের উচিত নবীজি (ﷺ)-কে নিজেদের সাধ্যমতো অনুসরণ করা। এটা নিজের প্রতিই অবিচার করা হবে, যদি কেউ রামাদানের শেষ দশদিনের এই বিশাল সুযোগ কাজে না লাগায়। যদি এই বরকতময় সময় কাজে লাগাতেই কেউ আলসেমি করে, তাহলে সেই অলস ব্যক্তি আসলে ঠিক কোন দিনগুলোর সুযোগ নেবার অপেক্ষায় বসে আছে? তবে কি সে এমন দিনের অপেক্ষায় আছে যখন তাকে কবরে শুয়ে শুয়ে আফসোস করতে হবে?

ইবনু রজব (رحمه الله) বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে যে, রাসূল (ﷺ) শেষ দশদিন এমনভাবে ইবাদাতে মশগুল থাকতেন, যা তিনি বছরের অন্য কোনো সময়ে থাকতেন না। শেষ দশদিন তিনি রাত জেগে সালাত আদায় করতেন, যিকিরে মশগুল থাকতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কাজেই আপনিও যে ইবাদাত করে প্রশান্তি অনুভব করেন এবং যে ইবাদাত করলে আপনার মনে হয় যে, আপনি আল্লাহর কাছাকাছি আসতে পারছেন—সেই ইবাদাতেই মশগুল হয়ে যান। যদি মনে করেন যিকির করে প্রশান্তি পান, তবে যিকিরে মশগুল হন। যদি কুরআন তিলাওয়াতে প্রশান্তি পেয়ে থাকেন, তবে কুরআন তিলাওয়াতে নিজেকে ঢেলে দিন। যদি সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াতে প্রশান্তি পান, তবে এই দুই ইবাদাতেই নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, কোন ইবাদাত বেশি উপযোগী? আসলে আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানেন মানুষের স্বভাব সম্পর্কে, তাই তিনি ইবাদাতের বিভিন্ন পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। কারো কাছে যেটা করতে অনেক ভালো লাগে, সেটা আবার অন্য একজনের কাছে ততটা ভালো না-ও লাগতে পারে। যেমন- সালাতের ক্ষেত্রে রাকাত সংখ্যার ভিন্নতা আছে, দু-রাকাত, তিন-রাকাত এবং চার রাকাত এরকম। অনেক সালাতে কিরআত জোরে জোরে পড়া হয় আবার কিছু সালাতে নীরবে পড়তে হয়। কিছু ইবাদাত ফরয, যা আমাদের অবশ্যই করতে হবে—আবার কিছু ইবাদাত নিজের

ইচ্ছেমতো করা যায়। তাহলে ইবাদাতের সব থেকে ভালো উপায় কোনটা? আসলে যে ইবাদাত করে আপনি নিজের অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করেন এবং যে ইবাদাত নিজের অন্তরের প্রশান্তির পাশাপাশি আল্লাহ্ তাআলার খুব কাছাকাছি যাবার শক্তি এবং সুযোগ করে দেয়—আপনার জন্য সেই ইবাদাতই সবচেয়ে উপযোগী।

লাইলাতুল ক্বদরের কিছু বিশেষ দু'আ আছে, যা আমরা পড়তে পারি। লাইলাতুল ক্বদরে সারারাত জেগে ইবাদাতে মশগুল হয়ে থাকাটা নবীজি (ﷺ)-এর সুন্নাহ, সুতরাং আমরা নিজেরা এবং নিজেদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই সুন্নাহটুকু পালন করব ইনশাআল্লাহ্। সুফিয়ান আস-সাওরি (رحمه الله) বলেছেন, "যখন রামাদানের শেষ দশ রাতের আবির্ভাব হয়, তখন যেন আমরা নিজেরা ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ্র ইবাদাত করি এবং নিজেদের পরিবারের সদস্যদেরও জাগিয়ে তুলি যেন তারাও এই ইবাদাতে শামিল হতে পারে, কারণ এই কাজের জন্য আল্লাহ্র কাছ থেকে আমরা পুরস্কৃত হব।"

ইবনু বাত্তাল (رحمه الله) বলেন, এটা হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, রামাদানে ও রামাদানের বাইরেও ইতিকাফ করা সুন্নাহ। ইতিকাফ ভুলে যাওয়া সুন্নাহগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং আপনি যত বেশি এরকম ভুলে যাওয়া সুন্নাহগুলো পালন করবেন, তত বেশি আপনি পুরস্কৃত হবেন, কারণ এর মাধ্যমে আপনি একটি সুন্নাহকে পুনর্জাগরিত করছেন। ইবনু মুনযির এবং শিহাব বলেন, "এটা খুবই বিস্ময়কর যে, মুসলিমরা ইতিকাফ ত্যাগ করেছে অথচ নবীজি (ﷺ) মদীনায় আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও ইতিকাফ ত্যাগ করেননি।"

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) ও আইশা (رضي الله عنها) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজি (ﷺ) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি বছর ইতিকাফ করেছেন। তিনি রামাদানের প্রথম দশদিনে ইতিকাফ করেছিলেন, তারপর তিনি রামাদান মাসের দ্বিতীয় দশদিনে ইতিকাফ করেছিলেন এবং তারপর তিনি রামাদানের শেষ দশদিনেও ইতিকাফ করেছিলেন, আর শেষ দশদিনে আমাদেরকে এটি করতে বলেছেন। এটাই রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ, যা তিনি মৃত্যু পর্যন্ত করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি রামাদান মাসে নবীজি (ﷺ)-এর কাছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, কোন কারণে ইতিকাফ মিস হয়ে গেলে পরবর্তী মাস শাওয়ালের প্রথম দশদিনে এটি পালন করতেন। যে বছর তিনি মারা যান, সেই বছর সহ মোট বিশ বছর ইতিকাফ পালন করেছেন। ইবনু হাজার বলেন, "এক বছর সফরে থাকায় তিনি একটি ইতিকাফ মিস করেন, তাই পরবর্তী মাসে এটি পালন করেন। তিনি লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করার সময়ে ইতিকাফ করতেন।"

ইতিকাফ আপনাকে দুনিয়াবি সব কিছু থেকে এবং সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করায়। আপনাকে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। যত বেশি আল্লাহকে জানবেন, তত বেশি আল্লাহকে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহর প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন, আর আল্লাহকে যত বেশি

ভালোবাসবেন তত বেশি দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে যুক্ত হতে চাইবেন। একজন সালাফ তাঁর বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতেন তাঁর ঘরে। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি কি একা বোধ করেন না?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি কী করে একা অনুভব করতে পারি, যখন আমি ক্রমাগত এমন একজনকে স্মরণ করি যিনি আমাকে স্মরণ করেন!" এটা হলো যোগাযোগ—অত্যন্ত শক্তিশালী এক সম্পর্ক। আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক সরাসরি আপনার অন্তরের সাথে জড়িত এবং ইতিকাফ আপনার এই অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। সাওম পালন আপনাকে খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে বিরত রাখে, আর ইতিকাফ আপনাকে অত্যধিক কথাবার্তা এবং অত্যধিক ঘুম থেকে বিরত রাখে। বন্ধু, পরিবার এবং অন্যান্য বিষয় যা আপনার মনোযোগে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটায় সেগুলো থেকে দূরে রাখে। আল্লাহর সম্পূর্ণ আনুগত্য এবং আল্লাহর সাথে দৃঢ় সংযোগ থেকে এগুলো আপনাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, আর ইতিকাফ সমগ্র দুনিয়াকে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে এক আল্লাহর দিকে আপনাকে দ্রুত নিকটবর্তী করে দেয়।

আজ মানুষ ইতিকাফ করতে মসজিদে যায়, কিন্তু ইতিকাফের আসল উদ্দেশ্যকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। তারা সেখানে ঘুরে বেড়ায়, কথা বলে এবং ইতিকাফের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। মনে রাখবেন, আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন, যাতে আপনি তাদের সাথে কথা বলতে না পারেন এবং আপনার কোনো পার্থিব সংযোগ না থাকে। আপনি দুনিয়াবি সব কিছু এবং যেসব ব্যাপার আপনাকে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে বাধা দিচ্ছিল, সেসব পেছনে ফেলে ইতিকাফে অগ্রসর হোন। ইতিকাফ আপনাকে সমস্ত দুনিয়াবি ব্যাপার থেকে বিরত রাখে এবং সর্বোত্তম স্থানে অর্থাৎ মসজিদে একটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে আল্লাহর নিকটবর্তী করে রাখে।

> **"(তাঁর আলোর পথ অবলম্বনকারী) ঐ সব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উন্নত করার ও যেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করার হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন। সেগুলোতে এমন সব লোক সকাল সাঁঝে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।" (সূরাহ আন নূর: আয়াত ৩৬)**

ইমাম আহমাদ (ﷺ) বিশেষভাবে বলেছিলেন, "মুমিনদেরকে লোকদের সাথে মিশ্রিত হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে, এমনকি দ্বীনের শিক্ষা কিংবা নসিহত দেওয়ার মতো ব্যাপার হলেও তাতে জড়ানো যাবে না।"

একা থাকুন, আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক মজবুত করুন এবং নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলুন। যারা কারাগারে ছিল, বিশেষ করে যাদের কারাগারের নির্জন সেলে রাখা হয়েছিল, তাদের সবচেয়ে ভালো সময় কেটেছে নির্জন সেলে থাকাকালীন, কারণ ঐ সময়ে তারা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু আল্লাহর সাথেই সংযোগ স্থাপন করেছে। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! যে কেউ অন্যকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার মানুষের সাথে একা

থাকতে পছন্দ করে—এটাই বাস্তবতা। যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে আল্লাহর সাথে একা সময় কাটাতে ভালোবাসবে। এতটুকু জানার পর আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি, আমরা কি আসলেই আল্লাহকে ভালোবাসি? ইতিকাফ অন্তরকে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য একটি ট্রেনিং সেশন। ইতিকাফ দুনিয়ার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করায়।

রামাদানের শেষ দশ রাতের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। আমাদের সালাফরা যৌবনে থাকতেই বলতেন যে, "আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আমরা দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছি।" এমন নয় যে তাঁরা বৃদ্ধ বয়সের উপনীত হওয়ার পর আল্লাহর ইবাদাতে মনোনিবেশ করেছেন, বরং যুবক থাকতেই তাঁরা নিজেদের সবকিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সালাত, আল্লাহর যিকির ও প্রশংসা, কুরআন তিলাওয়াত, সাদাকা সহ কুরআন-হাদিস অনুযায়ী যত ধরনের ইবাদাতের কথা আপনার মাথায় আসবে, সেই সকল ইবাদাতে নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। রামাদানের শেষ দশ রাতের মধ্যেই আছে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত রাত—যা হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম—যে রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। নিজের বিশ্রাম এবং ঘুম সংক্ষিপ্ত করুন, অলসতা ঝেড়ে ফেলুন এবং আল্লাহর ইবাদাতের জন্য বিনয়ের সাথে উঠে দাঁড়ান। নিজের উৎসাহ আর উদ্দীপনাকে উজ্জীবিত করুন আর সব ধরনের ঢিলেমিকে বিদায় জানান, কারণ আপনি এখন ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবিদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবেন। আমরা চাই, জান্নাতে যখন সাহাবিদের সাথে আমাদের দেখা হবে, তখন যেন তাঁরা আমাদের দেখে বুঝতে পারেন যে, তাঁদের পরেও দুনিয়াতে এমন বান্দা ছিল যারা ইবাদাতে তাঁদের সমকক্ষ হয়েছিল।

রামাদানের শেষ দশ দিন যেন রামাদানের প্রথম বিশ দিনের মতো না হয়। আপনার রামাদান যেন বছরের অন্যান্য আর সাধারণ দিনের মতো চলে না যায়। শেষ দশ দিনে আপনাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে পূর্বের সকল মাইলফলক অতিক্রম করতে হবে, অর্থাৎ রামাদানের শেষ দশ দিনে, রামাদানের প্রথম বিশ দিনের সম্মিলিত ইবাদাতের থেকেও বেশি ইবাদাত করতে হবে।

আমরা কেউই জানি না আমরা পরের রামাদান পাবো নাকি তার আগেই আমাদের অন্ধকার কবরে আশ্রয় নিতে হবে। আমরা তো এটাও জানি না কবরে আমাদের অবস্থা কেমন হবে! রামাদানের এই সময়গুলোর মতো আমাদের জীবনও এভাবেই শেষ হয়ে যাবে। মুমিন এবং পাপী উভয়েই চলে যাওয়া সময় নিয়ে আফসোস করবে। মুমিনরা এই ভেবে আফসোস করবে যে, কেন সে আরও বেশি ইবাদাত করল না, আর পাপী আফসোস করবে কেন সে আল্লাহর দিকে ফিরে এলো না। কাজেই আল্লাহর ইবাদাতে দ্রুততার সাথে এগিয়ে আসুন, তাহলে আল্লাহও আপনার দিকে দ্রুততার সাথেই এগিয়ে আসবেন

ইতিকাফ: আল্লাহ্‌র ঘরে, আল্লাহর সাথে

ইতিকাফ বিষয়ে কিছু জরুরি প্রশ্নোত্তর,

প্রশ্ন: শেষ দশ দিনের সব দিনই কি ইতিকাফ করতে হবে?

উত্তর: পুরোপুরি দশ দিন ইতিকাফ না করে তার অংশবিশেষ যেমন- পাঁচ দিনও ইতিকাফ করা যেতে পারে। ধরা যাক, একজন চাকুরীজীবি দশ দিন ইতিকাফের নিয়ত করল, এ অবস্থায় পাঁচ দিন পর তার অফিস থেকে জরুরি ডাক আসলো। এতে সে পাঁচ দিনের সাওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, এরপর অফিসের কাজ শেষে ফিরে এসে সে আবার ইতিকাফের নিয়ত করতে পারবে, তবে এই ইতিকাফ আগের পাঁচদিনের সাথে যোগ হবে না, বরং নতুন ইতিকাফ হিসেবে গণ্য হবে। সবচেয়ে ভালো দশ দিনই ইতিকাফ করা, তবে কেউ চাইলে দশ দিনের কমও ইতিকাফ করতে পারে, এমনকি মাত্র ৫ মিনিটের জন্য ইতিকাফ করলে সেটাও ইসলামে অনুমোদিত। ইমাম শাফি'ঈ (ﷺ) এ বিষয়ে বলেছেন, "ইতিকাফের ব্যাপারে ইতিকাফকারীই নিজের আমীর, অর্থাৎ সে যেমন পছন্দ করবে তেমনই করতে পারবে। সে চাইলে অবিরত দশ দিন ইতিকাফ করতে পারে আবার যেকোনো সময় চাইলে ইতিকাফ শেষও করে দিতে পারে।" এমন করলে কোনো গুনাহ নেই। ফাতহুল বারী গ্রন্থে ইবনু হাজার (ﷺ) বলেছেন, "যদি কারো নাযার অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা বা মানত না থাকে, তাহলে সে যেকোনো সময়েই ইতিকাফ ভেঙে ফেলতে পারে আবার চাইলেই পুরো দশ দিন ইতিকাফ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি মানত করা থাকে যে, আল্লাহ তুমি আমাকে অমুক জিনিস দিলে রামাদানের দশ দিন বা তিন দিন ইতিকাফ করব, তাহলে এই মানত পূরণ করা তার উপর ফরয হয়ে যায়—তাকে সেটা করতেই হবে।"

প্রশ্ন: সবচেয়ে কম কতটুকু সময় ইতিকাফ করা যায়?

উত্তর: হাম্বলী ফিকহ অনুসারে ইতিকাফের সবচেয়ে কম সময় হচ্ছে একটা দিনের কিছু অংশ, অর্থাৎ একদিনের কিছু অংশই যথেষ্ট। শাফি'ঈ মত অনুসারে, সালাতে রুকু করার সময় মানুষ যতটুকু সময় ব্যয় করে, ইতিকাফের সবচেয়ে কম সময় ঠিক ততটুকু। তো রুকুতে কতটুকু সময় লাগে? এক, দুই বা বড়জোড় তিন মিনিট সময়ই

রুকুর জন্য যথেষ্ট। ইতিকাফের নিয়তে আপনি যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, সেটাই ইতিকাফ। এটা তিন মিনিট যেমন হতে পারে, এক দিন, দুই দিন এমনকি এক মাসও হতে পারে। শুধুমাত্র মালিকি ফিকহে ইতিকাফের জন্য নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় হচ্ছে কমপক্ষে একদিন এবং একরাত। তবে বাকি তিন ইমামের মত হচ্ছে, ইতিকাফের জন্য কোনো বাধাধরা সময় নেই—এটা মসজিদে কাটানো খুব কম সময়ের জন্যও হতে পারে।

শৈশবে আমি আব্বার সাথে মসজিদে নববীতে যেতাম। মসজিদে নববীতেই আমি কুরআন হিফয করেছি। একটানা সাড়ে চার বছর ধরে প্রতিদিন আমরা মসজিদে নববীতে যেতাম এবং আসর থেকে এশা পর্যন্ত সেখানে থাকতাম। আমার মনে আছে, শুধু একদিন আমরা সেখানে যেতে পারিনি, কারণ সেদিন অনেক বন্যা হয়েছিল আর মসজিদ পানিতে ভরে গিয়েছিল। বন্যার পানি ধরার কুয়া তখনো তৈরি হয়নি। আমরা যখন আসর থেকে এশা পর্যন্ত মসজিদে থাকার জন্য যেতাম, আব্বা আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দিতেন আর বলতেন—যখনই তুমি মসজিদে প্রবেশ করো, ইতিকাফের নিয়ত রাখো। আপনি যদি মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত মসজিদে থাকেন এবং সে সময় আপনি ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করেন—তাহলে আপনি ইতিকাফের সাওয়াব পাবেন। দুইজন ব্যক্তি একই সাথে মসজিদে প্রবেশ করে আর একই সময়ে বের হয়, কিন্তু একজন ইতিকাফের সাওয়াব পাবে আর অপরজন পাবে না—শুধুমাত্র নিয়তের কারণে।

তবে ইতিকাফের পুরোপুরি ফায়দা তখনই হাসিল হবে, যখন আপনি দুনিয়াবি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হবেন। মোবাইল সহ অন্য সবকিছু আপনি বাড়িতে রেখে যাবেন, অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছাড়া আপনি দুনিয়াবি সব কিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে মসজিদে অবস্থান করবেন। অবশ্য জরুরি অবস্থায় আপনাকে হয়তো দুনিয়াবি কোনো ব্যাপারে সময় দিতে হতে পারে, সেটা ইসলামে অনুমোদিত।

ফিকহি দিক থেকে ইতিকাফ সুন্নাত ইবাদাত। যেমন- তারাবীহ শুধু রামাদানের সুন্নাত আর কিয়াম, ইতিকাফ সারাবছরের সুন্নাত ইবাদাত।

ইতিকাফ মসজিদেই হতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, যখন আমাকে একা একাই ইতিকাফ করতে হবে, তাহলে আমি বাসায় আমার মতো করে একা একা ইতিকাফ করব। কিন্তু এভাবে ইতিকাফ হবে না। ইতিকাফ করতে হলে অবশ্যই মসজিদেই ইতিকাফ করতে হবে আর এটিই ইতিকাফের শর্ত। আমাদের নবীজি (ﷺ)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীনগণ মসজিদে ইতিকাফ

করেছেন। যদি ইতিকাফ বাসায় করা যেত, তাহলে নবীজি (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের বাড়িতেই ইতিকাফ করতে বলতেন।[৪০] আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"তোমরা মসজিদে ইতিকাফ করার সময় (তোমাদের স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হবে না; এটিই আল্লাহর সীমা। অতএব তোমরা উহার নিকটেও যাবে না; এভাবে আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন, যেন তারা সংযতহয়।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৮৭)**

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

> **"আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর।' (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১২৫)**

আমাদের নবীজি (ﷺ) মসজিদেই ইতিকাফ করেছেন আর তিনি আমাদের মসজিদেই ইতিকাফের নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিকাফের সময় দুনিয়াবি যাবতীয় চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হবে, শুধুমাত্র কিছু জরুরি বিষয় ছাড়া, যেমন- বাথরুম ব্যবহার। প্রয়োজনীয় বিষয়ে যোগাযোগ করতেও কোনো বাধা নেই। ঘরে ইতিকাফ করার অনুমোদন নেই, মহিলাদের জন্যেও না। এটি ইতিকাফ হবে না। ইবাদাত হবে, কিন্তু সেটা ইতিকাফ না, আর সেটাকে ইতিকাফ বলাও যাবে না। ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) তাঁর ফাতওয়া গ্রন্থের পনেরো খণ্ডে বলেছেন, মহিলাদের জন্য ইতিকাফ মসজিদেই করতে হবে আর ইতিকাফের জন্য তাঁদের নিজেদের বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হবে।

ইতিকাফের আদব

ইতিকাফের কিছু আদব রয়েছে, যা প্রত্যেকের জানা জরুরি। যেমন- ইতিকাফের সময় অবশ্যই মসজিদে অবস্থান করতে হবে। কোনোভাবেই মসজিদ ত্যাগ করা যাবে না, বিশেষ কারণ ছাড়া, যেমন- টয়লেটে যাওয়া। ইতিকাফের সময় জানাযায় অংশ নেয়া থেকেও মসজিদে থাকা উত্তম। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার চেয়েও মসজিদে অবস্থান করা উত্তম। ইতিকাফের সময় স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের চেয়েও মসজিদে থাকা

---

[৪০] হানাফি মাযহাব অনুযায়ী মহিলারা বাড়িতেও ইতিকাফ করতে পারবেন। তবে বাকি তিন মাযহাব অর্থাৎ ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ সহ অধিকাংশ আলিমদের মত হলো নারীদের ইতিকাফও মসজিদেই হতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে তাদের অভিভাবকের (পিতা, স্বামী) অনুমতি লাগবে। মসজিদে যদি নারীদের ইতিকাফ করার মত শর'ঈ ব্যবস্থা না থাকে, ফিতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই মসজিদে ইতিকাফ করা যাবে না, যা শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলও সামনে আলোচনা করেছেন।— সাজিদ ইসলাম

উত্তম। আপনারা জানেন, জানাযায় যাওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া আর স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া, এই বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এগুলোর ফযিলতও অনেক। কিন্তু যখনই আপনি ইতিকাফে থাকবেন, আপনার জন্য ঐ কাজগুলোর চেয়েও মসজিদে অবস্থান করা উত্তম।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজে মসজিদ ত্যাগ করা যাবে। যেমন- টয়লেটে যাওয়া, গোসল করা, পোশাক পরা অথবা খাবার ও পানি খেতে যাওয়া—যদি এগুলো কেউ এনে না দেয়। তবে উচিত হবে খাবারটা মসজিদে এনে খাওয়া। আপনার যদি মসজিদে খাবার সুযোগ থাকে, তাহলে খাবার খেতে কোনো রেস্তোরাঁ বা বাসায় যাবেন না।

কেউ তার পরিবার বা অতিথিদের সাথে কথা বলতে পারেন, যেহেতু নবীজি (ﷺ) সাফিয়্যা (رضي الله عنها)-এর সাথে ইতিকাফরত অবস্থায় কথা বলেছিলেন। আপনি যদি সাথে মোবাইল ফোন রাখতে চান, তাহলে এটা নিশ্চিত করুন যে ফোনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করছেন। বিশেষ করে বোনদের ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন হয়, কিন্তু এটা অবশ্যই জরুরি প্রয়োজনেই কেবল ব্যবহার হতে হবে।

যেসব বিষয় ইতিকাফকে বাতিল করে দেয়

কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে, নারীদের হায়েজ শুরু হলে, শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে এবং বিনা প্রয়োজনে মসজিদ ত্যাগ করলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

> **"এবং মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে শারীরিক সম্পর্ক রেখো না।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৮৭)**

কখন মসজিদে প্রবেশ করা উচিত?

ইমাম মালিক, আনাস এবং সুফিয়ান আস সাওরি বলেন যে, ইতিকাফের জন্য তোমরা রামাদান মাসের ২০তম দিনে মাগরিবের সময় মসজিদে প্রবেশ করবে এবং রামাদানের শেষ দিনে মাগরিবের সময় মসজিদ ত্যাগ করবে।

ইতিকাফের নিয়ম

ইতিকাফের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে। ইতিকাফের সময় অবশ্যই মসজিদে অবস্থান করতে হবে এবং এর জন্য আপনার নিয়ত থাকতে হবে। নারীদের ক্ষেত্রে ইতিকাফের জন্য স্বামী বা ওয়ালীর অনুমতি লাগবে, বিশেষ করে স্বামীর অনুমতি—এটা অপরিহার্য। ঠিক যেমন নফল সাওম রাখতে হলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন, তেমনি ইতিকাফের জন্যও স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন। কারণ দুটোই সুন্নাহ আমল।

নারীদের ইতিকাফ

অনেকেই বলে থাকেন, মেয়েদের জন্য ইতিকাফ নেই। না! ঠিক একজন পুরুষের মতো নারীর জন্যও ইতিকাফ করা সুন্নাহ। এটি তাদের জন্য অনুমোদিত। তাদের পক্ষে সম্ভব হলে এবং কোনো ধরনের ফিতনার সম্ভাবনা না থাকলে তাদেরও ইতিকাফ করা উচিত। এর অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

কিছু মসজিদে এমন সব কাজকর্ম করা হয়, যা ইতিকাফের আদবের খেলাফ—সেক্ষেত্রে এই সকল মসজিদে ইতিকাফ করা হারাম।

আল্লাহ বলেন,

> **"এবং মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে শারীরিক সম্পর্ক রেখো না।" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ১৮৭)**

যতক্ষণ ফিতনার সম্ভাবনা নেই, ততক্ষণ এটা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আম্মাজান আইশা (ﷺ) বলেন, নবীজি (ﷺ) তাঁকে এবং হাফসা (ﷺ)-কে ইতিকাফের অনুমতি দিয়েছিলেন।

একবার নবীজি (ﷺ) মসজিদের মধ্যে অনেকগুলো তাঁবু দেখতে পেলেন। এই তাঁবুগুলো আসলে নারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যাতে তারা পর্দাসহকারে ইতিকাফ করতে পারে এবং এক অপরের সাথে ফুযুল কথা বার্তায় জড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু নবীজি (ﷺ) তাঁদেরকে সেগুলো খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন, তাঁর নিজের ইতিকাফ বাতিল করলেন এবং পরবর্তী মাসে তা পূর্ণ করে নিলেন। লক্ষ করুন, নবীজি (ﷺ) তাদেরকে তাঁবু খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন এবং নিজের ইতিকাফ বাতিল করলেন। তিনি কেন এটা করলেন? কিছু আলিমের মতে, তাঁদেরকে তাঁবু খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ হতে পারে তাঁদের ঈর্ষাপরায়ণ ও নবী (ﷺ)-এর কাছে অবস্থান করার প্রতিযোগী মনোভাবের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের ইতিকাফ করা পছন্দ করেননি। তাঁরা নবীজি (ﷺ)-এর কাছাকাছি থাকতে চাচ্ছিলেন। এখানে মূলত ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতার বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছিল, যা ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়।

ইতিকাফের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াবি সবকিছু থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকা। কিন্তু তাঁরা চাচ্ছিলেন নবীজি (ﷺ)-এর কাছে থাকতে। তাই এই প্রতিযোগিতার কারণে ইতিকাফের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল, একারণে নবীজি (ﷺ) তাঁদের তাঁবু খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা এক পক্ষের মত।

অন্য আলিমের মতে, এই নির্দেশ নারীদেরকে ইতিকাফ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য দেওয়া হয়নি। বরং মসজিদে এত বেশি তাঁবু টানানো ছিল যে, পুরুষদের ফরয আদায় করার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল না।

বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আইশা (رضي الله عنها) ও হাফসা (رضي الله عنها)-কে ইতিকাফের অনুমতি দেন এবং এটিই এই বিষয়ে গ্রহণযোগ্য দলিল।

মূলত বুখারি এবং মুসলিমে এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্যাপারে উরওয়াহ বর্ণিত একটি হাদিস আছে। এটা নবীজি (ﷺ) মৃত্যুর পর ঘটেছিল। উরওয়াহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীরা ইতিকাফ করেছেন। বেশিরভাগ আলিম এবং ইমামদের মতে, ইতিকাফের ক্ষেত্রে নারী আর পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে নারীদের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের অনুমতি আছে এবং তাদের ইতিকাফ আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ফিতনার সম্ভাবনা নেই।

লাইলাতুল ক্বদর

রামাদানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য অজস্র সুযোগের ব্যবস্থা করেন যাতে বান্দা তার গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত এবং ফযিলতপূর্ণ সুযোগটি আসে লাইলাতুল ক্বদরের রাতে।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে রাত জেগে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়।"

হ্যাঁ এটাই লাইলাতুল ক্বদর। রামাদানে আমাদের ফাইনাল শট।

লাইলাতুল ক্বদরের গুরুত্ব

লাইলাতুল ক্বদরকে কেন্দ্র করে একটা সম্পূর্ণ সূরাহ নাযিল হয়েছে, পাঁচ আয়াতের এই সূরাহর নামকরণ করা হয়েছে 'আল ক্বদর'। আবার সূরাহ দুখানের প্রথম দিকটি খেয়াল করলে দেখবেন চার থেকে ছয় আয়াতে লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কেই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ কুরআনে প্রায় এগারোটির মতো আয়াত আছে যা কেবলমাত্র একটি রাত সম্পর্কেই বলছে, আর সেই রাতটিই ভাগ্য রজনী বা লাইলাতুল ক্বদর।

লাইলাতুল ক্বদর আর সব রাতের মতো সাধারণ কোনো রাত নয়। এটা সেই রাত, যে রাতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে।

> **"নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন নাযিল করেছি ক্বদরের রাতে।" (সূরাহ আল ক্বদর: আয়াত ১)**
>
> **"আমি এটি বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করছি কারণ আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।" (সূরাহ আল ক্বদর: আয়াত ৯)**

এখন প্রশ্ন হলো, কেন একে লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়? দুটি কারণে হতে পারে, অথবা দুটির মধ্যে যেকোনো একটি কারণে। ক্বদর শব্দটির অর্থ হলো 'মূল্য' বা 'গুরুত্ব'। ক্বদরের রাতকে গভীরভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে লাইলাতুল ক্বদর। দ্বিতীয়ত, ক্বদর কথাটি এসেছে 'ভাগ্য' থেকে। এ রাতেই আমাদের ভাগ্য লেখা হয়ে থাকে, তাই এর নাম লাইলাতুল ক্বদর। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই তো ভাগ্য লেখা হয়ে

গেছে, আর এখন বলছেন ক্বদরের রাতে ভাগ্য লেখা হয়? আসলে বিষয়টা হলো এই যে, আসমান আর জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর ক্বদরের রাতে এক বছরের সব কিছু ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

> **"এটি হলো সেই রাত, যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ে বিজ্ঞোচিত ফয়সালা দেওয়া হয়ে থাকে।" (সূরাহ দুখান: আয়াত ৪)**

পুরো বছরের সব বিষয় ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কারা এই বছর মারা যাবে, কারা ধনী হবে, কারা গরিব হবে, সবকিছু। এই রাতে ঘুমোনোর কোনো সময় নেই, এই রাতে আপনার রিযিক লেখা হবে, আপনার সমস্ত বিষয় ফেরেশতাদের হাতে পরিচালনার জন্য তুলে দেওয়া হবে। তাই এ রাতে আল্লাহর রহমতের জন্য দু'আ করুন।

> **"আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি জানো কি?" (সূরাহ ক্বদর: আয়াত ২)**

আপনি বাজার থেকে খুব দামি একটি জিনিস কিনে আনলেন। কেউ এসে সেই জিনিসটি আপনার কাছে চাইল, তখন আপনি তাকে বললেন, জানেন এইটার দাম কত? এই প্রশ্নটা করার সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্কে গেঁথে যাবে যে, জিনিসটার মূল্য আসলেই অনেক বেশি যা বর্ণনার বাইরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি কি আদৌ জানো যে লাইলাতুল ক্বদর কী? তুমি কি আদৌ জানো যে এ রাতে তুমি কী পেতে যাচ্ছ?

> **"ক্বদরের রাত হাজার রাতের চেয়েও উত্তম।" (সূরাহ ক্বদর: আয়াত ৩)**

অর্থাৎ এ রাতের ইবাদাত হাজার মাস বা ৮৩ বছর ৪ মাসের চেয়েও উত্তম।

এটাই আপনার রাত। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, তোমার জীবনের সবচেয়ে খুশির রাত কোনটি? বলুন, 'লাইলাতুল ক্বদর'। কেউ হয়তো বলবে, তার জীবনের সবচেয়ে খুশির রাত হলো তাদের বাসর রাত, কেউ বলবে তার গ্র্যাজুয়েশনের রাত, অথবা সেই রাতের কথা যে রাতে তাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। এর কোনোটাই খারাপ না। কিন্তু ক'জন বলবে যে, তাদের জীবনের সবচেয়ে খুশির রাত হলো সেই রাত, যে রাতে তাদের কাঁধ থেকে তাদের গুনাহের বোঝা সরিয়ে ফেলা হয়? ওয়াল্লাহি, এটাই আপনার জীবনের সবচেয়ে খুশির রাত হওয়া উচিত। যে রাতে আপনি আল্লাহর ইবাদাতে মাত্র কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে ৮৩ বছরের সমান সাওয়াব পেয়ে যান! এই রাতে আপনি "আল্লাহু আকবার", "সুবহানআল্লাহ", আর "আলহামদুলিল্লাহ" বললে যেন হাজার মাস ধরে বিরতিহীনভাবে আপনি যিকির করে গেলেন। এই রাতে আপনি কুরআন পড়লেন, তাওবা করলেন—তা যেন ৮৩ বছর ধরেই আপনি তিলাওয়াত আর তাওবা করে গেলেন। এই রাতে আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়ালেন, তার মানে

৩০ হাজার দিনই আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়ালেন। আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি এই মহান রাতের বরকত মিস করছে, সে কি নিজেই নিজেকে ধোঁকায় রেখে দেয়নি? যে এই বিশেষ রাতটি খারাপ কাজে, ফালতু কাজে পার করে দেয়—সে কি নিজেই নিজের উপর জুলুম করে না? আরামের ঘুম বাদ দিন, অলসতায় সময় পার করে দেবেন না—বিশেষ করে এই রাতে। নিজের পা দুটোকে দৃঢ় করে রবের সামনে বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে পড়ুন এবং ৮৩ বছরের সমান নেকী অর্জন করে নিন। কোনো বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষের দ্বারা এই সুবর্ণ সুযোগ হারানো সম্ভব না।

> **“এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল (ﷺ)) অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।” (সূরাহ আল-কদর: আয়াত ৪)**

সহিহ আল-জামি'ই এবং অনান্য হাদিসের গ্রন্থে এসেছে যে, এই পৃথিবীতে যত পাথরকণা রয়েছে তার থেকেও বেশি সংখ্যক ফেরেশতারা এই রাতে অবতীর্ণ হয় এবং জিবরীল (ﷺ)-ও তাদের সাথে আসেন। কী চমৎকার একটা বিষয় কখনও ভেবে দেখেছেন? এই বিষয়টার মাধ্যমেই তো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন এই রাতটা এত মহিমান্বিত রাত। জিবরীল (ﷺ) নবীজি (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরে এই পৃথিবীতে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু লাইলাতুল ক্বদর এমন একটি বিশেষ সময়, যখন সেই জিবরীল (ﷺ)-ও দুনিয়াতে নেমে আসেন। ফেরেশতারা সবসময় উত্তম কাজকেই ভালোবাসে, বিশেষ করে ইবাদাতের ক্ষেত্রে। তারা হচ্ছে এমন ইবাদাতকারী, যারা কখনও আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে না।

> **“তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে।” (সূরাহ আত-তাহরিম: আয়াত ৬)**

তাদের ইবাদাত করার জন্যে উপরে আছে বাইতুল মামুর। তাদের সকাল সন্ধ্যা ইবাদাতে কেটে যায়, তবুও সেই মহান রাতে তাঁরা এই দুনিয়ায় নেমে আসে। এই রাতের মহত্ত্ব এবং গুরুত্বের কারণে তারা ক্বদরের রাতে দুনিয়াতেই ইবাদাত করার ইচ্ছা পোষণ করবে। এই মহান রাতের জন্যে ফেরেশতারা পর্যন্ত আসমান ছেড়ে দুনিয়াতে নেমে আসে, অথচ কিছু মানুষ এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে পাপ কাজে ডুবে থাকে।

> **“শান্তি -ফজরের উদয় পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।” (সূরাহ আল-ক্বদর: আয়াত ৫)**

লাইলাতুল ক্বদরের চিহ্নসমূহ

ক্বদরের রাতটি হবে শান্তির রাত আর প্রশান্তি হচ্ছে ক্বদরের রাতের একটা চিহ্ন। এই রাতের ব্যাপারে সহিহ এবং জাল মিলিয়ে প্রচুর হাদিসের বর্ণনা আছে। এই রাতের কিছু চিহ্ন রাতে প্রকাশ পায় আবার কিছু প্রকাশ পায় পরদিন সকালে।

ইমাম মুসলিমের একটি সহিহ রেওয়াতে এসেছে, আবু হুরায়রা (ﷺ) বলেন, "আমরা একবার লাইলাতুল ক্বদর নিয়ে আলাপ করছিলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কথা শুনছিলেন। পরে তিনি (ﷺ) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা এই রাতকে মনে রাখবে তারা যেন এই রাতের চাঁদকে দেখে নেয় যা একটি থালার মতো হবে।" অর্থাৎ ক্ষয় হয়ে যাওয়া চাঁদ, যা দেখতে হবে অর্ধেক থালার মতো।

আবু দাউদ, আল-বাজ্জার এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, উবাদাহ ইবনু সামিত বলেছেন, নবী (ﷺ) বলেন, "লাইলাতুল ক্বদর হবে পরিষ্কার আর স্বচ্ছ একটা রাত—মনে হবে যেন সে রাতে একটা উজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে।" এখানে এই উজ্জ্বলতা চাঁদ থেকে আসবে না, বরং সেই রাতটা স্বচ্ছ এবং উজ্জল হবে ফেরেশতাদের দুনিয়াতে আসা-যাওয়ার কারণে—আল্লাহ তাআলা সে রাতে নূর দিয়ে দেবেন। হাদিসটিতে আরও বলা হয়েছে ক্বদরের রাত হবে একটি শান্ত এবং প্রশান্তির রাত, যা না খুব ঠাণ্ডা—না খুব গরম। আর সে রাতে ফজর পর্যন্ত আকাশে কোনো তারা খসবে না।

কোনো কোনো আলিমের মতে সেই রাতের বাতাস হবে ধীরস্থির, কেউ বলে থাকেন যে, হয়তো কেউ স্বপ্নে এই রাতের ব্যাপারে জানবে, আবার কোনো আমিল বলেন সেই রাতের ইবাদাত আর সালাত হবে বিশেষ খুশুযুক্ত। এ সবই নির্ভরযোগ্য আলিমদের মতামত। এছাড়াও অনেকে বলেন যে, ক্বদরের রাতে কোনো কুকুর ডাকবে না—যদিও এ কথার কোনো ভিত্তি নেই।

এই ছিল লাইলাতুল ক্বদরের কিছু নিদর্শন, কিন্তু তারপর কী হবে? ক্বদরের রাতের পরের দিনের সূর্যটি হবে সাদা এবং কড়া রোদমুক্ত। ইবনু হাজার (ﷺ) এবং আরও অন্যান্য আলিমদের মতে এ সকল নিদর্শন দেখেই লাইলাতুল ক্বদর নির্ধারণ করা সম্ভব। আত-তাবারি এবং ইবনু আল-আরাবি বলেন, "মানুষ যদি এই রাতটাকে চিহ্নিত করতে না পারে, তবুও এ রাতে ইবাদাতের সাওয়াব লাভ করবে।" অর্থাৎ আপনি যদি না-ও জানেন যে ক্বদরের রাত আসলে কবে, তবুও আপনি সাওয়াব পেয়ে যাবেন। ইবনু হাজার সহ আরও কিছু আলিমের মতে, এই রাতের পূর্ণ নেকী পেতে হলে অবশ্যই এই রাতের নিদর্শনগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে, না হলে অন্য সাধারণ রাতগুলোর মতোই সাওয়াব হবে। এই মতামত অনুযায়ী কেবল মাত্র তারাই হাজার মাসের সমান নেকী অর্জন করতে পারবে, যারা এই রাতকে চিহ্নিত করতে পারবে। দুটি মতামতের ভেতরে এই মতটা অত্যন্ত দুর্বল।

ক্বদরের রাতে বান্দা যদি আল্লাহর ইবাদাত করে, সে যদি লাইলাতুল কদ্বরের নিদর্শন বুঝতে না-ও পারে, তারপরেও সে সেই রাতের পূর্ণ সাওয়াব ও নেকী অর্জন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আস-সুবকি এবং অন্যান্য আলিমগণ একটি পরামর্শ দেন যে, কেউ যদি এই রাত চিহ্নিত করেও ফেলে, তারপরেও সে যেন অন্য কাউকে তা না জানায়। কারণ এই রাতটি চিহ্নিত করতে পারা একটি কারামাহ বা অলৌকিক বিষয়ের মতো। তাই সে যেন এই ব্যাপারটা গোপন রাখে। কিন্তু কেন? কারণ এর মাধ্যমে সে লোক-দেখানো থেকে এবং মানুষের হিংসা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, সূরাহ ইউসুফ থেকেই এমন একটা শিক্ষা পাওয়া যায়।

> **"তিনি বললেন, বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরাহ ইউসুফ: আয়াত ৫)**

যখন ইউসুফ (ﷺ) ভালো স্বপ্নটি দেখেন, ইয়াকুব (ﷺ) চাননি তিনি এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলেন।

আরেকটি কারণ হতে পারে, এভাবে আপনার সময় বাঁচবে। কেউ যদি সে রাতে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বলতে থাকে যে, আমি এই দেখেছি সেই দেখেছি, আমি নিশ্চিত আজকেই সেই রাত—তাহলে অনেক সময় নষ্ট হবে। এর চাইতে বরং ইবাদাতে সময় দেয়া বেশি জরুরি।

লাইলাতুল ক্বদর আসলে কোন রাত, তা আমরা কেউই জানি না। লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কিত আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর একটি বিখ্যাত হাদিস নিয়ে প্রতি বছরই অনেকেই প্রশ্ন করেন। রাসূল (ﷺ) সাহাবিদের বলতে যাচ্ছিলেন যে কোন রাতটি ক্বদরের রাত। যাওয়ার পথে তিনি দেখেন দুইজন লোক ঝগড়া করছে, আর এর মধ্যে তিনি লাইলাতুল ক্বদর কবে সে কথা ভুলে যান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি।" এটা আল্লাহ তাআলার রহমত এবং দয়া যে, আমরা এটা জানি না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত যে, তিনি তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমাদেরকে জানানো থেকে তাঁকে বিরত রেখেছিলেন।

কীভাবে এটা রহমত হতে পারে? হ্যাঁ, এটা রহমত। কারণ, আমরা যদি নির্দিষ্ট রাতটি চিনতাম, তাহলে পুরো রামাদানকে অবহেলা করতাম। শুধু ঐ একটা রাতের জন্য অপেক্ষা করতাম আর ঐ রাতে অল্পকিছু ইবাদাত করে ঘুমিয়ে যেতাম। কিন্তু তিনি বলেছেন, এটি দশরাতের মাঝে যেকোনো এক রাত, এর ফলে আমরা এই দশ রাতে অনেক বেশি সাওয়াব অর্জন করতে পারি। এরপর আবার এটিকে ঐ দশ রাতের যেকোনো বিজোড় রাতের একরাত বলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

যদি বলা হতো, কদরের রাত বছরের তিনশ পয়ষট্টি রাতের মাঝে যেকোনো এক রাত, তারপরও এই রাতটিতে ইবাদাতের আশায় সারা বছর প্রত্যেক রাতে ইবাদাত করা উচিত। কারণ, এই একটা রাতে আপনি যা-ই করবেন, যে ইবাদাতই করবেন,

সেটার জন্য ত্রিশ হাজার রাতের ইবাদাতের প্রতিদান পেতে যাচ্ছেন। যদি একটি কাগজের টুকরায় বছরের যে কোনো একটি দিনের তারিখ লেখে সেটা লুকিয়ে রাখা হয় আর বলা হয় যে ঐ তারিখে যদি কেউ এক টাকা দেয়, তাহলে সে বিনিময়ে ত্রিশ হাজার টাকা পাবে। যেকোনো বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কী করবে? কেউ যদি বোকাও হয়, তবু সে বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিনের জন্য তিনশ পয়ষট্টি টাকা যোগাড় করবে, এরপর প্রতিদিন এক টাকা করে দেবে। কেননা এটা নিশ্চিত যে, এভাবে করলে সে ত্রিশ হাজার টাকা পাবেই। বড়জোর তার কয়েকশ টাকা ক্ষতি হবে। কিন্তু এই কয়েকশ টাকার বিনিময়ে সে নিশ্চিতভাবে ত্রিশ হাজার টাকা পকেটে পুরতে পারবে। লাইলাতুল ক্বদরের ব্যাপারটিও এমনই।

পাঁচটি বিজোড় রাতের মাঝে কোনো এক রাতে আপনি যে কাজ করবেন, তার জন্য ত্রিশ হাজার রাতের সমান প্রতিদান পাবেন। আল্লাহ মাত্র পাঁচ রাতের মধ্যে কমিয়ে এনে আমাদের প্রতি রহম করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলতে পারতেন যে, এটা বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিনের মাঝে যেকোনো একদিন। তবুও কিন্তু আমাদেরকে ক্বদরের রাতের জন্য খোঁজ করতে হতো আর তখন কাজটা আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা একে শুধুমাত্র রামাদান মাসেই কমিয়ে আনেননি, তিনি আমাদের জন্য একে শেষ দশরাতে কমিয়ে এনেছেন এবং উলামাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় মত অনুযায়ী দশরাতের বিজোড় রাতগুলোতে অর্থাৎ শুধুমাত্র পাঁচ রাতের যেকোনো এক রাত হলো ক্বদরের রাত।

এরপরও আপনি কিছু মানুষ পাবেন যারা প্রশ্ন করবে, এই পাঁচরাতের কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর? এটা কিন্তু আল্লাহর সাথে বেশিই কৃপণতা করা হয়ে যাচ্ছে। ইবাদাতের ব্যাপারে মনোযোগী হোন। লাইলাতুল ক্বদর আপনার জন্য অনেক কিছুই নির্ধারণ করে দিতে পারে। কিয়ামাতের দিনে, সেই ভয়াবহ আতঙ্কের দিনে, আপনি যখন মীযানের সামনে বিবস্ত্র আর খৎনাবিহীন অবস্থায় দাঁড়াবেন, তখন হয়তো এমনকিছু আপনার জন্য প্রশান্তি এনে দেবে, যা আপনি এই রাতে করেছিলেন। বিশ্বজগতের স্রষ্টা, জান্নাত-জাহান্নামের স্রষ্টা, আল্লাহর সামনে আপনি যখন দাঁড়াবেন, তখন ঐ অবস্থায় হয়তো এই রাতের ইবাদাতই আপনার জন্য প্রশান্তি এনে দেবে।

> **“ওহে মানবগোষ্ঠী! তোমাদের রবকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের ঝাঁকুনি এক ভয়ংকর ব্যাপার। সেইদিন যখন তোমরা তা দেখবে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে, আর তুমি দেখতে পাবে মানুষকে নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা মাতাল নয়, বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি বড় কঠোর।” (সূরাহ আল-হজ্জ: আয়াত ১-২)**

আল্লাহর সাথে কৃপণতা করবেন না। হতে পারে এ রাতে আপনি যে বিপুল সাওয়াব অর্জন করবেন, সেটাই আপনাকে আখিরাতের সাফল্য এনে দেবে।

হতে পারে এই রাতই আপনাকে আপনার আমলনামা ডান হাতে এনে দেবে, আর তখন আপনি আপনার পরিবারের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলবেন,

"এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো!" (সূরাহ আল-হাক্কাহ: আয়াত ১৯)

লাইলাতুল ক্বদরের জন্য কিছু বাস্তবধর্মী উপদেশ

ধরুন, আমরা জেনে গেলাম কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর, তাহলে এখন আমাদের কী করা উচিত?

আপনি যদি লাইলাতুল ক্বদর পেতে আগ্রহী হন, তাহলে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির থেকে শুরু করে আপনার জানা সব ধরণের ইবাদাতই সাধ্যমতো করার চেষ্টা করবেন। তবে লাইলাতুল ক্বদরের জন্য একটা বিশেষ দু'আ আছে। ক্বদরের রাতে এই দু'আটি বেশি বেশি পড়তে প্রিয় নবীজি (ﷺ) আমাদের শিখিয়ে গেছেন—বিশেষ করে রামাদানের শেষ দশ রাতে। কারণ শেষ দশ রাতের যেকোনো একটি রাত হচ্ছে লাইলাতুল ক্বদর—বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলো।

দু'আটি হল- "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন তুহিব্বুল 'আফওয়া, ফা'ফু আন্নি।" অর্থাৎ *"হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল এবং ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।"*

এখানে 'ক্ষমা করা' অর্থে 'গাফুর' শব্দটি ব্যবহার না করে 'আফুউ' ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও শব্দ দুটির অর্থ একই, তাহলে 'আফুউ' ব্যবহার করার কারণ কী? অর্থগত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, আরবরা সাধারণত 'মুছে ফেলা' অর্থে 'আফুউ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যেমন- মরুভূমি থেকে পায়ের চিহ্ন চলে গেলে তারা বলে- আফাত আসারাল ক্বাওম, মানে এটা তো মুছে গেছে। এ থেকেই আফুউ শব্দের অর্থ সহজভাবে বোঝা যায়।

উলামারা এই দুটি শব্দের মধ্যে অনেক পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, ফরয ইবাদাত ছেড়ে দেওয়ার পর যদি ক্ষমা করা হয় তখন 'আফুউ' ব্যবহার করা হয় আর হারাম কাজ করার পর ক্ষমা করলে তখন 'গাফুর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আবার কারো কারো মতে আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু আপনার গুনাহগুলো তারপরও লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং বিচার দিবসে আপনাকে এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অর্থাৎ আপনাকে মাফ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত সেগুলো মুছে ফেলা হবে না। বুখারিতে বর্ণিত একটি হাদিসে এই ধরণের একটি কথা উল্লেখ আছে।

হাদিসটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে নিজের সান্নিধ্যে আনতে থাকেন, আর তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন, তুমি কি নিজের অমুক গুনাহের কথা মনে করতে পারো? বান্দা বলবে, হ্যাঁ পারি। এরপর আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি

তোমার তমুক গুনাহর কথা মনে করতে পারো? বান্দা আবারো বলবে, হ্যাঁ পারি। এভাবে বান্দা যখন নিজের সকল গুনাহর কথা স্বীকার করে নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি ইহকালে তোমার এই গুনাহগুলোকে গোপন রেখেছিলাম আর তারপর ক্ষমা করে দিয়েছি। উলামারা বলেন এটা হলো 'মাগফিরাহ'।

তাহলে 'আফুউ' কী? 'আফুউ' এর থেকেও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ক্ষমা। 'আফুউ' হলো যখন আল্লাহ তাআলা আপনার গুনাহগুলো ক্ষমা দেবার পর তা পুরোপুরি মুছে ফেলেন। এমনকি বিচার দিবসেও সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বান্দা এবং ফেরেশতাদেরকেও এই গুনাহগুলোর কথা ভুলিয়ে দেন, যেন বিচার দিবসে আপনাকে এসব গুনাহর জন্য অপমানিত হতে না হয়। মানুষ তার পাপ কর্মের জন্য যখন একেবারে মন থেকে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হয়ে এই ধরণের ক্ষমা করে থাকেন।

'আফুউ' শব্দটি কুরআনে অনেকবার এসেছে, এর মধ্যে পাঁচবার শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ সর্বশক্তিমান কথাটির সাথে। আল্লাহ চাইলেই শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি ক্ষমা করে দেন।

> **"ভালো কাজ তোমরা প্রকাশ্যে করো কিংবা গোপনে করো, অথবা কোনো মন্দ কাজের জন্য যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও, তাহলে (তোমরাও দেখতে পাবে,) আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল ও প্রবল শক্তিমান।" (সূরাহ আন নিসা: আয়াত ১৪৯)**

'আফুউ' আর 'গাফুর' শব্দ দু'টি কুরআনে সম্মিলিতভাবেও এসেছে, সম্ভবত এটা দেখানোর জন্য যে, আপনি মাগফিরাহ চাইলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু আপনি যদি আরো অগ্রবর্তী হোন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন, তাহলে 'আফুউ' পাবেন যার ফলে আপনার সকল গুনাহ পুরোপুরি মুছে দেওয়া হবে। যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বুঝা যায় যে 'আফুউ' হচ্ছে 'গুফরান' এর বিস্তৃত রূপ, যার জন্য পুরস্কারের পরিমাণও অনেক বেশি হবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এবং সম্মানজনক ক্ষমা। কুরআনে খেয়াল করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা যখন সবচেয়ে গুরুতর গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন বা মানুষকে অন্যদের কোনো গুরুতর ব্যাপারে মাফ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, তখন 'আফুউ শব্দটি ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মূসা (ﷺ)-এর কওম যখন একটি বাছুরকে মাবুদ রূপে গ্রহণ করেছিল।

> **"(আরো স্মরণ করো,) যখন মূসাকে আমি (বিশেষ একটি কাজের জন্যে) চল্লিশ রাত নির্ধারণ করে দিলাম, তার (যাওয়ার) পর তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদ রূপে) গ্রহণ করে নিলে, আসলে তোমরা ছিলে ভীষণ যালেম!" (সূরাহ আল বাক্বারা: আয়াত ৫১)**

এরপর আল্লাহ্ তাআলা যখন তাদের ক্ষমা করে দেন, তখন বলেন,

> **"অতপর আমি এ আশায় তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।" (সূরাহ আল বাক্বারা: আয়াত ৫২)**

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'আফুউ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, 'গাফুর' নয়। এমনকি তাবূক যুদ্ধে কুরআন তিলাওয়াতকারীদের যারা বিদ্রূপ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> **"(হে কাফেররা,) তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা করো না, একবার ঈমান আনার পর তোমরা পুনরায় কাফের হয়ে গিয়েছিলে; আম যদি তোমাদের একদলকে (তাদের ঈমানের কারণে) ক্ষমা করে দিতে পারি, তাহলে আরেক দলকে (পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাবার জন্যে) ভীষণ শাস্তিও দিতে পারি, কারণ এ (শেষের দলের) লোকেরা জঘন্য অপরাধী।" (সূরাহ আত তাওবা: আয়াত ৬৬)**

এখানেও আফুউ ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ইসলামের আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি নিয়ে উপহাস করা ও বিশ্বাসীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা একটি জঘন্য অপরাধ।

ইসলামে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করাও একটি গুরুতর অপরাধ। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> **"দু'টি বাহিনী যেদিন (সম্মুখসমরে) একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলো, নিঃসন্দেহে সেদিন যারা (ময়দান থেকে) পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের একাংশের অর্জিত কাজের জন্যে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিয়েছিলো, অতপর (তারা অনুতপ্ত হলে) আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দিলেন; আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।" (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১৫৫)**

যেহেতু এগুলো সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ, তাই আল্লাহ তাআলা এখানে গাফুর এর পরিবর্তে আফুউ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আমরাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই সর্বোচ্চ সম্মানজনক ক্ষমাই পেতে চাই। এবং আমাদের সেটাই পাওয়ার জন্য মেহনত করে যেতে হবে।

রামাদান এবং আইন জালুতের যুদ্ধ

রামাদানে মুসলিম উম্মাহর আরেকটি ঐতিহাসিক বিজয় ছিলো তাতারদের বিরুদ্ধে আইন জালুতের বিজয়।

এই উম্মাহর উচিত তাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জানা। এই উম্মাহ সঠিক পথের দিশা পাবে না, যদি না তারা তাদের গৌরবময় সূচনা সম্পর্কে জানে। মুসলিম উম্মাহকে তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে। উম্মাহর উপর আজকে এমন সব নেতা চেপে বসেছে যারা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে নষ্ট ও কলুষিত করছে। এরা মুসলিমদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না। এই শাসকরা মুসলিমদের এমন একটা ধারণা দিয়ে গড়ে তুলতে চায় যে, মুসলিমরা সবসময় পরাজিত এবং বশ্যতা স্বীকার করে যাবে। তারা মুসলিমদের বিশ্বাস করাতে চায় স্বৈরশাসন এবং নিপীড়নই তাদের নিয়তি। তারা চায় মুসলিমরা আল্লাহর শত্রুদের কাছে নতি স্বীকার করুক, দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্ত থাকুক, পুরুষত্বহীন জীবন কাটাক।

রামাদানের শেষ দশদিন—বরকতময় সময়—ইবাদাতের সময়। কিন্তু একই সাথে আমাদের এটাও জেনে রাখা উচিত, এই দশদিন আমাদের ইতিহাসে আল্লাহর নিকৃষ্টতম কিছু শত্রুদের পরাজিত করার সুখস্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। এর একটি হলো তাতারদের পরাজয়—যা ঘটেছিল আইন জালুতের যুদ্ধে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের হাতে তাতার সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূচনা হয়, যারা কিনা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিমদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। সময়টা ছিল ৬৫৮ হিজরি, ২৫ রামাদান। মঙ্গোলরা চীন থেকে সামরিক অভিযানে বের হয়েছিল, তাদের প্রথম নেতা ছিল চেঙ্গিস খান। তার নামের অর্থই বলে দেয় তারা কতটা অহংকারী জাতি ছিল। চেঙ্গিস খান অর্থ যে বিশ্বকে নতি স্বীকারে বাধ্য করে, রাজাদের রাজা, শক্তিমানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান।

সে ছিল এমন এক মানুষ, যে রক্ত ঝরাতে ভালোবাসত। তার একটা গুণ ছিল, সে মানুষকে তার নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখত। সে সময় মুসলিম উম্মাহ ছিল দুর্বল, যা তার দখলদারিত্বকে সহজ করে দেয়।

দুর্বল হলেও মুসলিম সাম্রাজ্য বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই উম্মাহর সাম্রাজ্য ছিল এশিয়ার চীন সীমান্ত থেকে আফ্রিকা, ইউরোপ এবং স্পেন পর্যন্ত সুবিস্তৃত। যদিও বিশ্বের প্রায় অর্ধেক রাজত্ব ছিল মুসলিমদের হাতে, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল অনৈক্য আর বিভাজনের রাজনীতি। এই সমস্যা সম্পর্কে নবীজি (ﷺ) আমাদের আগেই সতর্ক করে গেছেন। আসলে জয় পরাজয় সংখ্যা বা শক্তিমত্তার উপর ভিত্তিতে হয় না, বরং এটা নির্ভর করে উম্মাহ আল্লাহর কতটা নিকটবর্তী তার ওপর।

তখন ছিল আব্বাসী খিলাফত। এই খিলাফত ব্যবস্থা ছিলো নামে মাত্র, কাগজে-কলমে —কার্যত এর কোনো শক্তি ছিল না। তারা ব্যস্ত ছিল সম্পদ জমা করা আর সিংহাসন ধরে রাখায়। উম্মাহর ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা ছিল না, উম্মাহকে তারা অবহেলা করত। আব্বাসীদের রাজধানী ছিল ইরাকে। তৎকালীন মিশর, শাম, হিজায এবং ইয়েমেন ছিল মূলত সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উত্তরসূরিদের হাতে। কিন্তু সালাহউদ্দীনের ছেলেরা তাদের বাবার মতো ছিল না—তারা ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের বাবার হাতে প্রতিষ্ঠিত দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ একটি মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে নিয়েছিল। সালাহউদ্দিনের ছেলে এবং নাতিরা নিজেদের মধ্যে কলহ বাঁধিয়ে উম্মাহকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারা নেতৃত্বের জন্য পাগল ছিল। নিজেদের অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করত এবং ক্ষমতার জন্য কোন্দলে লিপ্ত থাকত।

মুসলিম উম্মাহর একজন প্রথম সারির ইতিহাসবেত্তা ইবনু আসির (রহ.) সেই সময়ের কথা তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। *আল কামিল ফিত তারীখ* তাঁর লেখা এক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। সেই সময়ের বর্ণনায় তিনি বলেন, "দীর্ঘ সময় ধরে এই অন্ধকার যুগ সম্পর্কে চুপ করে ছিলাম। বছরের পর বছর কেটে গেছে, আমি এই সময় নিয়ে কিছু না লেখে এড়িয়ে গেছি। আমি এক পা আগাই, এক পা পিছাই। এই ইতিহাস নিয়ে, মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে লিখব কি লিখব না—এই নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। আমার মনে হতো আমার মা যদি আমাকে এই সময়ে জন্ম না দিতেন, আমি যদি এই অবস্থা দেখার আগেই মারা যেতাম, যদি সব ভুলে যেতে পারতাম, আমাকে এসবের কিছুই দেখতে না হতো!"

ইবনু আসির নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। তাতারদের ভয়াবহ নৃশংসতার গল্প তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সত্যি বলতে, আদম (আ.)-এর সময় থেকে শুরু করে এর চাইতে ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ আর সংঘটিত হয়নি। এটা কোনো অতিরঞ্জন নয়। নৃশংসতার বিচারে কাছাকাছি যদি কিছু থেকে থাকে, সেটা হলো ঈসা (আ.) এর ৫৬৩ বছর আগে বুখতানাসার কর্তৃক সংঘটিত বায়তুল মুকাদ্দাসে বনী ইসরাইলিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ। কতটা ভয়াবহ ছিল সেই সময়? একটি কাহিনি শুনলেই আমরা সেটা বুঝতে পারব। ইবনু আসির বলেছেন, একবার তাতারদের এক মহিলা কোনো বাড়িতে ঢুকেছিল। সে বাড়িতে অনেক পুরুষ, মহিলা এবং বাচ্চারা ছিল।

সেই তাতার মহিলা একে একে সবগুলো পুরুষ, মহিলা আর বাচ্চাদেরকে হত্যা করল, কিন্তু এদের মধ্যে একজনও আত্মরক্ষার কথা ভাবলই না! বাঁচার কোনো চেষ্টাই করল না! এমনই ছিল অবস্থা। কারণ তারা ছিল পরাজিত মানসিকতার মুসলিম। তারা আগেই হার মেনে নিয়েছিল, তারা ছিল দাসভাবাপন্ন মুসলিম। এমন আরো একটি কাহিনি তিনি বর্ণনা করেন। মুরাঘাহ্ নামক একটি জায়গায় তাতারদের এক লোক প্রবেশ করে, সেখানে ছিল ১০০ পুরুষ। ১০০ পুরুষের প্রত্যেককে সে একে একে হত্যা করে। তাদের মধ্যে একজনও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেনি, একজনও তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

তাতার জাতি আদ জাতির মতো অহংকারী হয়ে গিয়েছিল। ঔদ্ধত্যের বশে আদ জাতি বলে উঠেছিল, 'কে আছে আমাদের চাইতে বেশি শক্তিশালী? কোথায় হুদ! বলে যাও, কে আছে এমন?'

> **"আর আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলতো আমদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?" (সূরাহ্ ফুসসিলাত: আয়াত ১৫)**

এই কথার মাধ্যমে তারা কার্যত এটাই বলত, 'হুদ, তোমার রবের চাইতেও আমরা বেশি শক্তিশালী।' আল্লাহ্ বলছেন,

> **"তারা কি লক্ষ্য করেনি যে আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত।" (সূরাহ্ ফুসসিলাত: আয়াত ১৫)**

তারা কি তাঁকেই ভুলে গেছে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন? তিনি তো তাদের চেয়ে ক্ষমতাধর ও পরাক্রমশালী!

> **"অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আজাব আস্বাদন করানোর জন্য তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে আর পরকালের আজাব তো আরো লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" (সূরাহ্ ফুসসিলাত: আয়াত ১৬)**

এই ঔদ্ধত্যের ফলাফল কী পেলো তারা? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ঝড়ো বাতাস পাঠালেন। ঔদ্ধত্যের ফলস্বরূপ এই দুনিয়াতেই লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তির স্বাদ ভোগ করালেন আর পরকালের জন্য যা বাকি রাখলেন তা হবে আরো ভয়াবহ!

আপনি আদ জাতির মতো উদ্ধত হতে চান? এটা কোনো তামাশা নয়! আপনি আল্লাহ্ ও মুমিনদের সাথে ঔদ্ধত্য দেখাতে পারেন না। আদ জাতি স্বয়ং আল্লাহকে তাদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিয়েছিল! কিন্তু আপনি আল্লাহকে প্রতিপক্ষ বানাতে পারেন না, যিনি আমাদের চেয়ে ক্ষমতাধর!

আদ জাতি বলেছিল তারা অন্য সবার চাইতে বেশি শক্তিশালী, অথচ সামান্য বাতাসের সামনে প্রমাণ হয়ে গেল মানুষ আসলে কতটা শক্তিশালী! ঝড়ো বাতাস দানবাকৃতির বিশালদেহী আদ জাতিকে কাঠির শলার মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং তারা মরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আদ জাতি, তোমরা যদি এতটাই শক্তিশালী হয়ে থাকো তবে কেন তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারলে না? এ তো শুধু সামান্য বাতাসই ছিল!

একই ব্যাপার ঘটেছিল নমরুদের সাথে। যখন সে ইবরাহীম (ﷺ)-এর সামনে দাঁড়াল, ঔদ্ধত্যের সাথে বলল, সে জীবন ও মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম, আর আল্লাহ তখন তার জীবন কেড়ে নিলেন তুচ্ছ মাছিকে দিয়ে!

যখন টাইটানিক জাহাজ বানানো হয়েছিল, তারা বলেছিল এ এমন এক জাহাজ যা স্বয়ং আল্লাহও ডুবাতে পারবে না! আল্লাহ টাইটানিককে প্রথম যাত্রাতেই ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যেন তারা বুঝতে পারে তাদের ক্ষমতা আসলে কতটুকু। আল্লাহর বিপক্ষে গিয়ে কেউ টিকতে পারে না।

ঠিক একইভাবে যখন বলা হলো, তাতার সৈন্যবাহিনী অজেয়, কেউ তাদের হারাতে পারবে না—আল্লাহ তখন তাঁর এক বান্দাকে পাঠালেন যিনি তাদের পরাজিত ও ধ্বংস করে দিলেন। তিনি হলেন সাইফুদ্দীন কুতুয—নেতৃত্ব গ্রহণের এক বছরের মধ্যে আল্লাহ তার মাধ্যমে তাতার বাহিনীকে পরাজিত করেন।

এই বরকতময় মাসে জন্ম নিল একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল। প্রতিপক্ষের বিশাল বাহিনীর তুলনায় এটা কিছুই ছিল না। এর জন্ম হয়েছিল গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক সময়ে, আমাদের সময়ের সাথে যে সময়ের মিল আছে। তখন উম্মাহের ঐক্যে তীব্রভাবে ভাঙন ধরেছিল, শাসকগোষ্ঠী উম্মাহর দুর্দশা লাঘবের চাইতে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে বেশি মনযোগী ছিল। খিলাফতের অস্তিত্ব ছিল নামে মাত্র, বাস্তবে এটি ছিল অকার্যকর। সবখানেই ছিল দ্বন্দ্ব আর ক্ষমতার লড়াই।

মুসলিম জাতির সেই গভীর কালো রাত্রিতে উত্থান ঘটে এক সাহসী বীরের যার নাম আল মালিক আল মুজাফফর সাইফুদ্দীন কুতুয! তিনি হিজরি ৬৫৭ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, সেই সময় তাতাররা সীমালঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছিল। তিনি এমন সময়ে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন যখন মিশর তাতার আক্রমণের ঝুঁকিতে। উম্মতের মর্যাদা ও বিজয় ফিরিয়ে আনতে তিনি শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন, আর এক বছরের মধ্যে তিনি তাতারদের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করেন।

তাতাররা কুখ্যাত ছিল তাদের নিষ্ঠুরতা আর বেপরোয়া স্বভাবের জন্য। যুদ্ধের ময়দানে ত্বরিতগতিতে বিজয় লাভ করত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিত। প্রতিপক্ষের মনে প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি করা ছিল তাদের যুদ্ধকৌশল, আর এই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে তারা যুদ্ধের ময়দানে খুব দ্রুত শত্রুদের হারিয়ে দিতে সক্ষম

হতো। কোনো এলাকায় পৌঁছার আগেই তাদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের খবর প্রতিপক্ষের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করত।

তারা বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে অভিযান পরিচালনা করত, এমনকি তাদের প্রতিপক্ষ যদি নিতান্ত তুচ্ছ কেউ হতো, তবুও। তারা যখন কোনো শহরে প্রবেশ করত, সেই শহরকে এমনভাবে ধ্বংস করত যে তাদের ধ্বংসযজ্ঞের পর সেই শহরকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না সেটা কোনো শহর ছিল! নারী, শিশু, বৃদ্ধ, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি—তারা কারো মধ্যে বাছবিচার করত না, সবাইকে সমানে হত্যা করত। তাতাররা কখনোই ওয়াদা রক্ষা করত না, উল্টো সবসময় চুক্তিভঙ্গ করত।

মুসলিমবিশ্বে তাতারদের দখলদারিত্ব শুরু হয় বুখারার মাধ্যমে—বর্তমানে যা উজবেকিস্তান নামে পরিচিত। সেখানকার মুসলিমরা শক্তিশালী ছিল না, তারা তাতারদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। চেঙ্গিস খান তাদের কথা দিয়েছিল, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার ১২ তম খণ্ডে ইবনু কাসির বলেন, 'আত্মসমর্পণ করলে কাউকে হত্যা করা হবে না'-এই চুক্তি করার পরেও চেঙ্গিস খান এত বেশি মুসলিমকে হত্যা করেছিল যে, শুধু আল্লাহই জানেন আসলে কত মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে, এর কোনো হিসাব নেই! চেঙ্গিস খান নারীদের উঠিয়ে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সামনে ধর্ষণ করত! তাতারদের এই জুলুম স্থায়ী হয়েছিল প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এবং একের পর এক হত্যাযজ্ঞে মুসলিমরা প্রাণ হারাচ্ছিল। এই কঠিন পরিস্থিতি নিয়ে মুসলিম শাসকদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। তাদের মনোভাব ছিল অনেকটা এমন-'আমি তো ভালো আছি, আমি তো এখনো ক্ষমতায় আছি, তাই অন্যদের ব্যাপারে আমার না ভাবলেও চলবে!' এমনকি কিছু কিছু মুসলিম শাসক নিজেদের মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য চেঙ্গিস খানকে সাহায্য পর্যন্ত করছিল।

৬৫৪ হিজরির পর অবস্থা আরো অবনতির দিকে গেল যখন তাতাররা রোমান ভূখণ্ড দখল করল। তাদের নেতা হলো চেঙ্গিস খানের পুত্র হালাকু খান। সে বাগদাদ আক্রমণ করল হিজরি ৬৫৬ সালে এবং সেখানে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণহত্যাগুলোর একটি সংঘটিত হয়। খুন, রাহাজানি, লুটপাট, ধর্ষণ তো আছেই—এই আক্রমণের মাধ্যমে আব্বাসী খিলাফাতকেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়! তারা চেয়েছিল ইসলামি সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে। তারা সেখানে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ, তার পরিবার-পরিজন ও সহযোগীদের হত্যা করে।

মাত্র ১২ দিনের মধ্যে সে বাগদাদের বিশ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করে! মুসলিম ও ইসলামের সামান্য ছায়াটুকুও হালাকু খান সহ্য করত না। ইসলামের ইতিহাসে সে ছিল ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রুদের একজন। ইসলামের প্রতি তার ঘৃণা আরো প্রকট হওয়ার একটি কারণ ছিল তার স্ত্রী। তার স্ত্রী ছিল ক্রুসেডারদের একজন, তাই সে মুসলিমদের ঘৃণা করত, স্বামীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ইন্ধন যোগাত।

হালাকু খান যখন বাগদাদে প্রবেশ করল, তখন সে খিলাফতের কোনো তোয়াক্কাই করল না। খিলাফত তখন ছিল অন্তঃসারশূন্য একটি নামমাত্র। হালাকু খানের লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর বুক থেকে মুসলিম উম্মাহের নাম নিশানা মুছে দেওয়া এবং সব মুসলিমকে হত্যা করা।

বাগদাদ দখলের পর তাতাররা আরো উদ্ধত ও যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠল। একের পর এক মুসলিম ভূমি দখল করতে লাগল, চলতে থাকল গণহত্যা আর ধর্ষণের মহোৎসব। বাগদাদ অতিক্রম করে তারা পৌঁছল ফোরাতে। সিরিয়ার আলেপ্পোয় পৌঁছে সেখানে যাদের পেল প্রায় সবাইকে মেরে ফেলল। তারপর তারা দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলো। এরপর তারা দখল করল একে একে নাবলুস, বাইতুল মাকদিস এবং গাজা। প্রতিরোধ গড়ে তোলার কেউ ছিল না, ছিল না কারো তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো সাধ্য। সবাই কাপুরুষের মতো কেবল চেয়ে ছিল আর নতি স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করছিল। আসলে কারো ইচ্ছাই ছিল না প্রতিরোধ গড়বার। তাতাররা তাদের আগ্রাসনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল। আর যখন কেউ এমন অবস্থায় পৌছায়, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম, একক ব্যক্তি বা জাতি যা-ই হোক না কেন, আগ্রাসনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

তাতারদের নেতা হালাকু খান চল্লিশজন লোকের একটি দলকে পাঠাল একটা চিঠি নিয়ে—মিশরের শাসক সুলতান আল মালিক আল-মুজাফফর সাইফুদ্দীন কুতুযের কাছে। হালাকু তাঁকে সেই চিঠিতে হুমকি দিয়েছিল। কুতুযের মাথায় ছিল ভিন্ন চিন্তা। তিনি তাঁর সকল সেনাপতিকে একত্রিত করলেন আর সিদ্ধান্ত নিলেন ওই চল্লিশ বার্তাবাহককে হত্যা করবেন। তাঁরা চল্লিশজনের সবাইকে হত্যা করলেন। তাদের ছিন্ন মস্তকগুলো কায়রোর সদর দরজায় ঝুলিয়ে রাখলেন। তিনি ঠিক কেন তাদেরকে হত্যা করেছেন সে ব্যাপারে অনেক ব্যাখ্যা আছে। আল্লাহর ইচ্ছায় কুতুয উম্মাহকে রক্ষা করার সংকল্প করলেন। তিনি যুদ্ধ করতেই চেয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন তাতাররা মিশরের দিকে এগিয়ে আসছে। হয় তিনি তার লোকদেরকে সাথে নিয়ে ভেড়ার মতো মরবেন অথবা লড়াই করে বিজয়ী হবেন—এ ছাড়া তৃতীয় আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

সাইফুদ্দীন কুতুয তাঁর সেনাপতিদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। সব সৈন্যদের জড়ো করলেন, ঘোষণা দিলেন এখন লড়াই করার সময়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর পতাকা উত্তোলন করলেন তিনি। শামের পার্শ্ববর্তী এলাকার নেতাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মুসলিম নেতারা (সালাহউদ্দীনের ছেলেরা) তাঁর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করল। কিন্তু তিনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, তাতাররা খুব শীঘ্রই মিশর আক্রমণ করতে যাচ্ছে, পরিস্থিতি খুবই গুরুতর, তাই আসো—বিভেদ ভুলে আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে একত্রিত হই আর শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হয়ে যুদ্ধ করি।

মুসলিম নেতাদেরকে নিয়ে সাইফুদ্দীন খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তাঁর মাথাব্যথার মূল কারণ ছিল দামেস্কের আমীর নাসির ইউসুফ আল আইয়ুবী। সে ছিল সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর নাতি। কিন্তু কেবল ঐ রক্তের সম্পর্ক পর্যন্তই, কাজে কর্মে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ধারে কাছেও সে ছিল না। তাতাররা যখন বাগদাদ দখল করল, তখন এই কুখ্যাত নাসির ইউসুফ তাতারদের বলেছিল, "শোনো, তোমরা যখন এখানে আসবে, আমি তোমাদেরকে কুতুযের বিরুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করব, মিশর জয় করতে তোমাদের সাহায্য করব।" ক্ষমতার গদি আঁকড়ে ধরে রাখা ছাড়া তার আর কোনো চাওয়া ছিল না। সালাহউদ্দীনের এই বংশধররা সেই গৌরব এবং দৃঢ় এক জাতিকে ধ্বংস করেছিল যা তাদের পূর্বপুরুষ সালাহউদ্দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারা একটি শক্তিশালী জাতির ঐক্যকে নিজ হাতে নষ্ট করেছিল।

দামেস্কের একজন আমীর, হালাবে একজন আমীর, হামায় একজন আমীর, হোমসে একজন আমীর—এভাবে ছোট ছোট শহরে বিভক্ত হয়ে তারা নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সবাই নেতা হতে চায়, ক্ষমতা চায় আর নিজ বংশধরদের জন্যে তা রেখে যেতে চায়!

কিন্তু কুতুযের লক্ষ্য ছিল আরো বড়, আরো মহৎ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আমি, তুমি, আমরা ক্ষমতায় থাকব—এরকমটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। উম্মাহর জীবনমরণ অবস্থা, মহিলাদের ইযযাত হুমকির মুখে—এমন অবস্থায় সাইফুদ্দীন কুতুয চেয়েছিলেন উম্মাহকে বাঁচাতে। অন্যদিকে দামেস্কের আমীর নাসির ইউসুফ আল-আইয়ুবী চেয়েছিল নিজের সিংহাসন বাঁচাতে। তার অবস্থা ছিল বর্তমান সময়ের নেতাদের মতো—যারা উম্মাহকে গণহারে মরতে দেখেও, ধর্ষিত হতে দেখেও বিলাসী জীবনে মত্ত হয়ে আছে।

কুতুয সর্বতোভাবে চেষ্টা করলেন অতীতের সব ভুল বোঝাবুঝি পেছনে ফেলে সবাইকে এক করতে, যেন সবাই আগ্রাসী শত্রুদের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়। কুতুয সবচেয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন নাসির ইউসুফ আল-আইয়ুবীর ব্যাপারে। কারণ কুতুয বুঝতে পেরেছিলেন নাসির সম্ভবত তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুদের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছে। লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি উম্মাহর মাঝে কত বড় ধরণের একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে।

মিশরের নেতা কুতুয খুব ভাল করেই জানতেন নাসির ইউসুফ আল-আইয়ুবী কতটা ক্ষমতালোভী ছিল। কুতুয তাই তাকে চিঠি লিখলেন যে, "তুমি মিশর নিয়ে নিতে পারো। তুমি আমার রাজ্য নিয়ে নিতে পারো, শুধু আমাকে একজন প্রতিনিধি হিসেবে রাখো। সবকিছু তোমার অধীনেই থাকবে, আমিও তোমার অধীনেই থাকব। শুধু আসো আমরা এই শত্রুর বিরুদ্ধে এক হই।"

আমরা হয়তো কল্পনাও করতে পারব না বর্তমান সময়ের কোনো নেতা এমনটা করছে! আমরা ছোট্ট একটা মসজিদের কোনো ইমামকেও খুঁজে পাবো না যে উম্মাহর স্বার্থে স্বেচ্ছায় পদ থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি আছে। কিন্তু কুতুয এমন ছিলেন না, তিনি ক্ষমতালোভী ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহর সম্মান রক্ষা করা, উম্মাহর মহিলাদের ইযযাত রক্ষা করা, উম্মাহকে রক্তপাত থেকে বাঁচানো।

কিন্তু নাসির ইউসুফ আল-আইয়ুবী ছিল অহংকারী, সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। সাইফুদ্দীন কুতুযের পরিকল্পনায় সে একটা মাথাব্যথা হয়ে থাকল। যখন তাতাররা এলো, সে তাদের সাথে যোগ দিতে চলে গেল।

কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি যখন আল্লাহর উপর ভরসা করবেন, তখন আল্লাহ অবশ্যই আপনার জন্য একটা উপায় বের করে দেবেন। এই প্রস্তাব দেওয়ার কিছুদিন পরেই তাতাররা আলেপ্পো এবং দামেস্কে এসে পড়ল এবং নাসির ইউসুফ আল-আইয়ুবীকে উৎখাত করল। সে তার সৈন্যদের নিয়ে ফিলিস্তিনে পালিয়ে আসল কাপুরুষের মতো। সেখানে তাকে কুতুযের বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হলো। তাও বেশিদিন চলল না। সে ছিল উম্মাহর শরীরে একটা ক্ষত, তাই সে কুতুযের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল, কিন্তু তার বেশিরভাগ সৈন্যই কুতুযের সাথে থাকতে চাইল। এই ঘটনার পর সে তাতারদের হাতেই নিহত হয়। এভাবেই আল্লাহ তাআলা এই লোকের হাত থেকে কুতুযকে মুক্ত করলেন, আর শুধু তাই না বরং কুতুয তার সৈন্যদেরকেও পেয়ে গেলেন তাঁর পেছনে।

কিছু নামধারী মুসলিম সেসময় ভেবেছিল সম্মান এবং ক্ষমতা বুঝি ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাত করেই আসবে। যখনই তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে সম্মান খুঁজত, তাদের কপালে জুটত অপমান ও লাঞ্ছনা। শত্রুরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এই শাসকদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করত আর কাজ শেষ হলে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলত। এই শাসকদের কলংকজনক ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, শত্রুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সহায়তায় তারা যা করেছে, তা এই যুগের গাদ্দাফি, হুসনি মুবারকদের তুলনায় কিছুই নয়। আর দেখুন আজকে তাদের কী অবস্থা হয়েছে!

এদিকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনার জন্য কুতুযের অনেক অর্থের প্রয়োজন ছিল। এই কাজ সমাধার জন্য কুতুয বেছে নিলেন একজন নেককার আলেম এবং সত্যের মূর্ত প্রতীক আল-ইয ইবনু আব্দুস সালামকে। আল-ইয ইবনু আব্দুস সালাম কুতুযকে প্রয়োজনীয় ফাতওয়া আর উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। প্রয়োজনের সময় এই গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া উম্মাহকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রশ্ন আসতে পারে লোকজন কেন আল-ইয ইবনু আব্দুস সালামের কথা মেনে নিয়েছিল? কারণ উনার ছিল ক্রুসেডারদের সাথে আঁতাত করা উম্মাহর মুনাফিক শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলার এক সাহসী অতীত। তিনি উম্মাহর এই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে নিয়মিত কথা

বলতেন। যদি আজ তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আজকের পরাজিত মানসিকতার মুরজিয়ারা, যারা শাসকদের পূজা এবং দাসত্ব করে বেড়ায়, তারা তাঁকে খারেজি, তাকফিরী, উগ্রপন্থী বলে ট্যাগ দিত। সেসময় সকল উলামার মধ্যে কুতুয শুধু আল-ইয ইবনু আব্দুস-সালামের কাছেই গেলেন, কারণ হকপন্থী আমীর ঠিকই হকপন্থী আলিমদের চিনতে পারেন।

কুতুয আল-ইয ইবনু আব্দুস সালামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের কী করা উচিৎ? আমরা কি নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাতারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি আরো অপেক্ষা করব?" প্রায় অর্ধশত বছর ধরে কেউ তাতারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। কুতুযের প্রশ্নের জবাবে দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ হৃদয় নিয়ে আল-ইয ইবনু আব্দুস সালাম বলেছিলেন, "যুদ্ধ করো, আমি তোমাদের বিজয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।" তিনি এতটুকুই শুধু বলেছিলেন। এই কথার মাধ্যমে তিনি তাঁদেরকে আল্লাহর উপর বিশ্বাসে অবিচল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। সেই সময়ে আরো অনেক উলামাই সেখানে ছিল কিন্তু আল-ইয ইবনু আব্দুস সালাম ছিলেন সবার কেন্দ্রবিন্দু। তখন দরকার ছিল এমন পুরুষের যারা সত্য বলতে জানে, সত্য বলতে পারে। কুতুয বললেন, "আমাদের তো যথেষ্ট টাকাপয়সা নেই।"এ কথা শুনে আল-ইয বললেন, "যখন শত্রুরা মুসলিমদের জায়গা দখল করতে চেষ্টা করবে তখন মুসলিমদের জন্য বায়তুল মালের সকল সম্পদ ব্যবহার করা জায়েয।"এরপর সকল সম্পদ সৈন্যদল গঠন করতে ব্যয় করা হলো। বলা চলে সবকিছু শুন্য থেকে শুরু করা হলো।

বায়তুল মাল অর্থাৎ মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ ফুরিয়ে গেলে মুসলিম শাসক চাইলে সচ্ছল জনসাধারণের উপর প্রয়োজন মাফিক কিছুটা কর আরোপ করতে পারেন। সেই সমাবেশে বেশ কিছু নেতা ছিলেন, যারা ছিলেন অনেক ধন-সম্পদের মালিক। তাদের উদ্দেশ্যে আল-ইয বললেন, "জনসাধারণের উপর ট্যাক্স ধার্য করার আগে শাসকরা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ, যা তাদের প্রয়োজন নেই, সেগুলো দান করে দেবে, তারপর জনগণ থেকে কর সংগ্রহ করা হবে।" উপস্থিত নেতারা এই প্রস্তাবে রাজি হন, তাঁরা একে একে তাঁদের সমস্ত সম্পদ এমনকি তাঁদের স্ত্রীদের গয়নাগাটিও এনে হাজির করেন এবং উপস্থিত সকলের কাছে শপথ করে বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি কিছুই ফেলে আসিনি।"

তাদের দেওয়া সম্পদ যখন যথেষ্ট হলো না, তখন মিশরের প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর এক দিনার করে ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল।

তারপর সাইফুদ্দীন কুতুয শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য অল্প সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর একটি দল প্রেরণ করলেন। তাঁরা শত্রুপক্ষের একটা ছোট্ট দলকে দেখলেন যারা মুসলিমদের গতিবিধি লক্ষ করতে এসেছে, ফলে সেখানেই যুদ্ধ বেঁধে যায়। তারই রেশ ধরে উভয় পক্ষ পুরোদমে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। দিনটি ছিল হিজরি ৬৫৮ সালের রামাদান। প্রায় দুই লক্ষ শত্রুবাহিনীর বিপরীতে মুসলিম সৈন্য ছিল মাত্র

বিশ হাজার। সঠিক সংখ্যা নিয়ে যদিও মতভেদ আছে, কিন্তু মোটামুটি এটাই সঠিক মত। আল্লাহ হালাকু খানকে ব্যস্ত রেখেছিলেন তারই এক আত্মীয়ের সাথে এক যুদ্ধে, সেটা ছিল চীনের কাছাকাছি। তাই সে তার সবচেয়ে চৌকস রোমান জেনারেল কাতিবঘাকে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করে।

কেউ কেউ বলে, সেই সময়ে তাতারদের শক্তি ও ক্ষমতা ছিল কিছুটা অবনতির দিকে, আর হালাকু খান যাকে জেনারেল হিসেবে পাঠিয়েছিল সে অতটা দক্ষ লোক ছিল না—এ কারণেই মুসলিমরা তাতারদের হারাতে সক্ষম হয়েছিল। যারা এই ধরণের ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, তারা বোঝে না বিজয়ের ফয়সালা আসমানে হয়—জমিনে নয়। বিজয় যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, এই বিশ্বাসে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বিশ্বাস করতে চায় না মুমিনরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হয়। মুসলিমরা যদি সঠিক উপায়ে বিজয় তালাশ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দান করবেন। তাতার জেনারেলের অদক্ষতার যে গল্প তারা ফেঁদেছে, তার সত্যতা যাচাই করতে ঐ জেনারেল সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করলেই যথেষ্ট। সে ছিল তৎকালীন সেরা চৌকস জেনারেলদের একজন। যোদ্ধা হিসেবেও তার সুখ্যাতি ছিল। কারো মতে তার বয়স তখন ষাট বা সত্তর। জেনারেল কাতিবঘা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল স্বয়ং চেঙ্গিস খানের কাছ থেকে, চেঙ্গিস খানের সুনিপুণ রণকৌশল সম্পর্কে কে না জানে! চেঙ্গিস খান এ ঘটনার চৌত্রিশ বছর আগেই মারা গেছে। যা প্রমাণ করে জেনারেল কাতিবঘার অন্তত ত্রিশ বছরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল। সে ছিল একাধারে একজন অধিনায়ক, একজন অগ্রদূত, একজন সুকৌশলী যোদ্ধা এবং জেনারেল। তাকে আটকাবার সাধ্য কার—মানুষ এমনটাই বিশ্বাস করত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"তোমরা যদি আল্লাহকে (তাঁর পথে) সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।" (সূরাহ মুহাম্মাদ: আয়াত ৭)**

রামাদানের ২৫ তম দিনে, আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, তলোয়ারের ঝনঝনানি চারদিকে প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে। আল্লাহর সাথীদের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। যুদ্ধরত সৈন্যরা এবং আশেপাশের উপত্যকায় বসবাসরত মানুষ যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, সবাই 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে সরব হয়ে ওঠে। মুসলিম সৈন্যরা তাতারদের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে, তাতারদের একের পর এক লাশ পড়তে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে ওঠে আর শত্রুদের জন্য ময়দান যেন জাহান্নামের মতো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শুরুতে এটা ছিল মুসলিমদের জন্য আশ্চর্যজনক বিজয়, কিন্তু এক পর্যায়ে মুসলিমরা একটু পিছিয়ে পড়ে। মুসলিমদের এই অবস্থা দেখে সেনাপ্রধান কুতুয তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, নিজের হেলমেট খুলে ফেললেন আর বলে উঠলেন, 'ওয়া ইসলামাহ! ওয়া ইসলামাহ! ওয়া ইসলামাহ!'

ইসলাম তখন বিপন্ন! কুতুয থামলেন না, এগিয়ে গেলেন শত্রুবাহিনীর দিকে। নিজেদের নেতাকে হেলমেটবিহীন অবস্থায় শত্রুসেনাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে মুসলিম বাহিনী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের নেতাকে অনুসরণ করা শুরু করল। সম্মিলিত আঘাতের এক ঝড় হাওয়া বইতে শুরু করল। তাতারদের জেনারেল নিহত হল, শত্রুপক্ষের সমগ্র সৈন্যবাহিনী তছনছ হয়ে গেল, এবং মুসলিমরা তাদের পিছু ধাওয়া করল। কেউ কেউ মারা পড়ল আর অনেককেই গ্রেফতার করা হলো। মুসলিমদের এই অত্যাশ্চর্যজনক বিজয় তাতারদেরকে তাদের মৃত্যুকূপে পৌঁছে দেয়।

এই যুদ্ধের পর অপেক্ষাকৃত ছোট একটা যুদ্ধ হয়েছিল বিসান নামক জায়গায়, সেখানেও মুসলিমরা বীর বিক্রমে মরণপণ লড়াই করেন এবং বিজয় লাভ করেন।

আইনে জালুত ইতিহাসের বৃহত্তম ও তাৎপর্যমন্ডিত যুদ্ধ এবং ঐতিহাসিক বিজয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। কেন? কারণ মুসলিমরা যদি ঐ সময়ে মঙ্গোলদের বিস্তারকে প্রতিরোধ না করত, তাতাররা মিশর দখল করে ফেলত, আর মিশরই ছিল সে সময়ের ইসলামের শেষ দূর্গ। আফগানিস্তান, ইরাক, শাম—সবই মুসলিমরা হারিয়েছে। কুতুয যদি সেই সময়ে আইন জালুতে তাঁর সাহস আর পরাক্রম নিয়ে তাদের গতি রোধ না করতেন, তাতাররা মিশরের মুসলিমদের উপরও গণহত্যা চালাত। তারপর তারা আফ্রিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য অংশে অগ্রসর হতো, এটাই ছিলো ওদের পরিকল্পনা। প্রায় অর্ধশত বছর পর্যন্ত মুসলিমরা তাদের সাথে কোনো একটা যুদ্ধেও জয়ী হতে পারেনি, বরং বলতে গেলে তেমন কেউই তাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে মুসলিমরা কীভাবে মিশরে বিজয় লাভ করল? আমরা চাইলে দার্শনিকদের মতো ডানে বামে ঘুরিয়ে অনেক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি। ইতিহাস বিশারদ হবার ভান করে এই বিজয় নিয়ে অনেক তত্ত্বকথার ফুলঝুরি ফোটাতে পারি। কিন্তু এই বিজয়ের পেছনের গোপন রহস্য হলো সেটাই, যা বহু বছর পূর্বে উমার (ﷺ) তাঁর জেনারেল সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (ﷺ)-কে লেখে জানিয়েছিলেন। সেটাই প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ। আর কোনো কারণ নেই।

যে কোনো দৃষ্টিকোণ এবং বিচারে থেকে মুসলিমদের পরাজিতই হবার কথা। তাদের সৈন্যবাহিনী প্রশিক্ষিত ছিল না, সংখ্যায় ছিল শক্তিশালী শত্রুসৈন্যের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। শত্রুদের কেবল সংখ্যাধিক্যই ছিল না, বরং তারা ছিল এমন এক অভিজ্ঞ বাহিনী যারা অর্ধ শতাব্দী ধরে গণহত্যা আর যুদ্ধ-বিগ্রহে ছিল সিদ্ধহস্ত। অনেক জাতিকে তারা পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন করে দিয়েছিল।

যা-ই হোক, এখন কথা হলো, উমার (ﷺ)-এর প্রেরিত সেই চিঠিতে কী লেখা ছিল? বিজয়ের রহস্য কী? উমার তাঁর জেনারেলকে বলেছিলেন,

"আমি আপনাকে এবং সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি..."

হ্যাঁ, এটাই! এটাই সেই গোপন রহস্য। তাকওয়া হচ্ছে শত্রুর বিপক্ষে মুমিনের সবচেয়ে বড় সামরিক প্রস্তুতি। তিনি তাদের বলেছিলেন, *"তোমরা তোমাদের শত্রুর ব্যাপারে যতটা শঙ্কিত থাকো তার চেয়ে বেশি ভয় করো তোমাদের গুনাহসমূহকে। আল্লাহর নাফরমানিতে তারা যে পাপে লিপ্ত হয়, তার বদৌলতেই মুসলিমরা বিজয় লাভ করে। কিন্তু যদি আমরাও তাদের মতো পাপে নিমজ্জিত হই, আল্লাহকে ভয় না করি, তাহলে তারা আমাদের উপর জয়ী হয়।"* কারণ তখন বিষয়টা হয়ে যায় কাফিরদের শক্তিমত্তা বনাম মুসলিমদের শক্তিমত্তা, কাফিরদের শক্তিমত্তা বনাম মুসলিমদের ঈমান নয়। শক্তি দিয়ে আমরা কখনোই তাদের সাথে পেরে উঠব না, কারণ লোকবল আর উপায়-উপকরণে তারা সবসময়ই আমাদের চেয়ে শক্তিশালী, তাই আমাদের বিজয় শুধু তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমেই আসবে—অন্য কিছু নয়।

আইন জালুতের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান-মান, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আমূল পরিবর্তন চলে আসে। এর মাধ্যমে কুতুয উম্মাহর হারানো গৌরব এবং উম্মাহর পুরুষদের সাহসিকতা ও পৌরুষ ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাতাররা এসে শয়ে শয়ে মুসলিম হত্যা করছে আর সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে, প্রতিরোধের কথা ভাবতে পারছে না—এরকমটা আর হয়নি। এ যুদ্ধে বিজয়ে মুসলিমদের মনে আল্লাহর প্রতি তাদের আশা ভরসা পুনরুজ্জীবিত করে, কারণ তিনি তাদেরকে বাস্তবে তাঁর সাহায্য দেখিয়েছেন। শত্রুপক্ষ যত বড় আর শক্তিশালীই হোক না কেন, কেউ আল্লাহর পক্ষে থাকলে বিজয় তার সুনিশ্চিত।

> **"জমীনে কাফিরদের অবাধ গতিবিধি তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে। এটা কয়েকদিনের সম্ভোগ মাত্র! তারপর তাদের চূড়ান্ত আবাসস্থল তো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল!" (সূরাহ আলে ইমরান: আয়াত ১৯৬ ১৯৭)**

মুসলিমরা উপলব্ধি করতে পারল যে আল্লাহ তাদের সাথে থাকলে তারা জয়ী হবেই। তারা বুঝল, ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় অলস বসে থাকার কোনো মানে নেই। যেমনটা এখনো অনেকে বিশ্বাস করে—তখনও করত।

যখন আল্লাহ কারো জন্য বিজয় ও কল্যাণ চান, আসমান ও জমীনের কোনো শক্তি নেই তাকে সেই বিজয় ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

> **"যদি আল্লাহ কারো ক্ষতি সাধন করেন, তবে তিনি ছাড়া সে ক্ষতি দূর করার আর কেউই নেই। আর যদি তিনি কারো কল্যাণ করেন, (তাহলে সেটাও তিনি করতে পারেন, কেননা) তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ও কর্তৃত্বশীল।" (সূরাহ আনআম: আয়াত ১৭)**

> **"আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া কেউ তা মোচন করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের কোন কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ অপসারণের ক্ষমতাও কারো নেই; তিনি স্বীয় অনুগ্রহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে**

যাকে চান, তাকে দান করেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।" (সূরাহ ইউনুস: আয়াত ১০৭)

এই যুদ্ধের আগে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে মুসলিমদের সাথে পশুর চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছিল। তাদের উপর চলছিল নৃশংস নির্যাতন, গণহত্যা আর ধর্ষণ। উম্মাহ যেন রাস্তায় পড়ে থাকা ছড়ানো ছিটানো খাবার—প্রত্যেকটা কুকুর সেই খাবারের ভাগ চায়। মুসলিম দেশগুলোতে ছিল শত্রুদের অবাধ বিচরণ। কিন্তু আইন জালুতের পর পাশার দান উল্টে গেল। এই অসাধারণ বিজয়ের সাথে ফিরে এলো উম্মাহর হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা আর শান-শওকত। শোষণ নিষ্পেষণের সেই জমিনে অমুসলিমদের জন্যও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো। এ বিজয় এত অবাধ, দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত ছিল যে, হালাকু খানের সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ করার সাহস পায়নি। অথচ কয়দিন আগেও এদের হিংস্রতা পশুত্বকেও হার মানিয়েছে। কিন্তু আইন জালুতের পর হালাকুর পক্ষ থেকে অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে ছোট ছোট বাহিনী পাঠানো হতো কেবল—শুধুমাত্র নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্য। পাল্টা হামলা চালানোর সাহস তারা দেখায়নি।

আজকে তাদের কী পরিণতি হয়েছে দেখুন। যারা আমর ইবনুল আস (ﷺ)-এর জয় করা দেশে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দেশে, যা ইসলাম দিয়ে শাসিত হয়েছিল—সেই দেশে তারা বলেছিল, তারা আল্লাহর শাসন চায় না—তারা গণতন্ত্র চায়। তারা বলেছিল, আল্লাহর আইন দিয়ে মিশর শাসিত হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত জনগণের ভোটের মাধ্যমে ঠিক করা হবে! অথচ আল্লাহর শাসন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শাসন। এটা ইসলামের মূলনীতি—আল্লাহর শরীয়াহ মানুষের ভোটের মুখাপেক্ষী নয়। তারা বলতো, না, ধীরে ধীরে আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা বলতো, পশ্চিমা এবং সেক্যুলারদের বিরাগভাজন হয়ে আল্লাহর শরীয়াহ কায়েম করা ঠিক হবে না। তারা চেয়েছিল আল্লাহ ছাড়া অন্যদের খুশি করতে। এর ফল কী হয়েছে? এর বিনিময়ে তাদের কপালে জুটেছে অপমান, লাঞ্ছনা আর পরাজয়।

ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যাদের তারা খুশি রাখতে চেয়েছিল, যাদের সন্তুষ্টির জন্যে তারা আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেনি, তারাই এখন সংখ্যায় কোটি কোটি। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এই মুসলিমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেনি, তাই আল্লাহ এবং আল্লাহর অনুসারীরা আজ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এই উম্মাহকে তাওহীদের অ-আ-ক-খ শিখতে হবে। আমরা যা আমাদের সন্তানদের বইপত্রে শিখাই, আগে আমাদের নিজেদেরকে তা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তার দায়িত্ব নিয়ে নেন, তাকে রক্ষা করেন, তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের

সন্তুষ্টি কিনে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে পরিত্যাগ করেন, তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন।"

মিশরের এই মুসলিমরা যাদের ভয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থেকেছিল, এবার তারাই তাদের রক্ষা করুক! আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে ধারণ করবে, তাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। এই কথাটিই বলা হয়েছিল দশ বছরের কিশোর ইবনু আব্বাস (ﷺ)-কে—যদি সমগ্র দুনিয়ায়ও তোমার বিরুদ্ধে চলে যায়, তবুও তারা তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না।

আইন জালুত মুসলিমদের মাঝে শান্তি এবং মর্যাদা ফিরিয়ে আনল, ফিরিয়ে আনল প্রায় একশ ছেচল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য। মুসলিমদের উপর আর অপমান, নির্যাতন, নৃশংসতার সুযোগ রইল না। এরপর তাতাররা এই একশ ছেচল্লিশ বছর তেমন বাড়াবাড়ি করার সাহস দেখায়নি। এরপর এলো তাতারদের এক নতুন নেতা– তৈমুর লং। সে দখল করল হালাব এবং দামাস্কাস। ততদিনে মানুষ আবার আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। তখন তাতাররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আবার জয়ী হলো—আইন জালুত যুদ্ধের একশ ছেচল্লিশ বছর পর।

আইন জালুতের পর সিরিয়া এবং মিসর ঐক্যবদ্ধ হলো, মুসলিম জাতির জন্যে একটা বর্ম তৈরি হলো। কৌশলগত, রাজনৈতিক, ভৌগলিক, শিক্ষাগত, এবং ঐতিহাসিক—সকল বিবেচনায় এই ঐক্য ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উম্মাহর একাত্মতা প্রকাশ পেল। আল্লাহ বলেছেন,

> **"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।" (সূরাহ আনফাল: আয়াত ৪৬)**

তোমাদের নিজেদের মধ্যকার বিবাদ তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। আইন জালুতের পর অযোগ্য নেতাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। মহান নেতা সালাহউদ্দীনের নাতিরাও ছিল তাদের মধ্যে। তাদের চিন্তাজুড়ে সর্বদা থাকত মসনদ আর ক্ষমতা।

এই বিজয়ের পর সেইসব নেতাদের প্রকৃত চেহারা মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ কুতুযের নেতৃত্ব মেনে নিল। বেশিরভাগ অযোগ্য নেতাই হারিয়ে গেল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

এই বিজয়ের আরো এক সুফল হলো যে, দামাস্কাস এবং মিসরের ঐক্যের পর মুসলিমরা সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনের ছোট ছোট লোকালয় বা ইমারাতগুলোর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এই এলাকাগুলোয় ক্রুসেডারদের রাজত্ব ছিল প্রায় একশো ষাট বছর ধরে। সেখানে সাধারণ মুসলিমদের উপর চলছিল অত্যাচার। এসব এলাকায় নূরুদ্দীন, ইমাদুদ্দীনন এবং সালাহউদ্দীন পদার্পণ করেননি। সালাহউদ্দীনের যারা রক্তসম্পর্কে বংশধর, তারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও যারা সালাহউদ্দীনের

আদর্শিক বংশধর—তারা ঈমান এবং প্রত্যয়ের সাথে অগ্রসর হন এবং এই ইমারাতগুলোতে মুসলিমদের শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

এই বিজয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল তাতারদের উপর। তারা ইসলামকে চিনতে আর জানতে লাগল। তারা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা এবং গবেষণা করতে শুরু করল। ফলস্বরূপ তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। যখন ক্ষমতা তাদের নিজেদের হাতে ছিল, তখনও তারা মুসলিমদের দেখেছিল। এখন যখন মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা, তারা দেখল মুসলিমদের উপর তারা যে নির্যাতন, অত্যাচার, ধর্ষণ চালিয়েছিল—মুসলিমরা তার প্রতিশোধে কিছুই করছে না। এমনকি তাতারদের নজরবন্দীও করে রাখেনি, যেমনটা তারা শত্রুদের ক্ষেত্রে করত। তারা বিস্মিত হচ্ছিল মুসলিমদের ব্যবহার এবং ক্ষমাশীলতায়। তাদের অনুমান ছিল মুসলিমরাও তাদের মতো নির্যাতন এবং ধর্ষণ চালাবে। কিন্তু ইসলাম তা বলে না। ইসলামের ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং রীতি-নীতি দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। তাতারদের ধর্ম ছিল মানুষের বানানো, চেঙ্গিস খান এই ধর্মের প্রবর্তক। ইসলাম তাতারদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক শুন্যতা পূরণ করতে শুরু করে। মূলত এই বিজয়েরও ছয় বছর আগে হালাকু খানের এক চাচাতো ভাই ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাতারদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। হালাকু এতে বিস্মিত হয়, সে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

যা-ই হোক, সবশেষে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি যেন তিনি এই উম্মাহর কষ্ট লাঘব করে দেন। তিনি যেন আমাদের প্রিয় নেতা সাইফুদ্দীন কুতুয (রহ.)-এর মতো নেতা দিয়ে প্রতারকদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেন।

ইযযাহ: সম্মান কেবল ইসলামে

রামাদান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো, যেখানে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। রামাদান নামের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে জরুরি শিক্ষাটি হলো ইবাদাত এবং আধ্যাত্মিকতা। তবে এটা ছাড়াও রামাদান থেকে শেখার আরও অনেক কিছু আছে, যেমন- বাচ্চাদের কীভাবে বড় করতে হবে, ধৈর্য ধরা, মুসলিম ভাইবোনের জন্য দান-সাদাকা করা, উম্মাহর কথা ভাবা, নিজেকে উম্মাহর একজন মনে করা, লজ্জা-বিনয়, আল্লাহর ভয়, তাওবা, আন্তরিকতা ইত্যাদি।

ইসলাম হলো মর্যাদার ধর্ম, মাথা উঁচু করে চলার ধর্ম—অধ্যবসায় আর কঠোর পরিশ্রমের ধর্ম। আর রামাদান মাস হলো মহিমা ও গৌরবের মাস, এই মাস আপনাকে বিভিন্নভাবে মর্যাদার কথা শেখায়। একজন ব্যক্তি যে সাওম পালন করছে, সে বিভিন্ন দিক দিয়ে সম্মান অর্জন করছে। কেউ কেউ হয়তো বলবে, "আরে, আপনি কী বলছেন, রামাদানের সাথে ইযযাহ বা সম্মানের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?" ব্যাপারটা আসলে এরকম— যখন একজন খাবার, পানি, এবং নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করা থেকে বিরত থাকে, আর হারাম কাজগুলো ছেড়ে দেয়, তখন সে নিজেকে দুনিয়ার জাগতিক বিষয়গুলোর অনেক ওপরে নিয়ে যায়। নীচ ও জঘন্য কাজগুলো ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে এবং নানা রকম অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করার মাধ্যমে সে নিজেকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যায়। এসব করার মধ্য দিয়ে সে সমাজের ভ্রান্ত আচার-প্রথা, বদ অভ্যাস এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলে। এটাই হলো নিজের ইযযাহ। মানুষ যখন তার নিজের নফস বা প্রবৃত্তির ওপর বিজয়ী হতে পারে, তখনই সে নিজের জন্য চূড়ান্ত সম্মান হাসিল করল। কারণ তখন আর কোনো কিছুই তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে না। আল্লাহ বাদে আর কোনো কিছুর সামনেই তাকে মাথা নত করতে হবে না।

যখন কেউ বিতর্কিত বিষয় থেকে, অন্যদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ থেকে ও রাগ করা থেকে, এবং অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে, তখন সে নিজের জন্য আরও একটি বিশেষ পর্যায়ের সম্মান অর্জন করে।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সাওম রাখে, তার উচিত নয় খারাপ ভাষা ব্যবহার করা কিংবা গলার স্বর উঁচু করা।" এভাবে অন্যের সাথে আপনি কী আচরণ করবেন, সেটার উপর ভিত্তি করেও আপনার সম্মান বৃদ্ধি করা হয়।

রামাদানের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন মুমিন বান্দা ইযযাহ হাসিল করে ইবাদাতের মাধ্যমে, হারাম কাজগুলো ত্যাগ করার মাধ্যমে। এটাই হলো বান্দার ইযযাহ অর্জন করার গোপন সূত্র। আপনার ঈমান যত বাড়বে, আপনি ততই আর-রাহমানের কাছাকাছি হবেন—সেটাই হল ইযযাহ।

রামাদান মাসে মুমিনরা যখন দান-সাদাকা করে, তখন তাদের ইযযাহ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র বান্দারা ইযযাহ অর্জন করতে পারে আল্লাহ্‌র পথে দান করার মাধ্যমে। প্রশ্ন আসতে পারে, দান করার সাথে ইযযাহর কী সম্পর্ক? যখন আপনি কিছু দান করছেন, তা গরিব ও অসহায়দেরকে মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে দেয়। মানুষের কাছে ছোট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আপনার দান তাদেরকে মানুষের কাছে চেয়ে চেয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, মানুষের কাছে নিচু হওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে ইযযাহ সহকারে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। মানুষের কাছে চেয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনো ইযযাহ নেই। ইসলাম চায় জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে আপনি সম্মান আর মর্যাদার সাথে থাকুন। তাই ইসলাম বলে, যে হাত দিয়ে মানুষ দান নেয়, তার চেয়ে বরং যে হাত দিয়ে মানুষ দান করে—সেই হাত বেশি উত্তম। এরকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। দানকারী তার দানের মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা আর সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়। অবশ্য দান করার ক্ষেত্রে কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা না ভেবে শুধুমাত্র মানুষের কাছে সম্মান বা ভালোবাসা পাওয়াকেই তার লক্ষ্য বানিয়ে নেয়, তখন এ দান বান্দার আর কোনো কাজেই লাগে না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বলেছিলেন–“যদি তুমি কিছু চাও, তো আল্লাহর কাছে চাও। যদি তোমার সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।”

কেন? কারণ এটাই হল ইযযাহ।

সহিহ আল বুখারিতে আছে, যুবাইর ইবনু আওয়াম (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার চাইতে বরং এটা বেশি ভালো যে একজন একটা দড়ি নিয়ে কাঠ কাটতে যাবে, আর কাঠ কেটে সেগুলো নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে আসবে।” যা-ই করুন না কেন, অন্যের কাছে সাহায্য চাইবেন না। এটাই হল ইযযাহ। সহিহ মুসলিমে আছে, কিছু লোক আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে বায়াত বা আনুগত্যের শপথ করতে এলো। তারা তাঁকে ইসলাম পালন করা, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মেনে চলা, এবং রাসূলের আনুগত্য করার বাইয়াত দিল। এরপর রাসূল (ﷺ) তাদেরকে বললেন, “মানুষের কাছ থেকে কিছু চাইবে না।”

কেন আল্লাহর রাসূল এটা বললেন? যেন এই মুসলিম উম্মাহ ইযযাত সহকারে চলতে শেখে, মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখে।

এক লোক ছিল, সে সবসময় মন্ত্রী-মিনিস্টারদের কাছে যেত, আর এটা-সেটা চাইত। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ তাকে বলেছিলেন, "আরে হতভাগা! যে লোক তোমার মুখের উপর মানা করে দিচ্ছে, তোমার সাথে এমন জঘন্য আচরণ করছে, নিজের সম্পদ থেকে তোমাকে কানাকড়িও দিচ্ছে না, তার কাছেই তুমি বারবার ফিরে যাচ্ছ! আর যে মহান রব দিনে-রাতে সবসময় তোমার জন্য তাঁর দয়ার দরজা খুলেই রেখেছেন, যিনি তোমাকে প্রতিনিয়ত তাঁর সম্পদ থেকে দিয়ে যাচ্ছেন, যিনি বলেছেন, তোমার কিছু দরকার হলে তাঁর কাছে চাও, অথচ তুমি তাঁর কাছে কিছু চাইছো না!"

তাউস একবার আতাকে বলেছিলেন, "যে তোমার মুখের ওপর তোমাকে মানা করে দেয়, যার কাছে সাহায্য চাইতে হলে আগে অন্য কোনো মাধ্যম হয়ে যেতে হয়—তার কাছে কক্ষনো কিছু চাইবে না। তার কাছে যাও, যার দরজা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত সবসময় খোলা থাকে। যিনি তোমাকে আদেশ করেছেন তাঁর কাছে চাইতে, এবং যিনি ওয়াদা করেছেন যে, তোমাকে কখনোই ফিরিয়ে দেবেন না।"

আবু হাযিম ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম। তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কী আছে আপনার সম্পদ হিসেবে? কত টাকা আছে আপনার?" তিনি বলেছিলেন, "আমার আল্লাহর উপর ভরসা আছে, এটাই আমার সম্পদ। মানুষের কাছে আমার কিচ্ছু চাওয়ার নেই।" তার সময়কার নেতা তাঁকে চিঠি লেখে বললেন, "আপনার যত টাকা-পয়সা লাগে, আমাকে লিখবেন, আমি আপনার কাছে টাকা পাঠিয়ে দেব।" তিনি উত্তরে বলেছিলেন "আমি একজনের কাছেই চাই, যিনি আমাকে সবকিছু দিয়েছেন। তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, আমি সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট, আর যা কিছু আমাকে দেননি, সে ব্যাপারেও আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার কাছ থেকে আমার কোনো কিছুর দরকার নেই।"

এই মাস হলো ইযযাহর মাস, মাথা উঁচু করে চলতে শেখার মাস। আসুন, আমরা এই ইযযাহকে অনুভব করার চেষ্টা করি, কীসে ইযযাহ আছে বোঝার চেষ্টা করি, এবং ইযযাহ অর্জনের চেষ্টা করি। আসুন আমরা নিজেরা মাথা উঁচু করে ইযযাতের সাথে চলতে শিখি, আর উম্মাহর মাঝেও এই ইযযাহর বোধকে পুনরুজ্জীবিত করি। শুধু নিজের ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, বরং উম্মাহর মধ্যেও মর্যাদা থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে সম্মানিত করেছেন। রামাদান মাসেই আল্লাহ এই উম্মাহকে ইযযাহ দিয়েছিলেন—বদরের যুদ্ধে। এটা ছিল ইযযাহর যুদ্ধ। রামাদানের মাস হলো এমন এক মাস, যে মাসে সব বিজয়ের সবচেয়ে বড় বিজয় এসেছিল, মক্কা বিজয় হয়েছিল এই রামাদান মাসেই।

"নিশ্চয়ই, (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। (সূরাহ আল ফাতহ: আয়াত ১)

রামাদান মাসে মুসলিমরা বদরে বিজয় লাভ করে। হিজরি পঞ্চম বছরের এই রামাদান মাসেই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খন্দক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। স্পেনের বিজয়, তাতারদের পরাজয় সহ আরো অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা রামাদান মাসে ঘটেছে, যা এই উম্মাহর জন্য ইযযাহ বয়ে এনেছে।

এই সম্মান আর মর্যাদার কথা কুরআনে অনেকবার এসেছে।

> **"কেউ সম্মান, ক্ষমতা, গৌরব চাইলে জেনে রাখুক সমস্ত সম্মান, ক্ষমতা, গৌরব আল্লাহরই জন্য। (এবং কেউ শুধুমাত্র আল্লাহকে সম্মান এবং ইবাদাতের মাধ্যমেই সম্মান পেতে পারে।) (সূরাহ ফাতির: আয়াত ১০)**

উমার (রা.) যখন বায়তুল মাকদিসের চাবি আনার জন্য যান, তিনি তাঁর একজন চাকরকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে জেরুজালেমের পথে রওনা দেন। উমার (রা.)-এর খিলাফতের সময়কালে ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান এমন কেউ ছিল না যাদের উপর কোনো জুলুম হয়েছে। মুসলিম তো দূরের কথা, কোনো ইহুদি, খ্রিষ্টান এমনকি একটা পশুর উপর পর্যন্ত কোনো জুলুম করা হয়নি। উমার (রা.)-এর সেই সময়টা যে কী অসাধারণ একটা সময় ছিল, সেটা এই বিংশ শতাব্দীর মানুষজন চিন্তাও করতে পারে না। উমার (রা.) ভেড়াদের জন্য পর্যন্ত পথ তৈরি করে দিতেন যেন তারা হোঁচট না খায়। সেই উমার (রা.) মদিনা থেকে জেরুজালেমের পথে উটে চড়ে যাচ্ছিলেন, সাথে ছিল তাঁর চাকর। উমর (রা.) আর তাঁর চাকর পালা করে উটের পিঠে চড়ছিলেন। একবার উমর চড়েন, একবার তার চাকর উটের পিঠে চড়ে, আর একবার দুজনের কেউই উটে চড়ে না—যেন উটটা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম পায়।

হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য—এমনকি একটা উটও বিশ্রাম নিত। এভাবে প্রত্যেকে সমান ইনসাফ পায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের উমার (রা.)-এর মতো শাসক দান করুন।

আবু উবাইদা (রা.) জেরুজালেমের বাইরে বের হয়ে খলিফার সাথে দেখা করতে এলেন। যখন উমার (রা.) জেরুজালেমে এসে পৌঁছালেন, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। ইবনু কাসির (রহ.) ঘটনাটির খুব খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন। চোখ বন্ধ করে একবার দৃশ্যটা কল্পনা করে দেখুন! উমার (রা.) একটা উটের লাগাম টেনে আনছেন, উটের পিঠে তাঁর চাকর বসা, বৃষ্টিতে চারিদিক কর্দমাক্ত হয়ে আছে। উমার (রা.) তাঁর জুতোজোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছেন। প্রখর সূর্যের তাপ উমার (রা.)-এর টাক মাথায় এসে পড়ছে। উমার (রা.) -এর মাথায় বা পায়ে কিছুই ছিল না, তাঁর পোশাকের একপাশ ছিল পুরোই ছেঁড়া এবং অন্যপাশটাও অনেক জোড়াতালি দেওয়া।

আবু উবাইদা (রা.) তাঁর খলিফার দিকে এগিয়ে গেলেন। উমারকে এক পাশে নিয়ে বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, আপনি রোমান সর্দারদের (বিশপ এবং পুরোহিতদের) সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। তারা আপনার কাছে আজ চাবি সমর্পণ করবে!"

অর্থাৎ তিনি বোঝালেন, আজ তো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, আপনার জামাটা পাল্টে নিলে কেমন হয়? উমার (ﷺ) আক্ষেপ প্রকাশ করে বললেন, "আপনি ছাড়া যদি অন্য কেউ আমাকে এ কথা বলত, আমি তাকে নবীজি (ﷺ)-এর উম্মতের জন্য দৃষ্টান্ত করে রাখতাম।" আসলে উমার (ﷺ) বলছিলেন যে, আবু উবাইদা! আপনি তো যেনতেন কেউ নন, আপনি মুসলিমদের ভূমি কত বেশি সম্প্রসারিত করেছেন, আপনি এই উম্মাহর একজন অন্যতম সেরা সেনাপতি! আর আপনি কিনা এ কথা বলছেন! আপনি বাদে অন্য কেউ যদি আজ এ কথা মুখ দিয়ে বের করত, তাহলে আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম যেন এখান থেকে উম্মাহর অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে। তারপরই উমার (ﷺ) তাঁর সেই কালজয়ী উক্তিটি করলেন। উমার (ﷺ) বললেন,

> "আমরা সেই জাতি, যাদের আল্লাহ ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। যদি আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সম্মান খুঁজি, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই আমাদেরকে অপমানিত করবেন।"

এই ঘটনার এই উক্তি এবং শেষ অংশটুকু ইবনু মুবারক তাঁর আয-যুহদ গ্রন্থে, ইবনু আবি শায়বাহ, হান্নাদ, আল হাকিমের আল-মুসতাদারক গ্রন্থে, আবু নুয়াইমের আল-হূলায়াহ্ এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার চতুর্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে। তবে কিছু বর্ণনায় ঘটনার প্রথম অংশের বিবরণে কিছু পার্থক্য আছে।

উমার (ﷺ) উম্মাহর ব্যাপারে একেবারে সহজ একটি সমাধান দিয়ে গেছেন। কীভাবে ইযযাহ অর্জিত হবে, তার একটা সূত্র শিখিয়ে দিয়েছেন। জামা বদলে নেওয়ার মতো ছোট্ট একটা উপদেশও উমারকে হতাশ করে তুলেছিল। কারণ ব্যাপারটা তাঁর কাছে এমন যে, তিনি ইসলাম ব্যতিত অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজছেন, আর এরকম একটা কথা বলার জন্য তিনি উম্মাহর অন্যতম সেরা একজন সেনাপতিকে শাস্তি দিতে চাচ্ছিলেন!

এক শাইখ বলেন, তাঁর বাবা তাঁকে উমার (ﷺ)-এর এই ঘটনাটা মুখস্থ করান, যখন তার বয়স পাঁচ বছরেরও কম ছিল। আপনার সন্তানদেরকে এ ধরণের ঘটনাগুলো শেখান, যেন তাদের অন্তরে ইযযাহর বোধটা গেঁথে যায়। যেন তারা ইসলাম নিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে শেখে।

উমার (ﷺ) যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে আজকের আলিমদের না জানি কী শাস্তি দিতেন! এইসব আলিমরা তো নতুন জামাকাপড় দিয়ে না, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার মাঝে সম্মান খুঁজে বেড়াচ্ছে, শত্রুদের কাছে সম্মান খুঁজে ফিরছে।

"কেউ সম্মান, ক্ষমতা, গৌরব চাইলে জেনে রাখুক সমস্ত সম্মান, ক্ষমতা, গৌরব আল্লাহরই জন্য।" (সূরাহ ফাতির: আয়াত ১০)

আপনি যদি সম্মান, ক্ষমতা এবং গৌরব চান, তাহলে জেনে রাখুন—এটা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আসবে। সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। ইসলামের শিক্ষা, ইসলামের আদেশ-নিষেধগুলো নিয়ে আপনি গর্বিত হোন, এর মানে আপনি অহংকারী তা না! ইসলামের শিক্ষা নিয়ে বা কোনো নিয়ম-কানুন নিয়ে কখনও লজ্জিত হবেন না। মানুষ আপনাকে নিয়ে হাসুক, সমালোচনা করুক, আপনাকে নিয়ে যা খুশি বলুক। আপনি পাত্তা দেবেন না। এটাই হল ইযযাহ।

আল-মাহদী নামের এক বিখ্যাত আলিমের ঘটনা। একদিন তিনি মসজিদে বসে আছেন, এমন সময়ে মসজিদে খলিফার আগমন ঘটল। মসজিদের সবাই দৌড়ে খলিফার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু আল-মাহদী বসে বসে আগে যা করছিলেন সেটাই করতে থাকলেন। অন্যরা তাঁকে বলল, "তুমি কি উঠে গিয়ে খলিফার সাথে দেখা করবে না?" তিনি খলিফার সামনেই বললেন, "মানুষ শুধু বিশ্বজগতের রবের সামনে দাঁড়ায়।"

এমন কিন্তু না যে মানুষ তাঁকে সালাম দিচ্ছিল, বা তাঁর সাথে কোলাকুলি করতে যাচ্ছিল। মানুষ শুধু তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর তোষামোদ করার জন্য তাঁর আশেপাশে গিয়ে জড়ো হচ্ছিল।

আলিমের কথা শুনে খলিফার গার্ড তাকে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু খলিফা বললেন, "থামো, উনার গায়ে হাত লাগাবে না।" ওয়াল্লাহি, তার কথাটা শুনে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। এই শাইখের ইযযাহর বোধ ছিল, আর খলিফার ছিল আল্লাহর ভয়। যারা ক্ষমতা, টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে নেতাদের তোষামোদ করে, ক্ষমতাবানদের পা চাটে, তারা এভাবে করে নিজেদেরকেই নিচে নামিয়ে ফেলে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটার অভাব সেটা হলো—ইযযাহর বোধ!

মালিক ইবনু আনাস ছিলেন তাঁর সময়ের একজন ইমাম এবং হারুন আর-রশিদ ছিলেন তখনকার নেতা। হারুন আর-রশিদ মালিক ইবনু আনাসকে ডেকে বললেন, "আপনি আমাকে আর আমার বাচ্চাদেরকে পড়ান।"

আজ মালিকের মতো কোনো ইমামও নেই এবং হারুন আর-রশিদের মতো কোনো নেতাও নেই। যেকোনো আলিমই এই সুযোগের স্বপ্ন দেখত, একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন, হারুন আর-রশিদ জ্ঞানার্জন এবং কবিতার পিছে কত বেশি অর্থ ব্যয় করতেন!

যা হোক, ইমাম মালিককে হারুন আর-রশিদ পড়ানোর প্রস্তাব দিলে তিনি জবাব দিলেন, "তোমাকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে, জ্ঞান তোমার কাছে হেঁটে আসবে না।"

হারুন আর-রশিদ যখন ইমাম মালিকের বাড়িতে গেলেন, ইমাম মালিকের ঘরে ঢুকে দেয়ালে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। ইমাম মালিক বললেন, "তোমার

গুরুজনকে সম্মান করো। আমি তোমার গুরু, আমাকে সম্মান করো আর সোজা হয়ে বসো।" হারুন আর-রশিদ তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারপর হারুন তাঁকে বললেন, "অন্যরা কত জ্ঞান নিয়ে এসেও আমাদের কাছে নত হয়েছিল, কিন্তু আমরা তাতে লাভবান হইনি। আমরা লাভবান হয়েছি আপনার জ্ঞানের কাছে বিনম্র হয়ে।"

দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইযযাহ বা মর্যাদা অর্জনের জায়গা আছে। এমনকি ইসলামি খিলাফতের ইতিহাসে জালিম নেতাদের মধ্যেও আমরা এই ইযযাহ বা মর্যাদাবোধ দেখতে পাই। ঘটনাটি হিজরি ২২৩ সালের। খলিফা মুতাসিম আমুরিয়াহ নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন, উদ্দেশ্য ছিল পারস্যের নেতা বাবিক আল-খারমিকে প্রতিরোধ করা। সে সময় ছিল আব্বাসি খিলাফত। আব্বাসি খিলাফত যখন খুরামিদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, সেই সুযোগে রোমানরা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা এক টুকরো মুসলিম ভূমি দখল করে নেয় এবং বৃদ্ধ ও শিশুসহ সবাইকে গণহারে হত্যা করে। তারা কারো উপর তিল পরিমাণ দয়া দেখায়নি। কয়েক হাজার মুসলিম নারীদের তারা দাসী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের চোখের সামনে তাদের সন্তানদের হত্যা করে। পুরুষদের বন্দী করে তাদের কান কেটে, চোখে লোহার রড ঢুকিয়ে, নাক কেটে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এমন সময় এক মুসলিম নারী চিৎকার করে বলে উঠে, 'ওয়া মুতাসিমাহ!'

সেই আর্তনাদ মুতাসিমের কাছে পৌঁছলে তিনি তৎক্ষণাৎ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সেই মুসলিম নারী যখন মুতাসিমাহ বলে ডাক দিয়েছিলেন তখন সেই ডাকে সাড়া দিতে মুতাসিম অনেক বছর লাগিয়ে দেননি। ইতিহাস বলছে, তিনি সাথে সাথে সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। বিছানা থেকে এক লাফে উঠে বলেন, সবাই প্রস্তুত হও! একজন ইতিহাসবিদের মতে, মুতাসিমের কাছে যিনি সাহায্য চেয়েছিলেন, তিনি ফাতিমা (রা.)-এর বংশধর, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের বংশধর। আল্লাহই ভালো জানেন। যখন তাঁকে নির্যাতন করা হচ্ছিল তখন কোনো এক রোমান রাজা উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে তাঁকে উপহাস করে বলল, "আরে! তুমি মনে করো তোমার খলিফা মুতাসিম ডালমাতিয়ান ঘোড়ায় চড়ে এসে তোমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাবে!"[৪১]

এই কথা শুনে খলিফা মুতাসিম তার সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন, "যত পারো ডালমাতিয়ান ঘোড়া যোগাড় করে আনো।" এর পরদিনই তারা চার হাজারের বেশি ডালমাতিয়ান ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো।

ঘোড়াগুলোকে তিনি রাখলেন তাঁর সৈন্যদলের সামনে। আমুরিয়ার কাছাকাছি এসে তিনি নির্দেশ দেন, "তোমরা কেউ ঐ মহিলার দিকে এগোবে না। আমি নিজে তাকে উদ্ধার করব।"

---

[৪১] ডালমাতিয়ান এক বিশেষ প্রজাতির ঘোড়া।

সেই মুসলিম নারীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। মুতাসিম তাকে বলেন, "তুমি সাক্ষ্য দেবে! তুমি তোমার দাদা আল্লাহর রাসূলের কাছে আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি চার হাজার ডালমাতিয়ান ঘোড়া নিয়ে এসেছি তোমাকে উদ্ধার করতে!"

এটাই হলো পৌরুষ! এটাই হলো ইযযাহ! যে রোমান সে মহিলাকে চড় মেরেছিল, তাকে মুতাসিম হত্যা করেন এবং পুরো আমুরিয়াহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

এবার মিলিয়ে দেখুন বর্তমানের পরিস্থিতি। কী অদ্ভুত তামাশা চলছে সিরিয়ার মুসলিমদের সাথে! সিরিয়া এক মহা দুর্যোগের সম্মুখীন, ইতিহাসে সবচাইতে বড় বিপর্যয়গুলোর একটি আমরা দেখছি সিরিয়ায়। দীর্ঘদিন ধরেই এই ভয়াবহ অবস্থা বিরাজমান। কিন্তু যখন হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট ওবামা যুদ্ধের ঘোষণা দিল এবং সিরীয়দের সাহায্য করার তথাকথিত উদ্যোগ গ্রহণের কথা ঘোষণা করল, তখন দেখা গেল মিশর এবং অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক শুয়ুখ এবং আলিমরা হাজির! সবাই তখন সিরিয়ার যুদ্ধ নিয়ে ভারি ভারি ডায়ালগ দিতে লাগল, অথচ ওবামা এই যুদ্ধে জড়ানোর আগে তোমরা কোথায় ছিলে? তোমরা কোথায় ছিলে যখন সিরিয়ার মুসলিমদের ভেড়ার মতো জবাই করা হচ্ছিল? আর এতদিন পরে এসে এরা হয়ে গেল সবার চোখে হিরো! মুসলিম উম্মাহর অবস্থা কতটা নিচে নেমেছে ভাবা যায়?

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দু'আ করি যেন আল্লাহ সিরিয়ার মুসলিমদের চোখ খুলে দেন, যেন তারা সত্যিকারের পরিস্থিতি বুঝতে পারে। তারা যেন বুঝতে পারে তাদের মর্যাদা আর গৌরব কোথায়। সিরিয়াতে এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর যাদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, কিন্তু ওবামার কাছ থেকে গ্রীণ সিগন্যাল পেয়ে তারা বড় বড় কথা বলা শুরু করল, এরা বীর হয় কী করে?

একজন সিরিয়ানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "ওবামা এবং এই শাইখদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তোমার মতামত কী?" সে বলেছিল, "এদের জন্য আমরা কখনো বসে ছিলাম না। এদের কাজকর্মের কোনো প্রভাবও আমরা দেখছি না। তারা অনেক বছর দেরি করে ফেলেছে।"

হক কথা বলার কারণে একজন মুসলিমের জীবন বিপন্ন হতে পারে, তাকে কারাগারে ছুঁড়ে ফেলা হতে পারে, কিন্তু এর মাঝেও ইযযাহ বা মর্যাদা আছে। ইসলামের জন্য এতটুকু কষ্ট করাই যায়। আল মুসতাদরাক আল হাকিমে বর্ণিত আছে, নবীজি (ﷺ) বলেছেন, "শহীদদের মাঝে সেরা হলেন হামযাহ (رضي الله عنه), এরপর সেই ব্যক্তি যে জালিম শাসকের সামনে দাঁড়ায়, তাকে ভালো কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর সেই জালিম শাসক তাকে হত্যা করে।"

আমাদের জন্য ইযযাহর শিক্ষা আছে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (رضي الله عنه)-এর দৃষ্টান্তে। তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি কি তোমার বাপ দাদা, পূর্বপুরুষের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ গ্রহণ করবে? যদি তুমি তা-ই করো, তোমার মত যদি তুমি না বদলাও, তাহলে জেনে

রাখো, আমি মরে যাব, কিন্তু খাবোও না, পানিও পান করব না, ছায়ার মধ্যেও বসব না। আমি মারা গেলে তুমি অনেক কষ্ট পেয়ে মরবে, কারণ আমার এই মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী থাকবে।"

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ছিলেন খুবই মাতৃভক্ত আর দায়িত্ববান সন্তান। প্রথমে তিনি মা'কে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল না হওয়ায় ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন, যা ছিল সম্মান আর মর্যাদার পথ। মা'কে বললেন, "মা, বসুন, আপনার সাথে কিছু কথা আছে। আপনি ভালো করেই জানেন আমি আপনাকে কতটা ভালোবাসি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা নিয়ে সবাই প্রশংসা করে। আপনি এটাও জানেন, আমি আপনার প্রতি কতটা দায়িত্ববান। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখেন, আপনার যদি একশো'টা রুহও থেকে থাকে, সেগুলো একটার পর একটা বের হতে থাকে আর এদের বাঁচানোর একমাত্র উপায় যদি হয়ে থাকে আমার দ্বীন ত্যাগ—তবুও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করব না। কাজেই, ঘরের ভেতরে আসুন এবং মুখে কিছু খাবার-পানি দিন।"

বর্তমানকালের মুসলিম পুরুষদের জন্য মর্যাদার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন একজন নারী। ইসলাম গ্রহণের আগে আবু সুফিয়ান একদিন মদীনায় যান, নবীজি (ﷺ)-এর সাথে কিছু ব্যাপারে আপোসরফা করতে। মদীনায় গিয়ে ঢুকলেন তাঁর মেয়ে উম্মে হাবিবার ঘরে। উম্মে হাবিবা ছিলেন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রী। ঘরে ঢুকে আবু সুফিয়ান যা দেখলেন, তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দেখলেন তাঁর মেয়ে তাঁকে দেখেই নবীজি (ﷺ)-এর চাদরটি দ্রুত গুটিয়ে নিচ্ছেন, যেন সেই চাদরে তিনি বসতে না পারেন। মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, "আমি কি এই চাদরের যোগ্য নই, নাকি এই চাদর আমার জন্য উপযুক্ত নয়?" তাঁকে অবাক করে দিয়ে মেয়ে জবাব দিলেন, "আপনি এই চাদরে বসার যোগ্য নন। আপনি একজন নাপাক মুশরিক।" হতভম্ব আবু সুফিয়ান মেয়েকে বললেন, "তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?" না, উম্মে হাবিবা মোটেও পাগল হননি, তিনি জেনেবুঝেই এই কাজ করেছেন। একজন মুসলিম হয়ে মুশরিককে সম্মান দেখাননি, যদিও আবু সুফিয়ান ছিলেন তাঁর পিতা। আর এটাই হলো ইসলামের ইযযাহ।

আজকে দেখবেন, পশ্চিমের দালাল আলিমরা মুসলিমদের মন থেকে মর্যাদা ও ইযযাহর বোধটুকু নষ্ট করে ফেলতে চায়। ফলে একদল মুসলিমের জন্ম হয়েছে যারা সর্বদা কাফিররা কী ভাবছে তা নিয়ে তটস্থ থাকে। না, ব্যাপারটা এমন হবে না। আপনি যখন সালাত আদায় করবেন, তখন মর্যাদার সাথেই করবেন—সংকোচ করা বা তটস্থ হবার কিছু নেই। দ্বীন ইসলাম নিয়ে হীনবল হবেন না, মিনমিন করবেন না। হিজাব করবেন, নিকাব পরবেন, দাড়ি রাখবেন দৃঢ়তার সাথে—আপনার মাঝে এসব নিয়ে দুর্বলতা থাকা চলবে না। আপনি ইসলাম শেখাবেন আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন না দিয়েই, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে। আমাদের দ্বীন, আমাদের মুসলিম পরিচয়ের মাঝে

গর্ববোধ করার জায়গা আছে এবং আমরা সেটা প্রদর্শন করব। আমরা যদি নিজের দ্বীন নিয়ে গর্ব না করি, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এমন কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন যে নিজের দ্বীন নিয়ে গর্ববোধ করতে জানে।

কেউ হয়তো বলতে পারে, মুসলিম উম্মাহর অবস্থা আগের মতো নেই, তারা দুর্বল। হ্যাঁ, সেটা সত্য, কিন্তু তবু আমরা নিজেদের দ্বীন নিয়ে গর্ববোধ করব। আমাদের বাহ্যিক অবস্থা যতই দুর্বল হোক, এই দ্বীন নিয়ে আমরা কখনোই লজ্জাবোধ করব না। আমরা বন্দী হতে পারি, অত্যাচারিত হতে পারি, কিন্তু তবু দ্বীন নিয়ে আমাদের মধ্যে ইযযাহ থাকবে।

বিলাল (ﷺ)-কে যখন অত্যাচার করা হয়েছিল, তখনও কি তিনি দৃঢ়তা দেখাননি? আত্মমর্যাদা দেখাননি? খুবাইব ইবনু আদি (ﷺ)-কে যখন শত্রুরা বন্দী করল, তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাইল, তিনি বলেছিলেন, "আমাকে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে দাও।" তিনি উঠে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন। সেই দুই রাকাত সালাতেও ইযযাহর ছাপ ছিল। তিনি বলেছিলেন, "শোনো, যদি না তোমরা আমাকে মৃত্যু ভয়ে ভীত হবার অপবাদ দিতে, আমি এই দুই রাকাত সালাত আরও দীর্ঘ করতাম।"

তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, তোমার কি ইচ্ছে হয় না যে আজকে তোমাদের জায়গায় মুহাম্মাদ থাকত, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সাথে নিরাপদে থাকতে?" তিনি বলেছিলেন, "না, আল্লাহর কসম, আমরা মরতে রাজি আছি, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের গায়ে মদীনার একটি কাঁটা বিঁধতে দিতেও রাজি নই। আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে থাকব, আর আল্লাহর রাসূলের গায়ে একটা টোকা লাগবে, তা হতে দেব না।"

এটাই ইযযাহ!

এরপর যখন তারা বৃষ্টির মতো তাঁর দিকে বর্শা এবং ধনুক ছুড়তে শুরু করল, তিনি বলে উঠলেন,

> "হে আল্লাহ! এই কষ্টের জন্য আমি কেবল তোমার কাছেই অভিযোগ করি, তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে- যা তারা আমার প্রতি করেছে।
>
> হে আল্লাহ! আরশের মালিক, তারা আমার সাথে যা করার পরিকল্পনা করে, তাতে আমাকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দাও। আমি সবার ব্যাপারে হতাশ হলেও তোমার ব্যাপারে কখনোই হতাশ হই না।
>
> সবকিছু তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তিনি চাইলে আমার টুকরো টুকরো করা শরীরকেও বরকতময় করে দিতে পারেন।

> হে আল্লাহ, তারা আমাকে বলেছিল হয় মৃত্যু নয়তো কুফরিকে বেছে নাও। আমি বরং মৃত্যুকে বেছে নিলাম।
>
> হে আল্লাহ! আমার এই চোখের অশ্রু তাদের ভয়ে নয়, এই অশ্রু বরং তোমার জন্য!
>
> আমি যদি মুসলিম হিসেবে মারা যাই, তাহলে আর কিছুতেই আমার কিছু যায় আসে না!
>
> হে আল্লাহ, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমি ভয় করি জাহান্নামকে!
>
> শত্রুদের সামনে আমি কখনো নতজানু হবো না, হবো কেবল আল্লাহর কাছে, যার কাছে আমি ফিরে যাব।"

এই কথাগুলো হলো ইযযাহর সর্বোচ্চ রূপ। ইযযাহ হলো দুর্বল অবস্থাতেও আপোস না করা, ছাড় না দেওয়া। যখন পুরো আরব উপদ্বীপ আবু বকর (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে চলে গেল, সেই কঠিন দুর্বল মুহূর্তেও তিনি অবিচল ছিলেন। তিনি ছিলেন একা, তিনি বলেছিলেন, "যদি তোমরা কেউ আমাকে সাহায্য না কর, তবে আমি একাই তাদের মোকাবেলা করতে যাব।"

ইবনু মাসউদ (ﷺ) কী করেছিলেন যখন তাঁর সময়টা আমাদের মতো ছিল? যখন মুসলিমরা ছিলো ভীত সন্ত্রস্ত। আল্লাহর রাসূলের জীবনে দুর্বলতম সময়ে, যখন সবাই প্রবল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, ইবনু মাসউদ বলেছিলেন, "আমি তাদেরকে চিৎকার করে কুরআনের আয়াত শোনাব!" এ কথা শুনে মুসলিমরা বলল, "এটা করা ঠিক হবে না, শত্রুরা আপনার ওপর চড়াও হবে।" জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন!"

কী তাঁকে এই দুঃসাহসী কাজ করতে প্রেরণা যুগিয়েছিল? এটা তো ওয়াজিব কোনো কাজ ছিল না। এটি হলো ইযযাহ! তাঁর ইযযাহর কারণে তিনি বের হয়ে গেলেন, চিৎকার করে তিলাওয়াত করলেন সূরাহ আর-রাহমানের আয়াত।

> **"করুণাময় আল্লাহ। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন!" (সূরাহ আর-রাহমান: আয়াত ১-২)**

সবাই বলাবলি করতে থাকল, "ইবনু উম্মে মাবাদের হয়েছে কী?" তিনি কাবার পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে তিলাওয়াত করছেন। লোকজন তাঁকে মারতে ছুটে গেল। তিনি আরো জোরে জোরে তিলাওয়াত করতে থাকলেন। লোকজন তাঁকে আরো মারল। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। অবশেষে সাহাবিরা এসে তাঁকে ডেকে তুললেন। তিনি উঠে বললেন, "আমাকে আবার সেখানে নিয়ে চলো।" কিন্তু সাহাবিরা তাঁকে জোর করে আটকে রাখলেন।

ইবনু মাসউদ কেন এই কাজটি করলেন? এটি কি কুরআনের কোনো আদেশ ছিল? সুন্নাহ বা ওয়াজিব ছিল? না! তিনি কাজটি করেছিলেন ইযযাহ প্রদর্শন করার জন্য।

খালিদ বিন ওয়ালিদ (ﷺ)-এর বাহিনী যখন রোমান সম্রাট হিরাকলের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে গেল, রোমানরা মুসলিম বাহিনীর ভাবভঙ্গি আর অগ্রগতি দেখে অভিভূত হয়ে যায়। হিরাকল তখন তার লোকদের জিজ্ঞাসা করল, "কী হচ্ছে এখানে? তারা কি আমাদের থেকে সংখ্যায় বেশি?" তারা জবাব দিল, "না।" হিরাকল জানতে চাইল, "তাহলে কি অস্ত্রশস্ত্র আর শক্তিমত্তায় তারা আমাদের চাইতে এগিয়ে আছে?" তারা বলল, "না।"

হিরাকল বুঝতেই পারছিল না মুসলিমরা কীভাবে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস দেখাচ্ছে! তখন এক বৃদ্ধ লোক এগিয়ে এসে বলল, "এই মুসলিমরা মদ পান করে না, কিন্তু আমরা করি। এরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না, আমরা হই। এরা হলো তারা যারা রাত জেগে ইবাদাত করে, আমরা সেটা করি না। ওরা দিনের বেলা সাওম রাখে, আমরা রাখি না।" সব শুনে হিরাকল বলল, "নিশ্চয়ই বিজয় তো এভাবেই আসে!"

ইযযাহ মানে মানুষকে ভয় দেখানো নয়, ইযযাহ হচ্ছে মর্যাদা আর প্রতিপত্তি, যা মানুষের মনে সমীহ জাগায়। এই ইযযাহ আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে হবে। ইংরেজি ১৮৭৬ সালের ঘটনা, তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ ছিলেন তখন ৩৪ বছরের টগবগে পুরুষ। কাফিররা তাঁকে প্রস্তাব দিল, ফিলিস্তিনের একটি ছোট অংশের বিনিময়ে সুলতানকে পছন্দমতো সোনা ও বিপুল সম্পদ দেওয়া হবে। সে সময় উসমানি খিলাফত বেশ চাপের মুখে ছিল। বলকান অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ চলছে, সব মিলিয়ে বেশ কঠিন পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতিতে তাঁকে এরকম একটি লোভনীয় অফার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবদাতা ডক্টর হারযেলকে তিনি বলেছিলেন,

> "বৃথা চেষ্টা করো না, লাভ হবে না। ফিলিস্তিনের এক বিঘত জমিনও আমি তোমাদের হাতে ছাড়ব না। এই জমিনের মালিক আমি নই, এর মালিক হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ! উম্মাহ নিজের রক্ত দিয়ে এই ভূমি আবাদ করেছে। তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখো। যদি এই খিলাফত না থাকে, তুমি তখন বিনামূল্যেই হয়তো ফিলিস্তিন পেয়ে যাবে। কিন্তু জেনে রাখো, এই আমি যতদিন
>
> বেঁচে আছি, আমার শরীর তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেও মুসলিমদের এক টুকরো ভূমি আমি কাউকে দেব না!"

এটাই হলো একজন মুসলিমের আত্মমর্যাদা, মাথা উঁচু করে চলা, হার না মানার মানসিকতা। এটাকেই আমরা বলছি ইযযাহ।

আল্লাহ্ বলেন,

"ইযযাহ্ তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।" (সূরাহ্ মুনাফিকুন: আয়াত ৮)

দ্বীন ইসলামকে নিয়ে গর্ববোধ করুন। তবে হারাম কাজ করবেন না। আপনার ওপর দ্বীন ইসলামের যে আদেশ, তা পালন করুন এবং সেটা নিয়ে গর্ব্বোধ করুন। সুন্নাহ পালন করুন এবং সেটা নিয়ে গর্ব করুন। কেউ ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হীনমন্যতায় ভোগার কিছু নেই, গর্বের সাথে জবাব দিন। সালাতের সময় হলে যেখানে যে অবস্থাতেই আছেন, উঠে দাঁড়ান। কে কী ভাবছে, কে কী মনে করছে সেসবের তোয়াক্কা না করে একজন মর্যাদামান মানুষের মতো উঠে দাঁড়ান এবং সালাত কায়েম করুন। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে জানুন, যাতে কেউ যদি ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কটাক্ষ করার চেষ্টা করে, তাকে উচিত জবাব দিতে পারেন। ইসলামি শরীয়াহ আইন যা আল্লাহ তাআলা আমাদের দিয়েছেন, সেটা নিয়ে গর্ব করা উচিত। যারা এই আইন নিয়ে প্রশ্ন তোলে, উল্টো তাদেরকেই বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উচিত তাদের আইন কতটা ব্যর্থ হয়েছে মানবতার সমাধান দিতে। দেখিয়ে দাও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আইন হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার আইন, মানবজাতির জন্য একমাত্র সমাধান। এই শরীয়াহ নিয়ে গর্ব করুন!

জিহ্বার সংযম

সাওমের ক্ষেত্রে পেট বা গোপনাঙ্গকে আকাঙ্ক্ষামুক্ত রাখতে তো হবেই, সাথে অন্য কিছু বিধিনিষেধও মেনে চলতে হয়—যেমন জিহ্বা অর্থাৎ জবানকে সংযত রাখা। রামাদান নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি কোর্স হলো মিথ্যা থেকে বিরত থাকা। জুলুম, গীবত ও কুৎসা রটানো থেকে দূরে থাকা।

নবী করীম (ﷺ) একটি হাদিসে বলেছেন, "শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণ বা পান করা থেকে বিরত থাকার নাম সাওম নয়, বরং সাওম হলো ফালতু এবং অর্থহীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।"

এগুলো কিন্তু সাওম পালনের অন্তর্ভুক্ত। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, "কেউ যদি আপনাকে সাওম পালন অবস্থায় অভিশাপ দেয়, নির্বোধের মতো আচরণ করে, তখন আপনি বলবেন, 'আমি সাওম রেখেছি'।"

হাদিসে বাক্যটি দু'বার এসেছে। অর্থাৎ সে যেন বলে, 'আমি সাওম রেখেছি, আমি সাওম রেখেছি।'

অনেকে এই কথাটির আগে আল্লাহুম্মা যোগ করে এই কথাটিকে দু'আ বানিয়ে ফেলে, কিন্তু আসলে এটি দু'আ নয়। হাদিসে যা আছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উত্তম, অর্থাৎ এতটুকু বলাই যথেষ্ট—ইন্নী স্ব-ইমুন অর্থাৎ আমি সাওম রেখেছি।

এ সম্পর্কে সহিহ বুখারির আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে, "যারা তাদের কথা ও কাজে মিথ্যাচারিতা পরিত্যাগ করে না, সেই লোকের পানাহার থেকে বিরত থাকা আল্লাহ গ্রহণ করেন না।"

সুনানে আন-নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও আল হাকিমে এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস আছে, সেখানে নবীজি (ﷺ) বলেছেন, "এই ধরণের সাওম পালনকারীর প্রাপ্তি কেবল ক্ষুধা।"

ইবনু মাজাহর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া তারা আর কিছুই লাভ করে না।"

অর্থাৎ এমন কিছু লোক আছে যারা সাওম রাখে ঠিকই, কিন্তু নিজের জবান সংযত করে না। সাওম পালন করেও এদের প্রাপ্তির খাতা শুন্য, তারা কেবল ক্ষুধা আর

পিপাসাই লাভ করে। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদিস শুনে কেউ হয়তো বলে ফেলতে পারে, "ঠিক আছে, যদি কাউকে অভিশাপ দেওয়া, কুৎসা রটানো আর মিথ্যা বলার কারণে আমার সাওম নষ্ট হয়েই যায়, তাহলে খেতে আর পান করতে ক্ষতি কী? সেটাও করি।" কেউ কেউ আসলেই এরকম উদ্ভটভাবে চিন্তা করে এবং তারা আর সাওম পালন করে না।

কিন্তু এই হাদিসগুলো আপনার মন মতো বুঝলে হবে না। হাদিসগুলোকে সেভাবে বুঝতে হবে, যেভাবে বোঝা উচিত। আলিমরা এই হাদিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। সত্যি বলতে, এই ধরণের হাদিসের ব্যাখ্যায় হাম্বলী, শাফি'ঈ এবং অন্য সবগুলো মাযহাবের অবস্থান মোটামুটিভাবে এক, তবে ব্যতিক্রম হলো যাহিরীরা। যাহিরীরা এই হাদিসগুলোর অতিমাত্রায় বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে এবং খুব আক্ষরিকভাবে হাদিসগুলোর অর্থ নেয়। অন্য মাযহাবগুলোর মতে, এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে, সাওম পালন করেও যদি কেউ গীবত করে বা মিথ্যা বলে, তাহলে সাওম পালনের আজর অর্থাৎ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু সাওম ভঙ্গ হবে না। আর খারাপ কাজের জন্য গুনাহ তো সে লাভ করবেই, সাথে সাওম পালনের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। ইমাম আহমাদ বলেন, "যদি আড্ডাবাজি আর গীবতের কারণে সাওম ভেঙে যেত, তাহলে আমাদের কারোই সাওম হতো না।"

বাজে কথা বলা, মিথ্যা বলা, কুৎসা রটানো এবং পরনিন্দা করা যদি পুরো বছর জুড়েই নিষিদ্ধ হয়, তাহলে শুধু রামাদানে কেন এই কাজগুলো না করার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়? এর কারণ হলো, রামাদান মাসে আপনি যে ইবাদাত করছেন, সেই ইবাদাত এবং ইবাদাতের উদ্দেশ্যের সাথে এই কাজগুলো পরিপন্থী। পুরো রামাদানে আপনি ভালো কাজ করছেন এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পাশাপাশি এমন কিছুও করে বসছেন যা আপনার সাওম পালনের উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে। রামাদানে আপনার ভালো কাজগুলোর পুরস্কার যেমন কয়েকগুণ, তেমনি গুনাহের জন্য শাস্তিও কয়েকগুণ। সাধারণ কোনো দিনে যদি আপনি নিজের জবান সংযত না রাখেন, তাহলে তো গুনাহ হবেই। কিন্তু রামাদানে এই গুনাহ হবে আরো বেশি, কারণ পবিত্র মাসে আপনি গুনাহগুলো করছেন। শুধু তা-ই নয়, রামাদানে কিয়াম, সালাত ও ইবাদাতের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম আপনি করছেন, সেগুলোও ভেস্তে যাবে এই গুনাহের কারণে। এই কারণে রামাদানে জিহ্বাকে সংযত করার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যারা বলেন, "আমি তো মিথ্যা বলে সাওম নষ্ট করেছি, পুরস্কার লাভের আশা নেই, তাহলে খেতে আর পান করতে সমস্যা কী?" তাদের উদ্দেশ্যে জবাব হলো, আপনি জবান সংযত না করে একে তো গুনাহ করেছেন, সাওমের ইবাদাতের পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন, আর এখন যদি সাওমটাই ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে সাওম ভাঙার গুনাহটাও সাথে যুক্ত হবে। আর এই গুনাহ খুবই ভয়াবহ!

এই ধরণের হাদিস থেকে আমাদের শিক্ষা হলো, নিজের জবান সংযত না করা হলে আমাদের কর্ম ও পরিশ্রম দুটোই বিফলে যাবে। রামাদান হলো একটা ক্যাম্পিং এর মতো, এই ক্যাম্পিং থেকে আমরা ট্রেইনিং গ্রহণ করব যেন বছরের বাকি দিনগুলোতেও এইসব গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকতে পারি।

কিছু সালাফ বলতেন, "সাওম পালনে সবচেয়ে সহজ কাজ হলো না খেয়ে থাকা।" আসলেই এটা সত্য। সাওম পালনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো এই ইবাদতটি সারাদিন ধরে করা হয়, সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আপনি এর মধ্যে ঘুমিয়ে থাকলেও পুরস্কার পাবেন। কিন্তু যখনই আপনি মিথ্যা বলবেন, গীবত করবেন, আপনার এই পুরস্কারপ্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যাবে। জাবির বলেছেন, "যখন তুমি সাওম পালন করবে, তোমার কানও যেন সাওম রাখে, তোমার জিহ্বা যেন গীবত থেকে সাওম পালন করে, তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে সাওম রাখে।" কাজেই শুধু পেট নয়, সবকিছুকেই খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার নামই হলো সাওম।

ফালতু বা অর্থহীন কথা বলতে অনেক কিছুকেই বোঝায়। মিথ্যাচার, গীবত, অপবাদ দেওয়া, মানহানি, অভিশাপ দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মুসলিমদের দোষারোপ করা, এমনকি চিৎকার-চেঁচামেচি করাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রামাদানে এসবের কোনোটিই করা উচিত নয়। জিহ্বা এক টুকরো ছোট মাংস মাত্র, কিন্তু অনেক বেশি বিপদ ডেকে আনতে পারে দেহের এই ছোট্ট অঙ্গটি। এজন্যই রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যেসব গুরুতর বিষয় মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের কারণ, তার একটি হলো জিহ্বা। এই জিহ্বা সবকিছু নষ্ট করে দিতে পারে, সবকিছুকে বরবাদ করে দিতে পারে। আপনার উচ্চারিত একটি কথা আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করতে পারে এবং আপনাকে অনন্তকালের জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। অপরদিকে এই জিহ্বা এমন এক অস্ত্র, যার সঠিক ব্যবহার আপনাকে সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তও করে দিতে পারে।

উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, "একবার আমি আবু বকর আস-সিদ্দীক (رضي الله عنه)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি জিহ্বা ধরে রেখেছেন আর বলছেন, 'এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংস করেছে।'" ভেবে দেখুন, আবু বকর হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর জবান দিয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে সমর্থন যুগিয়েছেন, আর তিনি বলছেন এই কথা! আবু বকর হলেন সেই ব্যক্তি, যাকে জান্নাতের আটটি দরজার প্রত্যেকটি দিয়ে ডাকা হবে। আবু বকর হলেন সেই সাহাবি, যাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ওফাতের দিন সকালে সালাতের ইমামতি করতে দেখে হেসেছিলেন। নবী রাসূলদের পরে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তবু তিনি জিহ্বার ব্যাপারে কতটা সাবধানী।

গীবত কিংবা মিথ্যা অপবাদ কেবল আপনার মুখের জবানের মাধ্যমেই হয়, তা কিন্তু নয়। আপনার চোখের সামান্য ইশারা অথবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও এগুলো হতে পারে।

টুইটার, ফেইসবুক কিংবা ইন্টারনেট ফোরামে এই বিষয়গুলো অনেক বাজে রূপ ধারণ করে। অনেকে মনে করতে পারে, স্ক্রিনের এপারে আমাকে তো কেউ দেখছে না, কেউ তো জানছে না আমি কে। অথচ আল্লাহ বলেছেন,

"সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখছেন (সে যা করে)?" (সূরাহ আলাক: আয়াত১৪)

যারা এমনটা ভাবে, তারা কি জানে না কুরআনে কী আছে? তারা কি জানে না আল্লাহ সব দেখছেন?

"সেদিন তোমাদেরকে প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, তোমার কোনো কিছুই আর গোপন থাকবে না।" (সূরাহ আল-হাক্কাহ: আয়াত ১৮)

সেদিন আপনার কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। এখন হয়তো আপনি নিজেকে গোপন রাখতে পারছেন, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আপনার সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাবে।

"তাদের কার্যক্রমের হিসাব রাখা হবে এবং সে সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরাহ আয-যুখরুফ: আয়াত ১৯)

জবানের মাধ্যমে হোক কিংবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, অথবা টুইটারে হোক বা ফেইসবুকে হোক—এগুলোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। গীবত গীবতই, মিথ্যাচার মিথ্যাচারই, সেটা যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক। এগুলোর সবকিছুর জন্যই আপনাকে হিসাব দিতে হবে।

আমাদের হৃদয়ে সচেতনতা এবং আল্লাহর ভয় তৈরি করার জন্যই রামাদানের আগমন। তাই প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে হিসাব করে দেখুন আপনার সেই দিনটিতে জিহ্বা দ্বারা কী কী নিষিদ্ধ কাজ আপনি করেছেন। যদি মিথ্যা বলে থাকেন, কাউকে উপহাস, অপবাদ, অভিশাপ দিয়ে থাকেন অথবা গীবত করে থাকেন, তাহলে আপনার প্রতিটি ভুলের জন্য আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী দশ, বিশ, পঞ্চাশ বা একশো টাকা আলাদা করে রাখুন। এক সপ্তাহ পর অথবা রামাদানের শেষে, ইনশাআল্লাহ আপনি লক্ষ করবেন যে আপনার জবানে লাগাম দিতে সক্ষম হচ্ছেন। যদি আপনি এটা রামাদানের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে বাকি জীবনেও আল্লাহর ইচ্ছায় চালিয়ে যেতে পারবেন। নিজের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

আপনি একেবারে নিষ্পাপ ফেরেশতায় পরিণত হয়ে যাবেন—এটা আশা করা ঠিক না। ভুল হবেই, তবে যখনই ভুল হবে, সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবেন এবং সরল পথে চলতে শুরু করবেন। রামাদান আমাদের আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন করে তোলে, মনে আল্লাহর ভয় ও ভক্তি সৃষ্টি করে—এটাই হলো তাকওয়া।

তাকওয়া হলো একটি শক্তিশালী ঈমানি প্রতিরোধ ক্ষমতা, যা আপনাকে নিজের জবানের বেলায় আল্লাহকে ভয় করতে শেখাবে।

কল্পনা করুন সেই ব্যক্তির কথা, যে জানে যে তার বস তার অফিসে গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছে, অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি কারো গাড়ি, বাসা এবং ফোনের সব কথোপকথন রেকর্ড করে রাখে—এমন নজরদারিতে থাকা ব্যক্তি অবশ্যই তার বলা প্রতিটি কথার ব্যাপারে সচেতন থাকবে। সে সবসময় সতর্ক থাকবে, কারণ তার বস অথবা সিকিউরিটির লোক তাকে লক্ষ করছে। কুরআনে বলা হয়েছে আমাদের ডানে ও বামে দুই ফেরেশতার কথা,

> **"যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা-ই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" (সূরাহ ক্বাফ: আয়াত ১৭, ১৮)**

এ কথা বলবেন না, "আমি আসলে নিজের মনের কথা চেপে রাখতে চাইনি, গোপন রাখতে চাইনি, তাই মনে যা আছে তা প্রকাশ করে দিয়েছি।" না, এই যুক্তিটি ঠিক নয়। তার ব্যাপারে যদি আপনার মনে কোনো কষ্ট বা খারাপ ধারণা থেকেও থাকে, সেটা নিজের ভেতরে রাখাই উত্তম। একটি কথার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবার চাইতে নিজের মধ্যে বিষয়টি চেপে রাখাই আপনার জন্য কল্যাণকর। মুসলিমদের চিন্তাভাবনা এমন হবে না, বরং ইসলাম যেভাবে শিখিয়েছে, সেভাবেই একজন মুসলিম পরিচালিত হবে—আর এটাই হওয়া উচিত।

ইবনু মাসউদ (ﷺ) বলেছেন, "যদি দীর্ঘ কারাবাসে কাউকে যেতে হয়, সেটা হলো নিজের জবান।" হ্যাঁ, আপনার জবানকে কারাবন্দী করে রাখতে হবে। হুদাইবিয়া চুক্তির সময়ে উমার (ﷺ) এমন কিছু কথা বলে ফেলেছিলেন, যেগুলো বলা তাঁর ঠিক হয়নি। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলছিলেন সন্ধি চুক্তি না করে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ সেই সময়ে নবীজি (ﷺ)-কে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। যদিও উমার (ﷺ)-এর নিয়ত মোটেই খারাপ ছিল না, তিনি চাচ্ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পারেন যে, সেসময় জবানকে সংযত করা উচিত ছিল। তিনি এতটাই অনুতপ্ত ছিলেন যে, অনেক বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বলতেন, "সেই দিনের ঘটনার পর অনুশোচনা থেকে আমি অনেক নেক আমল করেছি এবং এখনও আল্লাহর কাছে সেই দিনের বলা কথাগুলোর জন্য ক্ষমা চাই।"

আপনার মুখের জবান হয়ে উঠতে পারে আপনার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারক। আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য যেন জাহান্নাম না হয়, সে জন্যে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার দুই চোয়াল এবং দুই পায়ের মাঝে যা আছে তা হেফাযতের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।" বৈবাহিক সমস্যা, পরিবারে ভাইয়ে-ভাইয়ে সমস্যা, সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, খুনোখুনি এবং আরো অনেক ধরনের সমস্যার পেছনে জিহ্বা অন্যতম একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

আপনার যদি মনে হয়ে থাকে আপনার ঈমান দুর্বল, তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকে নিজের জবান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। দুর্বল ঈমানকে মজবুত ঈমানে পরিণত করার এটি একটি উত্তম পন্থা।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের আদেশ করেছেন যেন আমরা শুধুমাত্র ভালো কথা বলি অথবা নীরব থাকি। মুখের কথাকে নিছক হালাল বা হারামের মানদণ্ডে বিচার করা যাবে না। বরং শুধু কল্যাণকর আর উপকারী কথাই আমরা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করব। আর যেটার মাঝে কল্যাণ নেই, আবার ক্ষতিও নেই— সেটা থেকেও বিরত থাকব, আর অকল্যাণকর কথা থেকে তো বিরত থাকতেই হবে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জিহ্বার ক্ষতিকারক দিককে সম্বোধন করেছেন 'মুবিকাত' বলে। 'মুবিকাত' অর্থ বিনাশকারী- যা অবধারিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। খারাপ কথাকে আল্লাহর রাসূল অন্যান্য মুবিকাত যেমন-সুদের ব্যবসা, জাদুটোনা, হত্যা এবং নারীর মর্যাদাহানি ইত্যাদি অন্যায় কাজের একই ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতেই বোঝা যায় বিষয়টি কতটা গুরুতর।

শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে আল বায়হাকি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) দীর্ঘদিন পর যখন পবিত্র কাবার সামনে উপস্থিত হলেন, তিনি কাবার দিকে তাকালেন, কাবাকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি কতই না সম্মানিত! কিন্তু তোমার সম্মানের চেয়ে একজন মুমিনের সম্মান ও পবিত্রতা বহু গুণ বেশি।" তারপর তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা একজন মুমিনের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ অপর মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।"

যাদের মুখের জবান ঠিক নেই, যারা অনায়াসে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাদের এই হাদিসটি বোঝার চেষ্টা করা উচিত। ভেবে দেখুন, আমাদের মাঝে কেউ কি এমন আছে যে কাবাকে অভিশাপ দেবে? না, বরং সকলেই কাবাকে পবিত্র ঘর হিসেবে সম্মান দেখায়, কাবাকে অভিশাপ দেওয়ার কথা একজন মুসলিম ভাবতেও পারে না। কেউ কি আছে যে একটি হাতুড়ি নিয়ে কাবায় যাবে এবং সেটাকে গুড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে অথবা পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলবে? না! কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে পারি না তা হলো, কাবার সম্পর্কে কোনো খারাপ মন্তব্য করা বা কাবাকে অভিশাপ দেওয়ার চাইতে একজন মুমিন ভাইকে অসম্মান করে কথা বলাটা আরো বড় গুনাহের কাজ। কাবার একটি একটি করে পাথর খুলে ফেলা একজন মুমিনকে হত্যা করার চাইতে লঘু অপরাধ। তাই একজন মুসলিমের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার বিষয়টা আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে অনেক বিশাল কিছু।

আপনি যখন বিচার দিবসে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবেন, তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কেন আপনি আপনার অমুক ভাই সম্পর্কে কটুকথা বলেছিলেন? আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে, অমুক বোন সম্পর্কে কেন আপনি বাজে মন্তব্য করেছিলেন? দ্বীনদার সেই মানুষটিকে নিয়ে কেন খারাপ মন্তব্য করেছিলেন? আপনার

যে ভাইটি কারারুদ্ধ রয়েছেন, উম্মাহকে প্রতিরক্ষা করার জন্য যারা লড়াই করছে, তাদের ব্যাপারে আপনি কেন অশোভন কথা বলেছিলেন? আপনি হয়তো বলবেন, "হে আল্লাহ, আমি গুগলে তাদের ব্যাপারে এরকম জেনেছি, তাই বলেছি, তাদের ব্যাপারে মন্তব্য করেছি।" আল্লাহর শপথ! এই ধরণের উত্তরের আদৌ কোনো গ্রহণযোগ্যতা কি কিয়ামাতের দিন থাকবে? মানব রচিত আইনে চালিত কোনো জালিমের আদালতেও এমন অসার উত্তর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তাহলে আপনি আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত, আল-হাকাম, আল-আদলের সামনে কীভাবে এমন অজুহাত পেশ করবেন? "অমুক ফোরামে দেখেছি" বা "টুইটারে পেয়েছি"—এসব উত্তরের কোনো যৌক্তিকতাই সেদিন থাকবে না।

আল ফুদাইল ইবনু ইয়াদ বলেছেন, "আমি আমার কিছু বন্ধুকে জানি, যাঁরা এক শুক্রবার থেকে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত নীরব থাকতেন।" এর মানে হলো, এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত তাঁরা কুরআন, যিকির ও ইবাদাতের কথা ছাড়া আর কিছুই বলতেন না। তাঁরা তাঁদের জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। আবু নুয়াইম ও ইবনু আবিদ দুনিয়ার সূত্রে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (ﷺ) তাঁর জিহ্বার সাথে কথা বলতেন, জিহ্বাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—"ভালো কথা বলো, তাহলে তুমি সফল হবে আর অন্যথায় তোমাকে পরিতাপ করতে হবে।" ইবনু আব্বাস (ﷺ) তাঁর জিহ্বাকে সতর্ক করার মাধ্যমে নিজেকে মনে করিয়ে দিতেন যে, জিহ্বার চাইতে বিপজ্জনক আর কোনো অঙ্গ নেই। তিনি বলেছিলেন, তাঁকে জানানো হয়েছে যে, *বিচার দিবসে মানুষের নিজের জিহ্বার চেয়ে বড় শত্রু আর কেউ থাকবে না।*

একজন মুসলিম হিসেবে আপনার আদর্শ হওয়া উচিত সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আনাস ইবনু মালিক (ﷺ) বলেন, তিনি দশ বছর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমত করেন। এই দীর্ঘ সময়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উদ্দেশ্যে একবারের জন্যও 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। একজন মানুষ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালোভাবে জানা যায় তার সাথে বসবাস করলে এবং সবসময় একসাথে চলাফেরা করলে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিষয়ে আনাস ইবনু মালিক (ﷺ) এমনও বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে যে কাজ করতে আদেশ দিতেন, কখনও কখনও সবগুলো করতেন না। তারপরও রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একবারের জন্যও তাঁর প্রতি 'উফ' বলে বিরক্তভাব প্রকাশ করেননি, তাঁর উপরে চিৎকার করেননি বা তাঁকে অভিশাপ দেননি।

কোনো কথা বলার আগে ভালো করে ভাবুন। হাসান আল বাসরি (ﷺ) বলেন, "যে তার জবানকে সংযত করতে ব্যর্থ হলো, সে তার দ্বীনকে জানতে ব্যর্থ হলো।"

মনে রাখবেন, আপনার কথা আপনার কাছে বন্দী, বলার আগ পর্যন্ত সেগুলোর উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। একবার মুখ খুললে সেই নিয়ন্ত্রণ আপনি হারাবেন, এরপর আপনি নিজেই আপনার কথার কাছে বন্দী হয়ে যাবেন। একবার বন্দী হয়ে গেলে দুনিয়াতে আর আখিরাতে তার ফলাফল আপনাকে ভোগ করতে হবে।

এরকম অনেক মানুষ আছে যারা মদ, জিনা-ব্যভিচার, সুদ ও অন্যান্য পাপ ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তারা তাদের জিহ্বা সংযত করতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একটি হাদিসে বলেছেন, "বনী আদম যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, যদি তুমি ঠিক থাকো, তাহলে আমরাও ঠিক থাকব। আর যদি মন্দ কাজ করো, তাহলে আমরাও খারাপ হয়ে যাব।"[৪২]

এই মানুষগুলো শুধু নিজেদের জবানকে সংযত না করার কারণে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে যাচ্ছে। অনেকে আছে যারা বড় কোনো পাপকাজের ধারে কাছেও যাবে না, কিন্তু মুমিনদের ব্যাপারে কথা বলার সময়ে নিজেদের জিহ্বায় কোনো লাগাম দেয় না, অসংযত থাকে। এরা হয়তো তেমন লোক যাদেরকে দেখলে আপনি বলবেন, 'আল্লাহুম্মা বারিক।' এদের মুখে হয়তো মিসওয়াক, লম্বা দাড়ি, সুন্দর হিজাব, মসজিদে আসছে-যাচ্ছে, প্রতি বছরই উমরাহ বা হজ্জ করছে। তারা দ্বীনি আমল করতে কঠোর পরিশ্রম করছে ঠিকই, কিন্তু নিজের জিহ্বাকে সংযত না করে তারা তাদের ভালো আমলগুলো অন্যদের দিয়ে দিচ্ছে।

আল-আওসাত কিতাবে ইমাম তাবারানি একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যা বর্ণনা করেছেন বারা ইবনু আজিব (رضي الله عنه)। মুসতাদরাক আল হাকীমে বলা হয়েছে, হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য কিছু আলিম এই হাদিসকে দুর্বল বলেছেন, তবে অনেকে এটা গ্রহণ করেছেন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, রিবা (সুদ) এর তিয়াত্তরটি পর্যায় আছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রিবার বাহাত্তরটি পর্যায় আছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায় হলো নিজ মায়ের সাথে জিনা করার পাপের সমান, আর রিবার নিকৃষ্ট রূপ হলো অপর মুসলিমকে অসম্মান করা।

নিজের জিহ্বার ব্যাপারে সতর্ক হোন, কারণ জাহান্নামের অধিবাসীদের শাস্তির জন্য এটাই মূলত দায়ী। এই জিহ্বার অসংযত ব্যবহারই কবরের অধিকাংশ শাস্তির জন্য দায়ী। মাঝে মাঝে দেখা যায়, কাউকে যখন বলা হয়, "অমুকের ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করুন।" তখন সে জবাব দেয়, "ভাই, আমি তো সত্য কথাই বলছি, বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলছি না। এই যে দেখুন, ইন্টারনেটে তার সম্পর্কে এমন কথা আছে, তার আগের স্বামী বা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। এলাকার ইমামও জানে, এলাকার মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যা বলছি সত্য বলছি।"

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় তার কথা সত্য, কিন্তু তার মানে কি সে ঠিক কাজটি করছে? না! এটাই তো গীবত! কারো দোষত্রুটি নিয়ে তার অনুপস্থিতিতে কথা বলাই হলো গীবত আর এটা মারাত্মক গুনাহ। যদি আপনি কারো ব্যাপারে মিথ্যা কথা

---

[৪২] তিরমিযি: ২৪০৭

বলেন, তাহলে সেটা গীবত নয়, সেটা হলো বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ—যা জবানের আরেকটি মারাত্মক রোগ!

কিছু মানুষ একত্রে বসে আড্ডা দেয় আর তাদের ভাইদের গোশত দিয়ে নিজেদের পাকস্থলী পূর্ণ করে, আল্লাহ্ বলছেন,

> **"তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তুমি তা ঘৃণা করবে (তাই গীবতকে ঘৃণা করো)।" (সূরাহ হুজুরাত: আয়াত ১২)**

গীবত করার পর এই লোকগুলো পেটভরে ইফতার করে, মসজিদে যায়, সালাত আদায় করে, উমরাহ করে আর ভাবে—কবরে গিয়ে বুঝি সে নববিবাহিত বর অথবা কনের মতো শান্তির ঘুম দেবে। না! বিষয়টা মোটেও এতটা সহজ নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার একটি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, "ঐ কবরে এক লোককে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে জিহ্বার কারণে।"

কিছু মানুষ গীবতের পক্ষে সাফাই গায় এই বলে যে, আমি এটা তার সামনেও বলতে পারব। আপনি যদি এটা তার সামনে গিয়ে বলেন, তবে আপনি এক পাপ থেকে আরেক পাপের দিকে গেলেন। নিজ ভাইয়ের ক্ষতি করলেন। যদি তাকে সরাসরি কিছু বলতে চান, তাহলে সুন্দর করে, নম্রভাবে বলুন—তাকে পরামর্শ দিন। তার আয়নার মতো হয়ে যান। বলতে হলে এভাবেই বলা উচিত। এটা হলো ভালো কাজে আদেশ করা আর মন্দ কাজকে নিষেধ করা, এটা অবশ্যই করা উচিত। তাকে বলুন, "এই কাজটা ভুল, আপনি এটা করবেন না।" তাকে পথ দেখান আর সাহায্য করুন, অথবা সে যার কথা শুনে, তাঁর মাধ্যমে হলেও তাকে শুধরে দিন।

যদি একজন মুসলিম জিনা করে, সেটা মানুষকে বলে বেড়ানোতে ফায়দাটা কোথায়? তবে তাকে নসীহা দিতে চাইলে ভিন্ন কথা, সেটা দিতে পারেন। যদি খিলাফত ব্যবস্থা থাকে, তাহলে আপনি খলিফার কাছে যেতে পারেন, খলিফার অধিকার আছে তাকে চাবুকপেটা করার। অন্যথায়, আপনি এটা নিয়ে কথা বাড়াবেন না। হয় আপনি খলিফা বা আমীরের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করবেন, অথবা তাকে পরামর্শ দেবেন, উপদেশ দেবেন। হয় তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলুন, নয়তো গোপন রাখুন—গীবত করে বেড়াবেন না।

জবান দিয়ে কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া খুবই মারাত্মক ব্যাপার। যার ব্যাপারে গীবত করা হলো, তার মনে এটা প্রবল বিষন্নতা আর কষ্টের জন্ম দিতে পারে। অনেক সময় দিন গড়িয়ে যায়, সপ্তাহ পার হয়ে যায়, এমনকি জীবনভর মানুষ এসব ভুলতে পারে না।

যারা এসব গীবত, মিথ্যাচার আর পরনিন্দা করে বেড়ায়, তাদের করণীয় নিয়ে অনেক কথা হয়। কিন্তু যাদের ব্যাপারে গীবত, মিথ্যাচার আর পরনিন্দা করা হয়, তারা কী করবে? তাদের উচিত মন খারাপ না করে বরং খুশি হওয়া। যখন আপনি শুনবেন

কেউ আপনার ব্যাপারে খারাপ কিছু বলেছে, আপনি খুশি হবেন, কারণ এর মাধ্যমে আপনি অনেক বোনাস পুরস্কার লাভ করবেন! যারা আপনার পরনিন্দা করেছে, তাদের প্রাপ্য সাওয়াব আপনি লাভ করবেন আর আপনার গুনাহের ভার তারা বহন করবে—এটা কি আপনার জন্য আনন্দের সংবাদ নয়? এগুলো বোনাস সাওয়াব, কারণ এসব পাওয়ার জন্য আপনাকে কোনো চেষ্টাও করতে হয়নি, মুফতে পেয়ে গেছেন। আর তাই যে মিথ্যা অপবাদ দেয় তাকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দেওলিয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ তার অর্জিত নেক আমলগুলো সে অন্যদের দিয়ে দিতে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, যাদের নিয়ে সে মিথ্যাচার করে, তাদের পাপের বোঝা তাকেই বইতে হয়। জান্নাতে প্রবেশের আগে কাউকে কাউকে কান্তারাহ নামক স্থানে যেতে হবে। সকল বাধা বিপত্তি এবং পুলসিরাতের পর ঠিক যখন জান্নাতের পথে কদম ফেলার সময় আসবে, তখন যাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ আছে তাদেরকে একটা লম্বা রাস্তা ধরে যেতে হবে। আল-কান্তারাহতে দুই পক্ষকে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে। সেখানে কারো নেক আমল কমে যাবে আর কারো বেড়ে যাবে।

একবার এক লোক ফুদাইল ইবনু ইয়াদ (রহ.)-এর কাছে অভিযোগ করল, "অমুক আমার নামে আজেবাজে কথা বলছে।" তিনি বললেন, "সে তো তার নেক আমল তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে।" এই কথাটা জানলে অনেকেই খুশি হয়, বিশেষ করে যারা পরনিন্দা ও মিথ্যাচারের শিকার। তাই কেউ আপনার নামে আজেবাজে কিছু বললে আপনি বরং খুশি হবেন, হতাশ হবেন না—দুঃখ পাবেন না। যে লোকটি আপনার নামে আজেবাজে বলেছেন, জেনে রাখুন, সেই লোক যদি লাইলাতুল ক্বদরে সারারাত জেগে ইবাদাতও করে, তাহলে তার সেই রাত জেগে থাকার সাওয়াব আপনিই পাচ্ছেন!

শাইখ মুনাভি (রহ.) তাঁর *'ফায়যুল কাবির'* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, আবদুর রহমান ইবনু মাহদি (রহ.) বলেন,

> "যদি আমি দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে ঘৃণা না করতাম, তবে মনেপ্রাণে চাইতাম মানুষ আমাকে কটাক্ষ করুক, আমার সমালোচনা করুক, আমাকে হেয় করুক। এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে যে, আপনি যখন বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন তখন এমন সব উৎস থেকে আপনার কাছে নেক আমল আসতে থাকবে, যা কখনও কল্পনাই করেননি! অথচ বিচার দিবসের সেই ভয়াবহ সময়ে নিজের মা'ও তো একটা নেকী দেবে না।"

একবার হাসান আল বাসরি (রহ.) তাঁর ব্যাপারে কাউকে খারাপ কিছু বলতে শুনলেন। এই কথা শুনার পর তিনি বাজারে গেলেন এবং সেই ব্যক্তির জন্য কিছু খেজুর কিনে আনলেন। এতে কুমন্তব্যকারী লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "যে আপনার ব্যাপারে বাজে কথা বলছে, সমালোচনা করছে, অপবাদ দিচ্ছে, আপনি তাকে খেজুর কিনে

দিচ্ছেন!" উত্তরে হাসান আল বাসরি বললেন, "তুমি তো আমাকে তোমার নেক আমল দিয়ে দিয়েছ, তাই বিনিময়ে আমিও তোমাকে কিছু দিচ্ছি।"

এমনিভাবে কিছু মানুষ নিজেদের রামাদানের আমল, লাইলাতুল ক্বদরের ইবাদাত, এমনকি হজ্জের সাওয়াব পর্যন্ত অন্যদেরকে দিয়ে ফেলে।

একবার দুই ভাই-বোন মিলে হজ্জে গেল। ভাইটি তার স্ত্রীকে রেখেই হজ্জে গিয়েছিল, কারণ তাদের অনেকগুলো সন্তানের দেখভাল করতে হয় বলে স্ত্রী যেতে চাননি। বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য সে বাড়িতেই থেকে গেল। হজ্জের সময় সেই ভাই-বোন কোথাও যাচ্ছিল। যেতে যেতে ভাই বোনকে বলল, "তুমি আগাতে থাক, আমি স্ত্রীর জন্য কিছু উপহার কিনে আসছি।" বোনটি একটু তাড়ার মধ্যে ছিল বলে সে বিরক্ত হয়ে ভাইয়ের স্ত্রী সম্পর্কে একটা সামান্য শব্দ উচ্চারণ করল। অথচ ঐ বোন আর তার ভাইয়ের স্ত্রীর মধ্যে কোনোরকম শত্রুতা ছিল না যে তারা একে অপরকে কটাক্ষ করবে, তাদের মধ্যে বেশ ভালোই মিল ছিল। কিন্তু এটা ছিল মুহূর্তের জন্য মুখ ফসকে যাওয়া কিছু শব্দ।

এরপর ঐ ভাইয়ের স্ত্রী একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটা অনেকটা এরকম যে, তার ননদ তাকে নিজের কৃত হজ্জটি উপহার হিসেবে দিয়ে দিচ্ছে। মহিলাটি এই স্বপ্ন দেখে তাজ্জব হয়ে গেল এবং একজন শাইখকে ফোন করে বলল, "শাইখ! আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। আমার ননদ আমাকে তার হজ্জ দিয়ে দিচ্ছে।" শাইখ বললেন, "আপনার ননদ নিশ্চয়ই আপনার ব্যাপারে খারাপ কিছু বলেছে, গীবত করেছে, আর এ কারণে তার হজ্জ আপনি পেয়ে গেছেন।"

যখন ভাই-বোন হজ্জ করে ফেরত আসল, মহিলাটি তার ননদকে স্বপ্নের ব্যাপারে বলল। যেহেতু তাদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য ছিল না, বোনটি তার দোষ স্বীকার করল এবং অনুতপ্ত হয়ে মাফ চাইল। তাদের মধ্যে যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল, তারপরও একটা মাত্র শব্দের কারণে তার সম্পূর্ণ হজ্জ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল!

তাহলে চিন্তা করে দেখুন, যারা নিয়মিত মানুষের সমালোচনা করেই যাচ্ছে, এই ব্যাপারে প্রবন্ধ লিখছে, প্রতিনিয়ত অন্যের সম্মানে আঘাত করছে—তারা প্রতিনিয়ত কী পরিমাণ নেক আমল নিজেদের আমলনামা থেকে হারাচ্ছে!

ওয়াল্লাহি! মুসলিমদের ব্যাপারে গীবত কোনো ফেলনা বিষয় নয়! আপনার বলা মাত্র কয়েকটি শব্দের জন্য বছরের পর বছর ধরে করা ভালো আমলগুলো আরেকজনকে দিয়ে দিতে হবে! মাত্র কয়েকটি শব্দ আর সেটির ক্ষতিপূরণ সারাজীবনের সব নেকী—কী ভয়ংকর ব্যাপার! আল্লাহ এমন পরিণতি থেকে আমাদের হেফাযত করুন।

এগুলো কোনো মনগড়া কথা নয়। ভেবে দেখুন এই গীবতের কারণে মুসলিমদের মধ্যে কী পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে—তাহলে বুঝতে পারবেন কেন এর শাস্তি এত

ভয়াবহ! একটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যখন রাসূল (ﷺ) সাফিয়্যা (رضي الله عنها)-কে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন আইশা (رضي الله عنها) বললেন, "উনি তো খাটো।" আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি মুখে সাফিয়্যা (رضي الله عنها)-কে ঠিক খাটোও বলেননি, শুধুমাত্র হাত নাড়িয়ে বুঝিয়েছিলেন। অত:পর রাসূল (ﷺ) আইশা (رضي الله عنها)-কে বললেন, "তুমি যদি এই কথাটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করো, তবে তা সমুদ্রকেও পরিবর্তন করে দেবে।" চিন্তা করুন, শুধু একটা শব্দ কিংবা একটু ইশারা, অথচ তার ফলাফল কতটা ভয়াবহ!

অন্যদিকে সমালোচনার শিকার আমার ভাই ও বোনেরা, পাহাড় এবং সমুদ্র সমতুল্য নেকী আপনারা উপভোগ করুন। হাশরের ময়দানে যে নেক আমল আপনার মা, আপনার বাবা এমনকি আপনার নিজের সন্তানও আপনাকে দেবে না! আপনারা তা পাবেন ঐসব লোকেদের কাছ থেকে যারা দুনিয়ায় আপনার সমালোচনা করত, আপনাকে হেয় করত।

তারাবীহ সালাতের পর মসজিদে আপনি কিছু মুসল্লি দেখবেন যারা মুসলিমদের নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকে, তাদের গীবত করতে থাকে। তারা এক কোণায় বসে প্রথমে ইমাম সাহেবের গীবত করা শুরু করে, এরপর সালাতে তাদের ডান পাশের এবং বাম পাশের মুসল্লিকে নিয়ে মন্তব্য করা শুরু করে। খুব আনন্দের সাথেই তারা এই গীবত করতে থাকে, একসময় রাজনীতিতে যায় এবং এমন সব মানুষকে কটাক্ষ করে, যারা এখন শহীদ হিসেবে জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে গেছে বা সবুজ পাখি হওয়ার পথে। ঐ গীবতকারী ভাইদের আমলগুলোর কী হয়? তাদের তারাবীহ? তাদের কিয়াম? আফসোস! এত কষ্ট করে কামাই করা তাদের এই কর্মফলগুলো তারা অন্যদের দিয়ে দেয়।

একবার আম্মাজান আইশা (رضي الله عنها)-এর কাছে সংবাদ এলো যে, আবু বকর (رضي الله عنه) ও উমার (رضي الله عنه)-এর ব্যাপারে কিছু লোক বাজে কথা বলে। তখন আইশা (رضي الله عنها) বললেন, "সুবহানআল্লাহ, তাদের মৃত্যুর পর তাদের আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে তাদের নেকী বৃদ্ধির একটি পদ্ধতি।" আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক (رحمه الله) বলতেন, "আমি যদি কারো ব্যাপারে গীবত করতাম, তবে আমার পিতামাতার ব্যাপারেই করতাম। কেননা আমার ভালো আমলের বিনিময় পাওয়ার জন্য তারাই সবচেয়ে বেশি হকদার।"

অপবাদ দেওয়া, গীবত ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয় আপনি নিজেই এগুলোর শিকার, অথবা আপনি নিজেই কারো গীবত করছেন অথবা আপনি শুধুই শ্রোতা। আপনার ব্যাপারে যদি কেউ গীবত করে, তবে কষ্ট না পেয়ে সেই পুরস্কার উপভোগ করুন। চিন্তা করুন বিনামূল্যের সেই হজ্জটির কথা যেটি আপনি পেতে যাচ্ছেন, সেই রামাদানটির কথা যার সাওয়াব আপনি পেয়ে যাচ্ছেন কোনো মেহনত না করেই। চিন্তা করুণ সেই সময়ের কথা, যখন হাশরের মাঠের কঠিন সময়ে সমুদ্র ও পাহাড় সমতুল্য কর্মফল আপনার নিকট আসতে থাকবে। স্মরণ করুন ঐ কাজের কথা, যা আপনাকে পৌঁছে

দেবে জান্নাতুল ফিরদাউসে, অথচ সেই পুরস্কারসমূহের জন্য আপনাকে কিছুই করতে হয়নি।

যারা গীবত করে, অপবাদ দেয় বা ঐ জাতীয় কাজে লিপ্ত, তাদের ব্যাপারে অনেক কথা হয়েছে, এবার তাদের পালা যারা অন্যের করা গীবতের নীরব শ্রোতা। আপনারা যারা এই ধরনের গীবতের মজলিশে থেকে অন্যের গীবত শুনছেন, তাদের করণীয় হলো যত দ্রুত সম্ভব ঐ মজলিশ থেকে সরে আসা, অথবা গীবতকারী মানুষটিকে থামতে বলা। তারা যদি থামে তবে আপনি তাদের সাথে বসতে পারেন। যদি না থামে, তবে আপনি তখনই সরে যান। শ্রবণকারীরাও গুনাহের ভাগীদার এবং আপনি কিয়ামাতের দিন তাদের সাথেই দণ্ডায়মান হবেন। কেননা আল্লাহ্ একই বিষয়ে বলেন,

> **"আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোনো আয়াত প্রত্যাখাত হচ্ছে এবং ঐটিকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, তোমরা তাদের সাথে বসো না। নতুবা তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। মুনাফিক ও কাফের সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (সূরাহ নিসা: আয়াত ১৪০)**

আপনি নিজে বলেননি, শুধু শুনেছেন। তবুও আপনি তাদের সাথে গীবতে যোগদানকারী হিসেবে গণ্য হবেন। কাজেই, এসব থেকে দূরে থাকুন। আপনার ভাই এবং বোনের সম্মানহানিকে বাধা দিন। একজন মুসলিমের সম্মান রক্ষা করুন। তাহলে আল্লাহ্ বিচার দিবসে আপনাকে রক্ষা করবেন।

সুনান আত-তিরমিযিতে আছে, আপনি কিছু মানুষের সাথে বসে আছেন, এমন সময়ে তারা কারো সম্পর্কে পরনিন্দা শুরু করল। আপনি যদি তাদের বিরুদ্ধে সেই ভাইয়ের সম্মান রক্ষার জন্য কথা বলেন, তাহলে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন।

আবু আইয়ুব (ﷺ)-এর মতো হোন। আবু আইয়ুব (ﷺ) ছিলেন গুজব বিনষ্টকারী। উম্মাহর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর জঘন্য গুজবের বিরুদ্ধে তাঁর পদক্ষেপের জন্য আল্লাহ্ তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। গুজবটি ছিল উম্মুল মুমিনীন আইশা (ﷺ)-কে অপবাদের (ইফকের) ঘটনা।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত, যখন লোকেরা আইশা (ﷺ)-এর ব্যাপারে বলাবলি করছিল, আবু আইয়ুবও তা শুনেছিলেন। (তাঁর আসল নাম, খালিদ ইবনু যাইদ আল-আনসারি)। তিনি তাঁর স্ত্রী উম্ম আইয়ুবকে বলছেন, "যদি আইশার জায়গায় তুমি ঐ লোকটির সাথে মরুভূমিতে একা থাকতে, তুমি কি তার সাথে কিছু করতে?" তাঁর স্ত্রী বললেন, "প্রশ্নই আসে না।" তিনি বললেন, "আর আইশা তো তোমার চাইতেও উত্তম। কাজেই তিনিও কিছু করতেন না।"

তাঁরা যেন অপবাদকেই হত্যা করে ফেললেন। তাঁর স্ত্রীও এমন কিছু বলেননি যেমন- "আইশা কমবয়সী এবং সুন্দরী। আমি এটা বিশ্বাস করি না কিন্তু হতেও তো পারে।" না, এসব কিচ্ছু বললেন না। আইশা (ﷺ) এমন কিছু করতেই পারেন না, ব্যস!

আল্লাহ্ আবু আইয়ুব ও তাঁর স্ত্রীর সম্মানে কুরআনে উল্লেখ করলেন,

> **"তবে তোমরা যখন এটা (এই অপবাদ) শুনতে পেলে, তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীরা তাদের নিজেদের লোক সম্পর্কে ভালো ধারণা করলো না আর বললো না, 'এটা তো খোলাখুলি অপবাদ।'" (সূরাহ আন-নূর: আয়াত ১২)**

যখনই আপনি কারো কাছে আপনার মুসলিম ভাই বা বোনের ব্যাপারে কোনো ভিত্তিহীন গুজব বা অপবাদ শুনবেন, সাথে সাথে তাকে বলুন, "তুমি একজন মিথ্যাবাদী। এটা একটা সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা, কাজেই চুপ থাক।" আপনি এই কাজটি উত্তমভাবে করতে পারেন এবং গুজব বন্ধ করতে পারেন। গুজব শুরুতেই ছড়ানো বন্ধ করুন, তাহলে এটা এখানেই থেমে যাবে।

এই আয়াতে দুটো কাজের কথা বলা আছে।

প্রথমত, অবশ্যই অন্য মুসলিম বা মুসলিমাহর ব্যাপারে মনে ভালো ধারণা রাখতে হবে।

আর দ্বিতীয়ত, পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তাকে বলতে হবে যে, এটি একটি সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা।

শুধুমাত্র একটা কথা আপনি শুনেছেন বলেই সেটা ছড়ানোর কোনো অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়নি। বরং আল্লাহর সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, যারা গুজবকে ধ্বংস করে দেয়।

আপনি যদি শুধু একজন শ্রোতা হয়ে থাকেন, তাহলে যারা গীবত করে, গুজব ছড়িয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করছে—তাদের থামান। কখনো দেখেছেন কাউকে একা একা গীবত করতে? যদি আমি, আপনি এবং সব ভাইবোনেরা গুজব শোনা থেকে বিরত থাকি, তাহলে সে কখনোই নিজের ঘরে বসে বসে গুজব রটাতে পারবে না বা গীবত করতে পারবে না। যে লোকটি আপনাকে অন্যরা কী করছে, না করছে এসব ব্যাপারে খবর দিতে আসে আর নামীমাহ্ করে (অর্থাৎ কুৎসা রটায়)—সে একজন 'নাম্মাম' এবং 'ক্বাত্তাত'।

ভাববেন না যারা এমন কুৎসা রটায়, তারা শুধু আপনাকেই শুনাতে আসে। আপনি হয়তো অন্যের ব্যাপারে এমন গল্প শুনে আনন্দ পাচ্ছেন, কিন্তু এটা শুধুই সময়ের ব্যাপার, যখন ঐ কুৎসাকারী অন্যদের কাছে গিয়ে আপনার ব্যাপারেও কথা বলা শুরু করবে।

যে লোকটি আপনার সম্পর্কে আপনার পেছনে কথা বলে, সে আসলে অন্ধকারে আপনার দিকে গুলি ছোঁড়ে। যেহেতু আপনি কথাগুলো শোনেননি, তাই সে আসলে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। তাই, আপনি ব্যথাও পাননি। কিন্তু যে লোকটি আপনার বিরুদ্ধে বলা কথাগুলো আপনাকে শুনাতে আসে, সে যেন প্রকৃতপক্ষে ঐ লোকটির বন্দুকের নলে আপনাকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে সাহায্য করে। কাজেই, এটি আপনাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। দুটোর কোনোটাই কম খারাপ না।

ইবনু কাসির (ﷺ) বলেন, "যারা গুজব ছড়ায়, অন্যদের গীবত আর কুৎসা রটায়, তারা এক মুহূর্তের মধ্যে এমন একটি কাজ করে ফেলে, যেটা কালো জাদুকরেরা বছরের পর বছর ধরেও করতে পারে না।"

ইমাম আহমাদ (ﷺ) একবার এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তিনি অসুস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার দেখিয়েছেন কি না। লোকটি বললেন, হ্যাঁ। অথচ লোকটি তখনও অসুস্থ ছিলেন। তাই ইমাম আহমাদ জিজ্ঞেস করলেন, কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন? অসুস্থ লোকটি ডাক্তারের নাম বললেন। ইমাম আহমাদ তাঁকে অন্য একজন ডাক্তার দেখাতে বললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ইমাম আহমাদ বলে উঠলেন, "আস্তাগফিরুল্লাহিল আযীম। আমি তো গীবত করে ফেললাম!"

উনি শুধুই একজন ডাক্তারের উপরে অন্য ডাক্তারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর জিহ্বার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন, তাই তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন গীবত করে ফেললেন।

যখনই আপনি একজন মুসলিম সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে যাবেন, নিজের ভুলগুলোর কথা চিন্তা করুন।

সব মানুষই তো আপাদমস্তক ভুলের সাগরে ডুবে আছে, অথচ তারা অন্যের ভুল নিয়ে কথা বলতে বেশি পছন্দ করে। আপনি যখন কারো সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে চাইবেন, একবার তার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করে দেখবেন। কেউ আপনাকে নিয়ে কটূক্তি করলে আপনার কেমন লাগবে?

এই সবকিছু জানার পর কেউ কেউ বলবেন, আমি তাওবাহ্ করতে চাই, কারণ আমি চাই না অন্য কেউ আমার আমল নিয়ে নিক।

সেক্ষেত্রে, প্রথমত, আপনি তাদের কাছে ক্ষমা চান। যদি এমন হয়ে থাকে যে, তারা অনেক উদার, আপনাকে ক্ষমা করবেন এবং আর কোনো সমস্যা তৈরি হবে না—তাহলে যান এবং ক্ষমা চান।

কিন্তু যদি আপনার মনে হয় ক্ষমা চাইতে গেলে বরং আরো বেশি সমস্যার সৃষ্টি হবে, তাহলে এটা করবেন না। কারণ পুরো ব্যাপারটার উদ্দেশ্যই হলো মুসলিমদের মাঝে

কষ্ট আর সমস্যা দূর করা। যদি মনে করেন ক্ষমা চাইতে গেলে কষ্ট বাড়বে, তাহলে বরং তাঁর জন্য দু'আ করুন, তাঁর সম্পর্কে মানুষের কাছে ভালো কথা বলুন এবং তাঁর নামে দান সাদাকা করুন। এটাই সবচেয়ে ভালো কাজ।

যদি কিছু নির্দিষ্ট মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কে আগে গীবত করে থাকেন, তাহলে সেই মানুষগুলোর সাথেই আবার তাঁর ব্যাপারে ভালো কথা বলুন অথবা তার জন্য দু'আ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাঁর অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

এবার আপনাকে আল্লাহ্‌র অধিকার পূরণ করতে হবে। এটা তিনটি ধাপে করতে হবে। আস্তাগফিরুল্লাহ্‌ বলুন, সিদ্ধান্ত নিন আর কখনও এমন করবেন না এবং অতীতে যা করেছেন তা ভেবে অনুতপ্ত হোন।

ইনশাআল্লাহ্‌, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর নিজের সাথে নিজে সংকল্পবদ্ধ হোন যে, আপনি আর কখনও এমন কাজের পুনরাবৃত্তি করবেন না।

বিদায় রামাদান

রামাদান মাস! দিনগুলো আপনি হয়তো সাওয়াব দিয়ে পূর্ণ করেছেন কিংবা গুনাহ দিয়ে। অভিনন্দন তাদের জন্য, যারা এক শুভ্র পরিচ্ছন্ন আমলনামা হাতে নিয়ে রামাদান পার করেছে। যখন তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়াবে, এই আমলনামা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। তাদেরকে অভিনন্দন, যারা আল্লাহর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় এই রামাদানে অশ্রুবর্ষণ করেছে, আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের যে বিশেষ সম্পর্ক সে সম্পর্ককে উপভোগ করতে পেরেছে। তারাই সৌভাগ্যবান, যারা নিজেদের ভালো আমল দিয়ে নিজেদের পবিত্র করতে পেরেছে, উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে। কেননা এই নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই একজন মানুষ সত্যিকারের সম্মান লাভ করে, নিজের আত্মাকে বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে।

সে কতই না সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যে রামাদানকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছে। নতুন অঙ্গীকার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পরিশুদ্ধ মন ও সতেজ সংকল্প নিয়ে সে রামাদানের পরবর্তী দিনগুলো শুরু করতে যাচ্ছে। অন্য জাতিগুলো নতুন বছর এলে, প্রতিবার বছরের শুরুর দিনে অর্থহীন সব অঙ্গীকার করে—যেগুলো তাদের কখনও পূরণ করা হয়ে উঠে না। কিন্তু রামাদানে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক এই শুদ্ধতার ধারাবাহিকতা—গুনাহ থেকে নিজেদের বিরত রাখার দৃঢ় সংকল্প। যদি না-ও পারি, অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসার সুযোগ আছে—মহান রবের তাওবার দরজা আমাদের জন্য সবসময় খোলা।

রামাদান চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের অঙ্গীকার হোক আমাদের কিয়াম এবং সিয়াম যেন ছুটে না যায়। বছরের বাকি দিনগুলোতেও যেন এই ইবাদাতগুলো আমাদের জীবনের অংশ হয়ে থাকে। প্রতিটি রামাদান এবং জীবনের বাকী সময়টুকুও যেন এভাবে কাটাতে পারি।

রামাদানে আমরা অর্জন করেছি তাকওয়া। তাকওয়া হলো মনের একধরণের সচেতন অবস্থা—যে সচেতনতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ আমাদের সবসময় দেখছেন। এই তাকওয়া যেন বছরের বাকি সময় জুড়েও আমাদের মধ্যে থাকে। রামাদান চলে যাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমাদের আনুগত্য, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর কাছে দু'আ, অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর কাছে চাওয়া—এই অভ্যাসগুলো যেন আমাদের ছেড়ে চলে না যায়। এই রামাদানে আপনি আপনার অভ্যাস বদলেছেন,

গুনাহ ছেড়ে দিয়েছেন, অতীত জীবনের গুনাহগুলোর জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে গুনাহের গভীর অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছেন। ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি আজ একজন পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুদ্ধ মানুষ। এতটাই পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ, যেন মাত্র আপনার জন্ম হয়েছে। কাজেই গুনাহের সেই আস্তাকুঁড়ে নিজেকে আর কখনোই ছুঁড়ে ফেলবেন না।

রামাদানের শেষ দিনগুলোতে আপনার সর্বোচ্চটা ঢেলে দিন। বিশ্রাম নেওয়ার সময় আমাদের হাতে নেই। মনে রাখবেন, একজন মুমিন হিসেবে আমরা তখনই বিশ্রাম লাভের সুযোগ পাব, যখন আমাদের দুই পা জান্নাতে প্রবেশ করবে। হতে পারে রামাদানের শুরুতে আপনার মাঝে কিছুটা ঘাটতি ছিল। সেটা এখন ভুলে যান। আপনি রামাদান কীভাবে শেষ করছেন, সেটার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। তাই আসুন, রামাদানকে বিদায় জানাই নিজের সবচেয়ে ভালোটা দিয়ে। রামাদানের পর কী আসবে, সেটার জন্য এখনই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করুন। রামাদান শুরুর আগে রামাদানের জন্য আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি, এবং শেষ মুহূর্তে নিজেদের সবচেয়ে ভালোটা ঢেলে দিচ্ছি—তেমনি রামাদানের পর আমরা কীভাবে কী করব সেটার জন্যও নিজেদের তৈরী করে রাখব ইনশাআল্লাহ। রামাদান-পরবর্তী সময়টা যেন হঠাৎ করে আমাদের সামনে হাজির না হয়, সেটার জন্যও যেন আমরা প্রস্তুত থাকি।

রামাদানের পর কী হবে? রামাদানের সময়টায় শয়তানকে আটকে রাখা হয়েছিল। সে নিদারুণ মনোকষ্ট নিয়ে দেখছিল আমরা সালাত আদায় করছি, ইবাদাত করছি। সে দেখেছে আমরা ঈমানের পরিষ্কার চাদর দিয়ে নিজেদের ঢেকেছি। তাই সে চাইবে রামাদান শেষ হলে গুনাহের নর্দমায় যেন আমাদের আবার টেনে হিঁচড়ে নামাতে পারে। রামাদানের দিনগুলোতে সে তিক্ততা আর যন্ত্রণা নিয়ে আমাদের ভালো আমল আর তাওবার দিকে কেবল তাকিয়ে ছিল, কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। রামাদান শেষ হয়ে গেলে সতর্ক থাকবেন, আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার আপনি করেছেন, শয়তান যেন সেই অঙ্গীকার ভেঙে আপনাকে প্ররোচিত করতে না পারে। আল্লাহর সাথে আপনার শপথ এবং প্রতিশ্রুতিকে নষ্ট করবেন না। রামাদান মাসে যে ভালো আমলগুলো আপনি করেছেন, সেগুলো যেন একটি অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদের মতো। ইটের পর ইট সাজিয়ে, স্তরে স্তরে আপনি এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। রামাদানের প্রতিটি সেকেন্ডকে কাজে লাগিয়ে এই প্রাসাদ নির্মাণে আপনি ত্যাগ আর কষ্ট স্বীকার করেছেন—ক্ষুধার কষ্ট, তৃষ্ণার কষ্ট, নির্ঘুম রাত এবং নিজের প্রবৃত্তি আর নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করার কষ্ট। শুধু রামাদানে আপনি যে ভালো কাজগুলো করেছেন, সেটার দাম একজন কোটিপতির সম্পদের চাইতেও বেশি!

এবার একটা ঘটনা কল্পনা করুন। ধরুন, আপনি একটা বিশেষ প্রজেক্টে বেশ কিছু সপ্তাহ বা মাস জুড়ে অনেক খাটুনি করলেন। আপনি আপনার সমস্ত কাজ একটি পাওয়ারপয়েন্ট ফাইলে সেইভ করে রাখলেন।

কিন্তু আপনার প্রফেসরকে দেখানোর ঠিক আগ মুহূর্তে আপনি হঠাৎ করে পুরো হার্ড ড্রাইভ ফরম্যাট করে দিলেন। মানুষ বলবে আপনি স্রেফ একটা পাগল! কারো যদি কোটি টাকা থাকে যা সে জীবনভর কষ্ট করে কামিয়েছে, সেটা যদি সে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে তাহলে কি আমরা তাকে পাগল বলব না? সারা রামাদান ইবাদাত করে রামাদান শেষে যারা আবার গুনাহের পথে ফিরে গেল—তাদের উদাহরণও এমনই।

> **"আর তোমরা সে নারীর মতো হয়ো না, যে তার পাকানো সুতো শক্ত করে পাকানোর পর টুকরো টুকরো করে ফেলে। তোমরা তোমাদের উপর অঙ্গীকারকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণা হিসেবে গ্রহণ করছো (এই উদ্দেশ্যে) যে, একদল অপর দলের চেয়ে বড় হবে।" (সূরাহ আন-নাহল: আয়াত ৯২)**

জুরায়েজ, আস সুদ্দি এবং ইবনু কাসিরের মতে, এখানে মক্কার এক পাগল মহিলার কথা বলা হচ্ছে। কারো কারো মতে তার নাম রাইতাহ বিনতে আমর ইবনু কাব, কারো মতে এই আয়াতে কেবল প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা ভঙ্গের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে। ঘটনাটা হলো—মক্কার সেই মহিলা অনেক সুন্দর সুন্দর কম্বল, কাপড়, টুপি তৈরি করত, কিন্তু বানানো শেষ করে সে দুই দিক থেকে সুতা ধরে টান দিয়ে সুন্দর জিনিসটা নষ্ট করে ফেলত। সবাই বলতো সে একটা পাগল। এটি হচ্ছে সেই লোকটির মতো, যার প্রজেক্টের উপর তার পুরো ক্যারিয়ার নির্ভর করে আছে, কিন্তু এটা জমা দেওয়ার আগেই সে তার হার্ড ড্রাইভ ফরম্যাট করে দিল। আর যে লোকটা রামাদানের পর আগের জীবনে ফিরে গিয়ে তার সমস্ত ভালো আমল নষ্ট করে ফেলল, সে এদের চাইতেও বড় পাগল।

কাজেই সেই মহিলার মতো হবেন না, যে নিজের বোনা সুতা খুলে ফেলে সুন্দর জিনিসটিকে নষ্ট করে ফেলে। সেই লোকটার মতো হবেন না, যে বছরের পর বছর পরিশ্রম করে অনেক উঁচু একটা দালান নির্মাণ করলো আর কাজটা শেষ হওয়ার পর যখন তার সেই দালানে প্রবেশ করার সময় এলো, তখন সে একটি ডিনামাইট দিয়ে দালানটিকে ধ্বংস করে ফেলল। আপনি রামাদানের সিজনাল মুসলিম হবেন না, আপনি হবেন একজন ঈমানদার মুসলিম, ইহসানি মুসলিম, রাব্বানি মুসলিম। রামাদান শেষ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে দিনগুলো। কিন্তু যিনি এই রামাদানের মালিক, যিনি দিন-রাত সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কোনো শেষ নেই—তিনি চিরঞ্জীব!

রামাদানের পর সেই আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার বিষয়টা আসলে কেমন? আচ্ছা ভেবে দেখুন, এমন একটা লোক যার গা থেকে অসম্ভব দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, তার আলুথালু বেশভূষা, অপরিচ্ছন্ন এবং নোংরা শরীর! আমরা সাধারণত এরকম কারো কাছে ঘেঁষতেও চাই না। কল্পনা করুন, সেই লোকটি একদিন ভালোমতো নিজেকে পরিষ্কার করে গোসল করল, নিজের চুল পরিপাটি করে আঁচড়াল এবং নিজের গায়ে সুগন্ধি মাখলো। কতোই না সুন্দর সেই দৃশ্য! কিন্তু সেই একই লোকটি যদি আবার নোংরার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে আগের মতো হয়ে যায়, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে?

এই উদাহরণ হলো সেই লোকটির মতো, যাকে আল্লাহ রামাদানে তার সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র করে দিলেন, কিন্তু লোকটি রামাদানের পর আবার তার সেই পাপের রাজ্যে ফিরে নিজেকে নোংরা করল।

আপনি কি এমন কাউকে দেখেছেন, যারা সিগারেট খেয়ে নিজের শরীরের বারোটা বাজিয়েছে? রোগে ভুগে ফ্যাকাসে, দুর্বল আর হলুদ হয়ে গেছে? তার মৃত্যু প্রায় সমাগত। এমন অবস্থায় লোকটি হাসপাতালে গেল। ডাক্তার তার চিকিৎসা করল, তাকে ওষুধ দিল, লোকটি আবার সুস্থ সবল হয়ে উঠল। এরপর যদি লোকটি হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে আবার সিগারেট খাওয়া শুরু করে, তাহলে বিষয়টা কেমন হবে?

রামাদান ঈমানের জন্য একটা থেরাপির মতো। এই থেরাপির কল্যাণে আপনি একজন সুস্থ মানুষ। খেয়াল রাখবেন পাপের অসুস্থতা যেন আপনার সুস্থ-সবল আত্মাকে কলুষিত করতে না পারে, আপনাকে যেন আবার দুর্বল করতে না পারে। শয়তানকে কখনোই তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করার সুযোগ দেবেন না।

> **“যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।” (সূরাহ বনী ইসরাইল: আয়াত ৬২)**

শয়তান বলছে আমি তাদেরকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসব এবং তাদের পথভ্রষ্ট করব। এখানে যে শব্দটি এসেছে, সেটি হলো আহতানিকান। একটা কুকুরকে যেভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, শয়তান সেভাবে আমাদেরকে জাহান্নামে দিকে টেনে নিতে চায়—আহতানিকান শব্দের এটাই বাস্তব রূপ। আল্লাহ বলছেন,

> **“আর তাদের উপর ইবলিস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো। ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল বাদে সকলেই তার পথ অনুসরণ করলো।” (সূরাহ সাবা: আয়াত ২০)**

শয়তান তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পেরেছে সবার ওপরে, শুধু মুমিনদের দল ছাড়া। কাজেই আপনিও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করুন, যাদের উপর শয়তান বিজয়ী হতে পারবে না। আজ থেকেই পরিকল্পনা শুরু করুন ঈদের পর কী করবেন। না হলে শয়তান আপনাকে ধোঁকায় ফেলবে।

রামাদানের পর প্রতিদিন কিছু কুরআনের আয়াত পড়ুন। আজই দৃঢ় নিয়ত করুন—যে করেই হোক রোজ এতটুকু কুরআন পড়ব—কখনোই ছাড়ব না। রাতের কিছু সময় আল্লাহর সাথে একান্তে কাটান। সেটা যত সামান্যই হোক না কেন, কখনোই সেটা ছাড়বেন না। প্রতি মাসের কয়েকটা দিন সিয়াম পালন করুন, হতে পারে সেটা দুই কিংবা তিন দিন।

অল্প দিয়েই শুরু করুন, ধীরে ধীরে আপনি উন্নতি করবেন, কিন্তু মিস যেন না যায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন যে, সময় যেমনই হোক—আপনি কাজগুলো করবেন।

রামাদানের শেষ দিনগুলোতে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আপনার কাজগুলো কবুল করে নেন।

> **"এবং যারা যা দান করবার, তারা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে (তারা ভয় পায় যে তাদের দান কবুল হল কিনা) এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে।" (সূরাহ আল মুমিনূন: ৬০)**

এই আয়াত নাযিল হবার পর আইশা (ﷺ) আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এই আয়াতে কি সেই লোকদের কথা বলা হচ্ছে যারা মদ খায়, চুরি করে?" রাসূল (ﷺ) উত্তর দিলেন, "না, এখানে বলা হচ্ছে সেসব বান্দার কথা যারা সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং দান করে, আর ভয় করে তাদের এই ইবাদাতগুলো আল্লাহ আদৌ কবুল করেন কি না।"

কিছু সালাফদের কথা আমরা জানি, যারা রামাদান শেষ হওয়ার পর ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন তাঁদের রামাদানের ইবাদাত যেন কবুল করা হয়। কারণ আপনি ইবাদাত করেছেন তার মানে এই না যে সেই ইবাদাত কবুল হয়ে গেছে।

ইবরাহীম (ﷺ) কাবা ঘরের খুঁটি নির্মাণ করেছিলেন আল্লাহর নির্দেশে। তিনি ছিলেন আল্লাহর এক বিশেষ নবী, সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী অনেক বড় একটা কাজ করছেন। তাঁর আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। তারপরেও তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন যেন তাঁর এই আমল আল্লাহ কবুল করে নেন,

> **"হে আল্লাহ, তুমি আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চই তুমি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।" (সূরাহ বাকারা: আয়াত ১২৭)**

কখনই এটা ভেবে অহংকার করবেন না যে, আপনি আল্লাহর ইবাদাত করেছেন, অনেক বড় কিছু করে ফেলেছেন। ধরুন আপনার খুব টাকার দরকার এবং একজনের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিলেন এবং আপনি সেটা একসময় ফেরত দিতে গেলেন। কিন্তু ফেরত দিতে গিয়ে আপনি দেরি করে ফেলেছেন, আর পুরো টাকাও ফেরত দিতে পারেননি। আপনি কি তাকে ঔদ্ধত্যের সাথে টাকাটা ফেরত দেবেন? তাকে বলবেন, "এই নাও তোমার টাকা, তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না!" নাকি তাকে আপনি টাকাটা বিনয়ের সাথে ফেরত দেবেন এবং চাইবেন সে আপনার সাথে রাগ না করুক, কারণ সে আপনার উপকার করেছে!

আল্লাহর নিআমত গুণে শেষ করা যায় না। এর কোনো প্রতিদান নেই। তাই আপনি আল্লাহর ইবাদাত করছেন এই ভেবে কখনও অহংকার করবেন না।

আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আল্লাহ আপনার আমলগুলো কবুল করেন এবং নম্র ও বিনয়ী থাকুন। আল্লাহ আপনাকে অনেক দিয়েছেন এবং আপনি যত যা-ই করুন না কেন, কখনোই তার প্রতিদান দিতে পারবেন না।

> **"আর যদি তুমি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত গুনতে চাও, তুমি তা কখনোই গুনে শেষ করতে পারবে না।" (সূরাহ নাহল: ১৮)**

রামাদান শেষে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ রামাদানের সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হবে। অতএব আমল করতে থাকুন, আর আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন যেন আপনি এই রামাদানের উসিলায় জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্তদের একজন হয়ে যান।

সুতরাং আমাদের করণীয় হলো,

প্রথমত, আমরা রামাদানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব। রামাদানের শেষ মুহূর্ত বলতে বুঝায় রামাদানের শেষ মাগরিব পর্যন্ত। আমাদের দিন শুরু এবং শেষ হয় মাগরিব দিয়ে। যদি আগামীকাল রামাদানের শেষ দিন হয়, সেক্ষেত্রে আগামীকাল শেষ হবে মাগরিব দিয়ে আর সেটিই হবে রামাদানের শেষ মুহূর্ত। আপনাকে সেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই চেষ্টা করে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আপনি দু'আ করতে থাকুন যেন আল্লাহ আপনাকে কবুল করে নেন।

তৃতীয়ত, রামাদানের পরেও এই পরিবর্তন ধরে রাখার চেষ্টা করুন।

এবং চতুর্থত, নিজেদের অন্তরকে পরিষ্কার এবং পবিত্র করতে সচেষ্ট হওয়া।

রামাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো একটা পবিত্র অন্তর নিয়ে একে বিদায় জানানো। ইবাদাতের ক্ষেত্রে অন্তর পবিত্র রাখার পাশাপাশি অন্য ভাইবোনদের প্রতিও আমাদের অন্তর পবিত্র রাখতে হবে। আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

> "প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করা হয়। যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করে না তিনি তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করে দেন, তবে শুধুমাত্র তাদেরকে ছাড়া যারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেয়। তাদের ত্যাগ করো, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়।"

যাদের সাথে আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাদের সাথে মীমাংসা করে নিন এবং সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন। আপনি যদি চান রামাদানের আমলগুলো আল্লাহর আরশ

পর্যন্ত পৌঁছে যাক, তাহলে এক্ষুনি আপোস করে নিন—মিটিয়ে ফেলুন যত তিক্ত সম্পর্ক। এই কাজটা করুন আজ এবং এক্ষুনি—রামাদান শেষ হয়ে যাবার আগেই!

কেউ হয়তো বলবেন, "আমার এখানে কোনো দোষ ছিল না, সব দোষ তার। সে-ই এসব শুরু করেছিল, সে-ই দোষী" ইত্যাদি ইত্যাদি। না ভাই, এখানে কে দোষী সেটা ব্যাপার নয়। আপনি যদি চান আপনার আমলগুলো কবুল হোক, তাহলে আপনাকে সব মনোমালিন্য দূর করতেই হবে এবং আপনজনদের সাথে মিলে যেতে হবে। কোনো ভাই হয়তো বলবেন ঐ ভাইয়ের সাথে আমার মনের মিল হয় না, বোনেরা হয়তো বলবেন ঐ বোনের সাথে ঠিক মিশতে পারি না ইত্যাদি। দেখুন, মীমাংসা করার অর্থ এটা না যে, তাকে কালকেই বাসায় দাওয়াত দিতে হবে বা একসাথে বসে কফি খেতে হবে। সেরকম কিছু করতে পারলে তো অবশ্যই খুব ভালো। কিন্তু সেটা যদি সম্ভব না হয়, নুন্যতম আপনার যেটা করা উচিত সেটা হলো—আসসালামু আলাইকুম বলে অন্তত তাকে সালাম দিন। ভাইয়েরা ভাইদেরকে এবং বোনেরা বোনদেরকে সালাম দিন। অন্তত এটুকু আপনাকে করতেই হবে যদি আপনি সেই মানুষদের একজন না হতে চান—যাদের ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন তাদেরকে যেন পরিত্যাগ করা হয়। এই কাজটি করুন ঈদের আগেই। সাক্ষাৎ করুন, এসএমএস পাঠান অথবা মসজিদে আসুন এবং সালাম দিয়ে আপনার ভাই বোনদের আপন করে নিন। আপনি নিজে প্রথমে উদ্যোগী হোন, কেননা যিনি প্রথম এগিয়ে আসবেন তিনিই আল্লাহর বেশি প্রিয় হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

আরেকটি দিক হলো, রামাদানে আমরা মুসলিম ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দেখা সাক্ষাৎ করি। ইফতারে, তারাবীতে, মসজিদে আমাদের প্রতিনিয়ত দেখা হচ্ছে, বিভিন্ন দাওয়াতে অনেকেই পরিবার নিয়ে একসাথে ইফতার করে। এই অধিক দেখা সাক্ষাতের ফলে পরস্পরের সাথে নানা সমস্যা বা মনোমালিন্য তৈরি হবারও একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। এই ধরণের মনোমালিন্য বা পারস্পরিক ঘৃণা ছড়ানোর কাজ খোদ মসজিদে বসেই হয়। মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন ঘরানা আছে, বিভিন্ন মতের লোক আছে। এদের মধ্যকার যে ঘৃণা আর অসহনশীলতা আমরা দেখি, সেগুলো প্রায়ই মসজিদে বসেই চর্চা করা হয়। পবিত্র রামাদান মাসেও সেগুলো বন্ধ হয় না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, রামাদানের শেষ মুহূর্তে অন্তর থেকে সকল রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ মুছে ফেলুন এবং অন্তরটাকে পবিত্র করে ফেলুন। এই উম্মাহর মাঝে পবিত্র হৃদয়ের আজ বড় অভাব। আজ সেই উম্মাহ কোথায়, যারা সালাফদের মতো প্রতি রাতে তার সব ভাইদের ক্ষমা করে দিয়ে, সকলের প্রতি সব ক্ষোভ ঘৃণা মুছে ফেলে একটা পবিত্র অন্তর নিয়ে ঘুমুতে যান? কে ঠিক কে ভুল সেটা কোনো বিষয় নয় জরুরি হলো নিজের অন্তরকে পরিষ্কার রাখা, কারো প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব না রাখা।

“আর তাদের পর যারা এসেছে তারা বলল -হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করে দিন যারা আমাদের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর আমাদের অন্তরে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোনও ঘৃণা রাখবেন না।

হে রব! নিশ্চয়ই আপনি অতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (সূরাহ হাশর: আয়াত ১০)

আল্লাহ এই আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করেছেন যারা দু'আ করেছিল এই বলে যে—হে আল্লাহ্, আমাদের অন্তরে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা রাখবেন না।

ইবনু কাসির (ﷺ) তাঁর আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়ার ত্রয়োদশ খণ্ডে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ইবনু হুসাইন বলেন, “আমি ইয়াস ইবনু মুয়াবিয়ার সামনে এক ভাই সম্পর্কে কিছু খারাপ কথা বললাম। ইয়াস ছিলেন একজন জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু লোক। ইয়াস আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি রোমানদের সাথে যুদ্ধ করেছ? সুফিয়ান উত্তর দিলেন, না। ইয়াস জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সিন্ধু, হিন্দ অথবা তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করেছ? সুফিয়ান বললেন, না, তাদের সাথে যুদ্ধ করিনি। ইয়াস তখন বললেন, ইসলামের শত্রু সিন্ধু, হিন্দ আর তুর্কিরা তোমার হাত থেকে নিরাপদ, অথচ মুসলিম ভাইয়েরা তোমার থেকে নিরাপদ নয়—এটা কীভাবে সম্ভব?”

এই ঘটনার পর সুফিয়ান বললেন, “এর পর থেকে আমি আর কখনও মুসলিমদের ব্যাপারে কথা বলিনি।”

কিছু লোক আছে যারা মুসলিমদের সাথে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, তাদেরকে অপবাদ উপহার দেয়, আর তাদের মিষ্টি হাসিটা গচ্ছিত রাখে তাওহীদের শত্রুদের জন্য। আন্তঃধর্ম গোলটেবিল বৈঠকে তাদের দেখবেন কাফির বন্ধুদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল! কারো মাঝে শির্ক থাকলে তারা সেটাকে বড় কোনো সমস্যাই মনে করে না, উল্টো তার সাথে আলোচনায় বসাটাকে তারা বিশাল জরুরি ব্যাপার মনে করে। অন্যদিকে বিশুদ্ধ তাওহীদে বিশ্বাসী কোনো মুসলিম যদি এই মতের অনুসারী হয় যে, ভোট দেওয়া হারাম, তাহলে তারা তার চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করবে! তারা তাকে একঘরে করবে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটাবে, গুজব ছড়াবে—পারলে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বে! কবর পূজারীদের সাথে একাত্ম হতে তাদের কোনো আপত্তি নেই, খ্রিস্টান ত্রিত্ববাদীদের সাথে বৈঠক-সংলাপ তাদের চোখে অবশ্য কর্তব্য, আর তাদের মতে শিয়াদের সাথে ভ্রাতৃত্ব হতে হবে সবার আগে—একেবারে ফরজে আইন!

কিন্তু আপনি যদি মুসলিম উম্মাহর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলেন, উম্মাহের জন্য দরদী মানুষদের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন—তাহলে তারা আপনার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগবে। আপনি যদি দুর্বল, কারারুদ্ধ, নিহত এবং

যাদের জন্য কথা বলার কেউ নেই তাদের জন্য কথা বলেন—তাহলে আপনার আর রক্ষা নেই।

আল্লাহর শত্রুদের জন্য কোমল-দরদী হওয়া এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে বিশ্বাসীদের সাথে তর্জন-গর্জন করা—এটা মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত।

যে বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আল্লাহ সূরাহ মায়িদায় বলেছেন, তারা মুসলিমদের প্রতি সদয় এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। আপনার ভাইয়ের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে, সেটা তাদের কাছ থেকে শিখুন, যাদের আচার-ব্যবহার সাত আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র করেছিলেন।

তিরমিযি এবং বায়হাকিতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটা সাকিফ গোত্রের সাথে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে। সাকিফ গোত্র সাহাবিদের আক্রমণ করছিল। তারা সাহাবিদের দিকে তীর ছুঁড়ছিল। কিন্তু নবীজি (ﷺ) সাকিফ গোত্রের জন্য বদ-দু'আ করলেন না, বরং তাদের হিদায়েতের জন্য দু'আ করলেন। বললেন, "হে আল্লাহ, তাদের পথ দেখাও, তারা যেন আমার কাছে আসে।"

দাউস নামে আরেকটা গোত্র ছিল আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। সেই গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তুফায়েল ইবনু আমর আদ-দাউসী ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং এই সংবাদ পৌঁছানোর জন্য দাউসদের কাছে ফিরে গেলেন। তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন কিন্তু তারা তেমন কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। শুধু অল্প কিছু আত্মীয় ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাদের মাঝে একজন ছিলেন আমাদের প্রিয় সাহাবি আবু হুরায়রা (رضي الله عنه)।

তুফায়েল মনঃকষ্ট নিয়ে নবীজির কাছে ফিরে গেলেন, বললেন তার গোত্র তার সাথে কেমন আচরণ করেছে। নবীজি দাউস গোত্রের জন্য দু'আ করতে হাত তুললেন। সেটা দেখে আবু হুরায়রা বললেন, "দাউসদের দিন বুঝি আজ শেষ।" তিনি ভাবছিলেন আল্লাহর রাসূল দাউসকে বদ-দু'য়া করবেন আর দাউস গোত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে রহমতের নবী (ﷺ) দুহাত তুলে দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! দাউসদেরকে হেদায়েত করুন এবং তাদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করুন।" আল্লাহ নবীজি (ﷺ) সম্পর্কে বলেছেন,

> **"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" (সূরাহ আম্বিয়া: ১০৭)**

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর ঘোর শত্রুদের সাথে যে অনুগ্রহ, দয়া আর হিকমাহ দেখিয়েছিলেন—সেটা আজকে খোদ মুসলিমরা আরেক মুসলিমের সাথে দেখাতে চায় না তুচ্ছ মতপার্থক্যের কারণে!

আমরা তাইফের ঘটনা জানি। তাইফবাসী নবীজিকে রক্তাক্ত করেছিল, তাঁর উপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, তাঁকে গোয়েন্দাগিরির মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। তাইফের দিন ছিল আল্লাহর রাসূলের দাওয়াহ জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন। গোটা তেইশ বছরের নবুওয়াতের জীবনে তাইফবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই পরিস্থিতি বদলে যায়, আল্লাহর রাসূলের হাতে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা আসল।

তাইফের ঘাম তখনো শুকায়নি, তাইফের রক্ত তখনো মুছে যায়নি, সেই মুহূর্তে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলেন ফেরেশতা জিবরীল (ﷺ)। বললেন তিনি আল্লাহর রাসূলের সাথে আছেন, এমনকি পাহাড়ের ফেরেশতারাও তাঁর সাথে আছেন। আল্লাহর রাসূল যদি চান, তাঁরা তাইফের পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন, তাইফের লোকদের দুই পাহাড়ের মাঝে পিষে দেবেন। যদি আল্লাহর রাসূল এভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইতেন, তা বিশ্ববাসীর জন্য উচিত শিক্ষা হয়ে যেত, আল্লাহর রাসূলের সাথে কেউ কখনো লাগতে আসত না।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কী বলেছিলেন? তিনি তাইফবাসীদের ছেড়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন,

"হয়তো তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা এমন প্রজন্মের জন্ম দেবেন যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে।"

কী তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি! এবং আসলে তা-ই হয়েছিল। যে লোকগুলো আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্ট শত্রু ছিল, যারা নবীজি (ﷺ)-এর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল, তাদের পরের প্রজন্মই ইসলামের নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং তারা ছিলো ইসলামের হিরো।

যে লোককে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই উম্মাহর ফিরাউন বলে অভিহিত করেছেন, তার উত্তরাধিকার থেকেই জন্ম নিয়েছেন ইকরিমাহ ইবনু আবু জাহেল। এই ইকরিমাহ আবু বকর (رضي الله عنه)-এর খিলাফতের সময়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন।

ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা—যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে ভীতি প্রদর্শন করে বলেন-

> **"তাকে আমার হাতেই ছেড়ে দাও যাকে আমি নিজেই সৃষ্টি করেছি! আর তারপর তাকে সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছি। সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। আর যার জীবনকে আমি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের বানিয়ে দিয়েছি। এত কিছুর পরও তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি তাকে আরও দিই। না! নিশ্চয়ই সত্যই সে ছিল একগুঁয়ে আর আমার আয়াতসমূহের বিরোধিতাকারী। আমি তাকে নিদারুণ যন্ত্রনার সম্মুখীন করব!"**
> **(সূরাহ মুদ্দাসসির: আয়াত ১১-১৭)**

কুরাইশরা যখন আল্লাহর রাসূলের নামে যেমন পারছিল মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছিল, তখন এই ওয়ালিদ ইবনু মুগিরাই রাসূলুল্লাহর নামে কোন কথাটা ছড়ালে মানুষের কাছে তাঁকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় তা ঠিক করে দিত। অথচ এই ওয়ালিদ বিন মুগিরার ঘরেই জন্ম হলো আল্লাহর তরবারি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (ﷺ)-এর। আবু লাহাব, যাকে কুরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, তার ছেলে উতবা আর মুতইব মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম হয়ে গেলেন, আর তাঁরাই হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করলেন!

সুতরাং এখনই সময়, মুসলিম ভাইবোনদের বিরুদ্ধে আপনার অন্তরে কোনো বিদ্বেষ থেকে থাকলে তা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলুন। আপনার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নিন। কলুষিত হৃদয় কখনও কখনও পনের, বিশ, এমনকি পঁচিশ বছর ধরে অন্তরে বিদ্বেষ পুষে রাখে। আপনার অন্তর কতদিন যাবৎ বিদ্বেষে ভরে আছে, তা ভুলে যান। দুদিন আগেও যদি কিছু একটা ঘটে থাকে, সেই বিদ্বেষ ঝেড়ে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নিন।

কিছু মানুষ আছে যারা তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মান, পরিবার সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেয়, আর কিছু মানুষ আছে যারা কুৎসা, হিংসা এবং বিদ্বেষের পেছনেই নিজেদের জীবনকে শেষ করে দেয়। তাকওয়া অর্জনের মাস এই রামাদানেও যদি এই রোগ থেকে আপনার মুক্তি না মেলে, তবে আপনার অন্তরে রামাদানে তাকওয়া অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

ইবনু আসাকির (ﷺ) একদিন বলেছিলেন "তোমরা আলিমদের গোশতকে ভয় করো"—অর্থাৎ তাদের নিন্দা কোরো না, তাদের ব্যাপারে বাজে কথা বলো না এবং তাদের নামে মিথ্যা রটিয়ো না। আলিমদের গোশত খাওয়াকে ভয় করুন, কেননা আলেমদের ব্যাপারে গীবত করে আপনি যে গোশত খাচ্ছেন, তা বিষাক্ত গোশত। যারা আলেমদের মর্যাদা নষ্ট করে, তাদের পরিণতি ভালো হয় না। শুধু আলিম নন, বরং আমি বলব যে, যারাই কোনো মুসলিমের গীবত করে, তাদের পরিণতি হয় ভয়াবহ। এমন অনেক উদাহরণ আছে, যারা তাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পুষে রাখত—পরবর্তীতে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। একেবারে খাঁটি মুরতাদ! তারা নিজেদের ইসলাম ত্যাগের কথা নিজেরাই ঘোষণা করেছে, এমনকি কিছু লোক নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করেছে! নোংরা ও কলুষিত হৃদয় আপনাকে এক সময় অনেক মারাত্মক দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং অন্তরের এই রোগ পরিষ্কার করে ফেলুন। অন্তরের বিদ্বেষ ধুয়েমুছে সাফ করে নিন।

একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এক লোককে ধরে আনা হলো। লোকটা মদ খেয়েছিল। তাঁরা তাকে দোররা মারল। সেই লোক আবারও মদ খেলো। আবারও তাকে ধরে এনে দোররা মারা হলো। এরকম বার বার হতেই থাকল। এক সাহাবি বিরক্ত হয়ে বলেই ফেললেন, "আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "এভাবে বলো না। তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে বেশি সাহায্য কোরো না।"

সে তো আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, সে একজন মুসলিম। হ্যাঁ, মদ খেয়ে সে অবশ্যই গুনাহ করছে, এবং এই গুনাহকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

হয়তো তার এমন অসংখ্য আমল আছে, যেটা আপনার বা আমার পক্ষে করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ হয়ত তার একটা গুনাহকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, অথচ তার অগণিত আমল আমাদের নিকট এখনো অজানা রয়ে গেছে। যারা অন্তরে অন্যের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করে, হতে পারে তার নিজের অসংখ্য গোপন গুনাহ আছে, যেগুলো আল্লাহ আমাদের সামনে এখনো প্রকাশ করেননি। তার গুনাহর কথা কেউ জানে না বলেই সে অন্যের গুনাহর ব্যাপারে এত কড়া হচ্ছে। নিজের ব্যাপারে অহংকার দূর করুন, নিজেকে অন্যদের তুলনায় বড় মনে করা বন্ধ করুন—তাহলে আপনার জন্য নিজেকে সংশোধন করা সহজ হয়ে যাবে।

বকর ইবনু আব্দিল্লাহ (رحمه الله) বলেন, "যদি তোমরা কোনো ব্যক্তিকে দেখো যে, সে অন্যের দোষ খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে আছে, অথচ নিজের আমলের ব্যাপারে একেবারেই গাফেল—তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছেন। এটা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পরিকল্পনার একটা নিদর্শন মাত্র।"

> **"যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না, একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।" (সূরাহ আশ-শুআরা: আয়াত ৮৮-৮৯)**

এখানে কি জিহ্বার সংযমের কথা বলা হচ্ছে? না, জিহ্বাকে সংযত রাখার মানে হলো আপনার কথা, আপনার জবানকে সংযত রাখা, কিন্তু এখানে আলোচনা হচ্ছে অন্তরের পরিশুদ্ধি নিয়ে। ইবাদাতের সময় অন্তরের যে বিশুদ্ধতা দরকার, সেই পরিশুদ্ধি নয়, এ হলো মুমিনদের নিজেদের মধ্যকার বিশুদ্ধ অন্তর, অর্থাৎ মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা ও অন্তরের স্বচ্ছতা।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله)-এর কী ধরণের শত্রু ছিল কোনো ধারণা আছে? তাঁর শত্রুরা ছিল গভীর এবং মারাত্মক বিদআতে লিপ্ত লোকেরা। আকিদা এবং তাওহীদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইসলামিক ইস্যুতে তাঁর নীতি ও আদর্শের কারণে শাসকেরা তো বটেই, এমনকি মুসলিম আলিমরা পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল।

ইবনু তাইমিয়া (رحمه الله)-এর পেছনে কেন এত লোক লেগেছিল? তিনি তো কোনোদিন বিয়ে করেননি, শ্বশুরবাড়ির ঝামেলায় তাঁকে কখনও জড়াতে হয়নি। পিঠে জড়ানোর একটা চাদর ছাড়া তাঁর আর কোনো সম্পদ ছিল না, তাই সব ধরণের বৈষয়িক ঝামেলা থেকেও তিনি ছিলেন মুক্ত। তিনি কোনো চাকরি করতেন না, তাই তাঁকে

মনিবের সাথে কোনো ধরণের ঝামেলা পোহাতে হয়নি। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি মসজিদে কাটাতেন, সুতরাং বাড়িওয়ালার সাথে ঝগড়াঝাটি হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অন্যদের সাথে তাঁর বিরোধের একমাত্র কারণ তাহলে কী ছিল? কারণটা ছিল আকিদাগত বিষয়ে তাঁর দৃঢ় অবস্থান।

কিছু আলিমদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-কে জেলে যেতে হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি জেলে থাকা অবস্থাতেই দাবার ছক উল্টে গেল। নতুন যে শাসক এলেন তিনি পুরোনো শাসক এবং সেইসব আলিমদেরকে ঘৃণা করতেন। তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-কে কারাগার থেকে মুক্ত করে তাঁকে সম্মানিত করেন, আর তাঁকে বন্দী করার পেছনে যে সমস্ত আলিমদের হাত ছিল, তাদেরকে জেলবন্দী করেন। তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-কে তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলার অনুরোধ করলেন। তিনি ইতিমধ্যেই তাদেরকে ঘৃণা করতেন, তবু প্রমাণস্বরূপ ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-এর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলেন যাতে তিনি তাদের হত্যা করতে পারেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে শুধু একটিমাত্র কথা শোনার অপেক্ষা, আর এরপরই তাদের হত্যা করা হবে—এটাই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কেননা সেই শাসক তাদেরকে ও তাদের প্রাক্তন নেতাকে ঘৃণা করত। কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) বললেন, "এরা হচ্ছেন উলামা এবং এদেরকে বন্দী করা হলে উম্মাহর উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে।"

আহমাদ ফরিদ (ﷺ) ইবনু তাইমিয়্যাহকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি গ্রন্থে বলেন, "ইবনু মাখলুফ ছিলেন তাঁর সময়কার বিখ্যাত মালিকি ইমামদের একজন। যখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল, তিনি বললেন, আমি আমার জীবনে ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো এত মহানুভব আর কাউকে দেখিনি। আমরা ইবনু তাইমিয়্যাহর বিরুদ্ধে শাসকদের ক্ষেপিয়ে তুলে তাঁকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। অথচ মুক্তি পাওয়ার পর যখন তাঁর অবস্থান আমাদের চেয়ে উত্তম হলো, যখন মাত্র একটা কথার দ্বারা তিনি আমাদের হত্যা করতে পারতেন—তখন তিনি তা না করে আমাদের জান বাঁচিয়ে দিলেন। আমাদের পক্ষ নিয়ে কথা বললেন—আমাদের প্রশংসা করলেন!"

ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) তাঁর উস্তাদ ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারে বলেন, "আমি ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো আর কাউকে দেখিনি। তিনি কখনও তার শত্রুদের অভিশাপ দেননি।" ইবনুল কাইয়্যিম আরও বলেন, "আমি একবার তাঁর কাছে একটা সুসংবাদ জানাতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী সুখবর এনেছ, হে ইবনুল কাইয়্যিম? আমি তাকে বললাম যে তাঁর খুব বড় একজন শত্রু মারা গেছে।"

ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর শাইখকে এই খবরটা দিতে গিয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যাহ এই খবরটা শোনার সাথে সাথে বললেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন, মুসলিমের মৃত্যু কখনও সুসংবাদ হতে পারে না।"

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "এরপর ইবনু তাইমিয়্যাহ তৎক্ষনাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং তার পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদের বাড়িতে গেলেন। তিনি মৃত ব্যক্তির সন্তানদের নিকট গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের বাবার মতো।

তোমরা তোমাদের বাবাকে হারিয়েছ ঠিকই কিন্তু আজ থেকে আমাকে তোমরা তোমাদের বাবার মতো জানবে। তোমাদের যদি কখনো কিছু প্রয়োজন হয়, তবে আমাকে জানিও।"

তারা এ কথা শুনে খুব খুশি হলো। তারা ইবনু তাইমিয়্যাহকে অত্যন্ত ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত।

দেখুন, ক্ষমার কী চমৎকার দৃষ্টান্ত! অথচ ঐ ব্যক্তি ছিল ইবনু তাইমিয়্যাহর সবচেয়ে বড় শত্রু। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "ইবনু তাইমিয়্যাহর প্রতি তাঁদের সীমাহীন ভালবাসা আর সম্মানের কারণ ছিল—তিনি একজন পরিষ্কার মনের মানুষ ছিলেন।"

ইবনু তাইমিয়্যাহর একজন ছাত্র একবার আফসোস করে বলেছিলেন, "ইশ, ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর শত্রুদের সাথে যে আচরণ করেছেন, আমি যদি আমার বন্ধুদের সাথে তা করতে পারতাম! আমার যদি ক্ষমা করার এমন গুণ থাকত!"

এই রামাদানে আমরা আল্লাহর সাথে একটা নতুন অধ্যায় শুরু করেছি, এখন চলুন মুসলিমদের সাথেও একটা নতুন অধ্যায় শুরু করি।

আলি ইবন আবি তালিব (ﷺ)-এর নাতি আলি ইবনু আল হুসাইনের একজন কাজের মহিলা ছিল। একদিন সে হুসাইনের জন্য এক বালতি ওযুর পানি আনতে গেল। ওযুর পানি ঢালতে গিয়ে বালতিটাই তাঁর মাথায় পড়ে গেল। ফলে তিনি বেশ আঘাত পেলেন। সাথে সাথে কাজের মহিলাটি বলে উঠল সূরাহ আল ইমরানের ১৩৪ নম্বর আয়াতের একটি কথা, "যারা তাঁদের রাগকে দমন করে।" সঙ্গে সঙ্গে আলি ইবনু হুসাইন বলে উঠলেন, আমি আমার রাগকে দমন করলাম। একে তাঁর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, আর কাজটার জন্য দায়ী তাঁর কাজের লোক। তবুও তিনি তাকে কিছু বললেন না। কাজের মহিলাটাও জানত সে কার সাথে কথা বলছে! কাজের মহিলাটি এরপর বলল, "যারা মানুষকে ক্ষমা করে।" এটাও সূরাহ আলে ইমরানের ১৩৪ নম্বর আয়াতে আছে। আলি ইবনু হুসাইন বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আমি আমার রাগ দমন করলাম আর তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

কাজের মহিলাটি এরপর আয়াতটি শেষ অংশটুকুও বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।" অর্থাৎ ভালো কাজ যারা করে, তাদেরকে ভালোবাসেন। এরপর আলি ইবনু হুসাইন বললেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আজ থেকে তুমি মুক্ত।"

মনে করুন, আপনার মা, মেয়ে বা বোনের নামে কেউ একটা বাজে কথা বলল। আল্লাহ হেফাযত করুক যেন আমাদেরকে কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়।

চিন্তা করুন, তখন আপনার কেমন লাগবে? আপনার রক্ত গরম হয়ে যাবে। আর যদি সেই ব্যক্তি হয় এমন কেউ যাকে আপনি বছরের পর বছর ধরে সাহায্য করে আসছেন, আর এখন সে আপনার একেবারে কাছের একজনের ব্যাপারে খারাপ কথা বলছে—কেমন লাগবে আপনার?

মিসতা ইবনু উসাসা হলো এমন একজন। সে ছিল অত্যন্ত গরিব, আবু বকর (ﷺ) তাকে প্রতি মাসে সাহায্য করতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আবু বকরের সাহায্য দিয়েই লোকটির সংসার চলত। যখন লোকেরা আইশা (ﷺ)-কে অপবাদ দিল, তখন এই লোকও মা আইশার নামে বাজে কথা ছড়াল। যার কারণে আবু বকর (ﷺ) তাকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিন পর পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলো, আল্লাহ্ আইশা (ﷺ)-এর পবিত্রতার ঘোষণা দিয়ে কুরআনে আয়াত নাযিল করলেন। এরপর বিশেষভাবে আবু বকর (ﷺ)-কে নিয়ে কুরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

> **“আল্লাহ্ যাদেরকে ধন সম্পদ দিয়েছেন, তারা যেন নিজের আত্মীয় স্বজন আর গরিবদেরকে তা না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না করে; এবং যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করেছে, তাদেরকে যেন ক্ষমা করে দেয়। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন? আর আল্লাহ্ হচ্ছেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরাহ নূর: আয়াত ২২)**

আপনি যদি চান আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, তাহলে আপনিও মানুষকে ক্ষমা করে দিন। আপনার রামাদানও এভাবেই শেষ করুন। মানুষকে ক্ষমা করে দিয়ে আর আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা নিয়ে।

আবু বকর (ﷺ) বলেন, “ওয়াল্লাহি, হে আমাদের রব! আমরা তোমার ক্ষমাকে ভালোবাসি!”

এরপর তিনি সেই লোকটির কাছে যান এবং আবার তাকে সাহায্য করতে শুরু করেন। হ্যাঁ সেই লোকের কাছে—যে কিনা তাঁর নিজের মেয়েকে নিয়ে খারাপ কথা ছড়িয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবার সিয়াম আর অন্যান্য সকল ইবাদাতকে কবুল করে নিন। আরও অনেকবার রামাদান দেখার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে একত্রিত হওয়ার তাওফিক দেন। আমীন।

শাইখ পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা শাইখ মূসা জিবরীল ছিলেন মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মূসা জিবরীল তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় মদীনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই তিনি বুখারি ও মুসলিম মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বুখারি ও মুসলিমের সনদসমূহ মুখস্থ করেন, এরপর হাদিসের ছটি কিতাব (কুতুবুস সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। তারপর তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরীয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াহও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের সাথে একান্ত দারসে তিনি আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামাহ হামুদ বিন উকলা আশ শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাযকিয়াহ লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ মূসা জিবরীলের শাইখ ইহসানকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান আমেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইনশাআল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল *আর রাহিকুল মাখতুম* বইয়ের লেখক শাইখ সফিউর রহমান আল মুবারাকপুরির অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াহ আস সালিমের অধীনে। শাইখ আতিয়াহ আস সালিম ছিলেন শাইখ আল্লামাহ মুহাম্মাদ আমিন আশ শানকিতির প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ আশ শানকিতির ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ আদওয়ায়ুল বায়ান এর কাজ শেষ করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ ইবরাহীম আল হুসাইনেরও ছাত্র ছিলেন।

শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতাহর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আব্দুল্লাহ আল কুদের সাথে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল হজ্ব করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান। মুহাদ্দিস শাইখ হাম্মাদ আল আনসারির অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন তিনি। তিনি শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল আলবানি ওয়াসিয়াহতে শাইখ আবু মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ মূসা আল কারনিরও ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাযাহপ্রাপ্ত হন শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে। শাইখ মূসা জিবরীল ও শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায আমেরিকায় থাকা বিলাদুল হারামাইনের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকেও তাযকিয়াহ অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তিনি (আলিমদের কাছে) পরিচিত এবং উত্তম আকিদা পোষণ করেন। শাইখ আহমাদ বর্তমানে আমেরিকায় নিজ পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন।

প্রচণ্ড উত্তাপ শেষে এক পশলা ঝুম বৃষ্টি, অদ্ভুত এক মাটির সোঁদা গন্ধ, ঝিরিঝিরি শীতল বাতাস, পরিবেশটাই এমন হয়ে যায় যা হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। এই শীতল বাতাস আর প্রশান্তিময় পরিবেশের স্থায়িত্ব হয় খুব অল্প কিছু সময়ের জন্য। আমাদের প্রিয় নবীজি ﷺ রামাদানকেও এরকম এক মৃদুমন্দ শীতল বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন। যার শীতলতা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ বেদনা দূর কর দেয়, যে এই বাতাস গায়ে মাখে সে আর কখনো দুঃখী হবে না। সুতরাং রামাদানের মৃদু বাতাসে নিজেকে মুক্ত করুন, নিজেকে রোমাঞ্চিত করে নিন তার পরশে, নিজের বাহুগুলোকে মেলে ধরুন ঐ মুক্ত বাতাসে। রামাদানে আপনার লক্ষ্য হবে আলাহর সিংহাসন যেন জান্নাতে আপনার ছাদ হয়, আল্লাহ যেন আপনাকে তাঁর আরশ মহলে সম্মানিত করেন। প্রিয় নবীজির সাথে, সাহাবীদের সাথে, রাহমানের বান্দাদের সাথে আল্লাহ যেন আপনাকেও জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী করে নেন।

سيرة